নাটক

সাহিত্য কোষ

নাটক

অধ্যাপক শ্রীঅলোক রায় এম এ.
সম্পাদিত

সম্পাদকের নিবেদন

বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হচ্ছে—সাহিত্যপাঠেও সাধারণের উৎসাহ অনেক বেড়েছে। কিন্তু সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে আজও কোনো সর্বপরিচিত, সবস্বীকৃত মান নির্দ্ধারিত হয়নি। মহাকবি যখন সমালোচনা কর্মে প্রবৃত্ত হন তখন তিনি নিজেই পথ প্রস্তুত করে নেন নিজের প্রয়োজন মত পারিভাষিক শব্দ নির্মাণ করে নেন। কিন্তু সাধারণের সাহিত্য চর্চার জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পারিভাষিক শব্দ ও তার সুনির্দিষ্ট মান থাকার প্রয়োজন আছে। তা না হলে সাহিত্য বিচার ব্যক্তিগত ভালোলাগা-মন্দলাগার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে, তার ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে অস্বীকৃত হয়। বিশেষ করে আমাদের দেশে আধুনিক সাহিত্য, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যার সূচনা তা প্রধানভাবেই য়োরোপীয় সাহিত্যাদর্শের অনুসারী। সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শের প্রভাবও কিছু আছে। এ অবস্থায় আধুনিক সাহিত্য বিচারে য়োরোপীয় ও সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার নির্দিষ্ট পরিভাষা ও তার সুনির্দিষ্ট মানের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। ইংরেজী ভাষায় এ জাতীয় অনেক গ্রন্থ আছে, ডিকসনারী অফ ওয়ার্ল্ড লিটারারি টার্মস বা এনসাইক্লোপিডিয়া অফ লিটারেচার প্রভৃতি গ্রন্থ তার প্রমাণ। এই গ্রন্থগুলি, লেখক, পাঠক ও সমালোচককে নানাভাবে সাহায্য করে। সাহিত্য সম্বন্ধে একটা বোধ একটা ধারণা জন্মাতে সহায়তা করে।

বাংলা ভাষায় সাহিত্য বিচারকালে ইংরেজী সংস্কৃত নানা পারিভাষা আমরা নিত্য ব্যবহার করি। বাংলা পরিভাষাও কিছু আছে। তবে ইংরেজী পরিভাষাই সংখ্যায় বেশী। এর জন্য হীনমন্যতাবোধের কারণ নেই। সাহিত্যে যদি আমরা পশ্চিমী আদর্শকে গ্রহণ করতে পেরে থাকি, তবে সমালোচনার ক্ষেত্রে তাকে অস্বীকার করি কেন।

'সাহিত্য কোষ' সঙ্কলনের যে পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি, তার ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ। আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য সামান্য। তবু কাজ সুরু করা গেল। কয়েক খণ্ডে 'সাহিত্য কোষ'কে আমরা বিভক্ত করে নিয়েছি,—প্রথম খণ্ড নাটক, দ্বিতীয় খণ্ড কাব্য, তৃতীয় খণ্ড কথাসাহিত্য এবং চতুর্থ খণ্ড সাহিত্য ও

শিল্পধারা। এই গ্রন্থে বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের সাধারণ অর্থ, বিশেষ অর্থ এবং বাংলা সাহিত্যে তার প্রয়োগ দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকগণ এই গ্রন্থে পারিভাষিক শব্দগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রথম খণ্ড—'নাটক', প্রকাশিত হোলো। গ্রন্থটির অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন। নাটক সংক্রান্ত যাবতীয় পরিভাষা সংগ্রহের চেষ্টা করেছি, তবু কিছু আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। গ্রন্থ মুদ্রণের শেষ পর্বে কিছু কিছু অপূর্ণতা আমাদের নিজেদেরই চোখে পড়েছে। সহৃদয় পাঠকেরা এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটি সম্পূর্ণতর করে তোলার চেষ্টা করবো।

যে সকল পরিভাষা আলোচনা করা হয়েছে, তাতেও কিছু কিছু ত্রুটি থেকে গেল। বাংলা নাটক থেকে সব সময় দৃষ্টান্ত সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে। বলাবাহুল্য রচনাগুলিতে যে মতামত প্রকাশ পেয়েছে তার দায়িত্ব রচয়িতার।

বর্ণানুক্রমিকভাবে পরিভাষাগুলি সাজানো হয়েছে। সাধারণভাবে, ইংরেজী পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়ারও চেষ্টা করা গেছে। তবে এই প্রতিশব্দগুলি যেখানে সাধারণ্যে অপরিচিত, সেখানে ইংরেজী পরিভাষা খুঁজলেই শব্দটি পাওয়া যাবে।

'পরিশিষ্ট' অংশে কয়েকজন নাট্যকারের নাটক সম্বন্ধে আলোচনা উদ্ধৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া এগুলির ব্যবহারিক একটা মূল্যও আছে।

যারা 'সাহিত্যকোষ-নাটক' গ্রন্থে লিখেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশেষ ঋণী। তাঁদের উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হতে পারতো না।

গ্রন্থটির সম্পাদনা কাযে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন—অধ্যাপক সরোজ দত্ত, অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ সরদার ও অধ্যাপক অনিল সেনগুপ্ত। 'নাটকের ষড়ঙ্গ'-রচনাটির ব্যাপারে অধ্যাপক ডক্টর গুরুদাস ভট্টাচার্য সাহায্য করেছেন। প্রুফ দেখার কাজে ও অন্যান্যভাবে সহায়তা করেছেন শ্রীসনৎ মিত্র। শ্রীদীপেন্দ্রলাল সাহা, শ্রীপ্রশান্তকুমার পালিত, শ্রীঅরুণকুমার দাস

ও শ্রীশ্যামলেন্দু সেনগুপ্তের উৎসাহও স্মরণ করছি। প্রেস কপি তৈরী করে দিয়েছেন (বিশেষ করে 'পরিশিষ্ট' অংশের) কল্যাণীয়া শ্রীমতী রাত্রি রায়, শ্রীমতী আরতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী দীপু সাহা।

এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের সাফল্যে আমারই সঙ্গে এঁরাও আনন্দ অনুভব করবেন।

লেখক-পরিচয়

অজিতকুমার ঘোষ	—	রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
অনিলকুমার সেনগুপ্ত	—	স্কটিশ চার্চ কলেজ।
অভিগ ভট্টাচার্য	—	রামকৃষ্ণ মিশন কলেজ, নরেন্দ্রপুর।
অমরেন্দ্র গণাই	—	মৌলানা আজাদ কলেজ।
অমূল্য সরকার	—	মহিষাদল রাজ কলেজ।
অরুণ ঘোষ	—	চন্দননগর গভর্ণমেণ্ট কলেজ।
অলোক রায়	—	স্কটিশ চার্চ কলেজ।
আশুতোষ ভট্টাচার্য	—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
কনক বন্দ্যোপাধ্যায়	—	স্কটিশ চার্চ কলেজ।
গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়	—	বঙ্গবাসী কলেজ।
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	—	স্কটিশ চার্চ কলেজ।
দিলীপকুমার গুপ্ত	—	সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।
দেবীপদ ভট্টাচার্য	-	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
দীপক ঘোষ	—	আনন্দমোহন কলেজ।
প্রমথনাথ বিশী		কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
বিভাস রায় চৌধুরী	—	যোগমায়া দেবী কলেজ।
বীরেন্দ্র দত্ত	—	তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়।
ভবতোষ দত্ত	—	প্রেসিডেন্সী কলেজ।
ভবতোষ ভট্টাচার্য	—	স্কটিশ চার্চ কলেজ।
ভূপেন্দ্রনাথ দাস	—	স্কটিশ চার্চ কলেজ।
মহান চক্রবর্তী	--	শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ।
মিহির দাস	—	দিল্লী কলেজ।
মোহিত চট্টোপাধ্যায়	—	জঙ্গীপুর কলেজ।
রথীন্দ্রনাথ রায়	—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
শঙ্খ ঘোষ	—	সিটি কলেজ।

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত	—	সিটি কলেজ।
শ্যামাপ্রসাদ সরদার	—	দার্জিলিং গভর্ণমেণ্ট কলেজ
সরোজ দত্ত	—	আনন্দমোহন কলেজ।
সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	—	হাওড়া গার্লস কলেজ।
সুখেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়	—	শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ।

সাহিত্য কোষ—নাটক

অতি নাটক—দ্রঃ মেলোড্রামা।

অপেরা—অপেরা সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলেছেন: "Opera as a modern art form, a drama whose language is song." আধুনিক অপেরার জন্ম হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে। ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দে ফ্লরেন্সে গ্রীক্ ট্রাজিডি পুনঃপ্রবর্তনের যে চেষ্টা হয়েছিল, তাতে আধুনিক অপেরার জন্ম হল বলা চলে। অপেরার সঙ্গে গ্রীক ট্রাজিডির আত্মিক সংযোগ ছিল। অপেরাকে রেনেশাঁসের দান বলা যায়। ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রোম, নেপল্‌স ও ভিনিসে প্রায় তিনশোটি অপেরা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে অপেরার জনপ্রিয়তা বেড়ে ওঠে। ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে কার্ডিন্যাল ম্যাজারিণ প্যারিসে এক ইতালীয় অপেরার দল এনেছিলেন। ষোড়শ লুইয়ের বিবাহোপলক্ষে একদল ভিনিসীয় অপেরা এসেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে নেপল্‌স থেকে আগত অপেরার দল সমস্ত ইউরোপ ছেয়ে ফেলে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে ইতালীয় অপেরা কোম্পানীগুলি ইউরোপ ভ্রমণ করেছিল। তখনো পর্যন্ত অপেরার বিষয়বস্তু ছিল গ্রীক্ পুরাণ ও প্রাচীন ইতিহাস।

ইতালীয় অপেরা ছাড়া ষোড়শ লুইয়ের দরবারের ফরাসী অপেরা রাসিনের ট্রাজিডির প্রভাবে নবরূপ পরিগ্রহ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অপেরার একটি রূপান্তর ঘটে। ফরাসী দেশে লঘুরসাত্মক কমিক অপেরার সৃষ্টি হয়। জার্মানীতেও সিরিয়াস অপেরার সঙ্গে লঘুরসাত্মক অপেরার মিশ্রণ করা হত। মোজার্ট ও বীঠোভেনের হাতে অপেরা একটি বিশেষ শিল্পসার্থকতা লাভ করে। রোমান্টিক আন্দোলনের প্রভাবে অপেরার বিষয়বস্তু ও শিল্প-রীতিতে অভিনবত্ব দেখা যায়। জার্মানীতে ভাগ্‌নার ও ইতালীর ভার্দির হাতে রোমান্টিক যুগের অপেরার সমস্ত বৈচিত্র্য একটি সমন্বয় ও সমগ্রতা লাভ করে। বিংশ শতকের শিল্প-চিন্তার বিচিত্র ভাব-কল্পনার দ্বারা অপেরাও প্রভাবিত হয়েছে।

অপেরার কথাবার্তা সুরে রচিত। অপেরাকে একজাতীয় 'গীতিনাট্য' বললে ভুল হবে না। অপেরার সমস্ত অভিনয় সঙ্গীত-নির্ভর। এখানে নাচের স্থান নেই। এইখানে নৃত্যনাট্যের সঙ্গে অপেরার মৌলিক পার্থক্য। অপেরার সঙ্গীতগুলিতে নাটকীয়তা থাকা বাঞ্ছনীয়। সঙ্গীত ও অভিনয়ের একটি সুসম সমন্বয়ে অপেরার আঙ্গিক রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা অনেকখানি পাশ্চাত্ত্য অপেরার রীতিতে রচিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলকাতায় বিলেতি সঙ্গীতের আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। ইতালীয় অপেরা ও শেক্‌সপীঅরের নাটকের সঙ্গে কলকাতাবাসীর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশক থেকে। অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন যে সেকালের সাহেবরা প্রায় লাখ টাকার মতো চাঁদা তুলে···উপরি উপরি পাঁচ-ছয় বছর গ্যারান্টি দিয়ে ইতালীয়ান অপেরা সম্প্রদায়কে কলকাতায় আনাতেন ও এই লিণ্ডসে ষ্ট্রীটস্থ অপেরা হাউসে অভিনয় করাতেন। কলকাতায় পেশাদারী থিয়েটার স্থাপনের অন্যতম কারণ হল বিলেতি অপেরা ও অভিনয় দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাব।

বাঙলাদেশের যাত্রাভিনয়েও সঙ্গীতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সংলাপের মাঝে মাঝে এখানে প্রচুর সঙ্গীত সন্নিবেশ করা হত। যাত্রাকেই কিছু পরিমার্জিত করে মনোমোহন বসু 'গীতাভিনয়' নাম দেন। পাশ্চাত্ত্য অপেরার সঙ্গে এর মিল নেই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য অপেরার প্রভাবে গীতাভিনয়ের মধ্যেও

পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। সেযুগের গীতিনাট্যের প্রকৃতিধর্ম থেকেও এই সত্যটি প্রমাণিত হয়। গিরিশচন্দ্রের (১৮৪৪-১৯১২) কোনো কোনো রঙ্গনাট্য বা গীতিনাট্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 'আবুহোসেন' (১৮৯২) নাটিকাটির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এখানে সংলাপাত্মক সঙ্গীতের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। গিরিশচন্দ্রের পরে অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২) ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭) নাম অপেরা-গীতিনাট্যের ইতিহাসে উল্লেখ-যোগ্য। অতুলকৃষ্ণ গীতিনাট্যকার হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করেন। সংলাপধর্মী দ্বৈতসঙ্গীত রচনাতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রসঙ্গে বলেছেন: "অতুলবাবুর অপেরা লিখিবার হাত ছিল খুব ভাল। তিনি শিরী-ফরহাদ হইতে আরম্ভ করিয়া মিনার্ভায় যে কয়খানি বই দিয়াছিলেন, তার একখানিও 'ফেল' হয় নাই।" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অপেরা সম্পর্কে 'গীতিনাট্য' ও 'রঙ্গনাট্য' দুটি শব্দই প্রয়োগ করেছেন। তাঁর 'আলিবাবা' (১৮৯৭), 'বরুণা' (১৯০৮) প্রভৃতি গীতিনাট্য একসময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

এক সময় ঠাকুর পরিবারেও অপেরা-গীতিনাট্যের চর্চা চলেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিলেতি সুরের চর্চা করেছিলেন; তাঁর 'সরোজিনী' (১৮৭৪) নাটকের দুটি গানের সুর ছিল বিলেতি। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সরলাদেবী বিলেতি সুরের চর্চা করেছিলেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র (১৮৮১) আগে এই পরিবারের দু'টি গীতিনাট্যের কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন: স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' (১৮৭৯) ও জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের 'মানময়ী' (১৮৮০)। এই দু'খানি গীতিনাট্য ছিল অপেরাধর্মী। পাশ্চাত্ত্য অপেরা যে সেযুগে বাংলা গীতিনাট্যের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা' পাশ্চাত্ত্য অপেরারই প্রভাব-জাত। রবীন্দ্রনাথ এবিষয়েও অনেক পরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'সুরে নাটিকা'। একেই সুবিখ্যাত জার্মাণ সুরকার ভাগ্‌নার বলেছেন Music Drama. রবীন্দ্রনাথের তিনখানি অপেরাধর্মী গীতিনাট্যের মধ্যে 'মায়ার খেলা'-ই ইতালিয়ান অপেরার সবচেয়ে কাছাকাছি। কারণ সেখানে নাটকের চেয়ে গানের দিকেই কবি সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য দিয়েছেন, 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'য় নাটকের দিকেও লক্ষ্য পড়েছে।

বাংলা অপেরার গ্রাম্যরসিকতায় বিরক্ত হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) একখানি সুরুচিসঙ্গত অপেরা লিখতে মনস্থ করেছিলেন। 'সোরাব-রুস্তম' (১৯০৮) নাটকটির প্রথমাংশ অপেরাধর্মী, কিন্তু দ্বিতীয়াংশ নাটক। নাট্যকার নিজেই ভূমিকায় বলেছেন : 'সোরাব-রুস্তম' দস্তুরমত অপেরা নয়—অপেরায় কতকগুলি নাচ-গান জোড়া দিবার জন্য যেটুকু কথাবার্তার দরকার হয়—সেইটুকু কথাবার্তাই থাকে ; কিন্তু এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কথাই তাহার প্রাণ।... এক কথায়- -ইহা অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে।"

বাংলা নাটকের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে আমাদের দিশি গীতাভিনয় পাশ্চাত্ত্য অপেরার প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এক নূতন ধরণের গীতিনাট্য রচিত হয়েছিল। বিশুদ্ধ পাশ্চাত্ত্যধর্মী অপেরা অল্পই লেখা হয়েছিল। —ব. বা.

ইনিসিয়াল ইন্‌সিডেণ্ট—দ্রঃ নাটকের গঠন (পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্র)।

ইণ্টারলুড—দ্রঃ মিষ্ট্রি, মিরাক্‌ল, মর্যালিটি, ইণ্টারলুড।

উপকাহিনী (সাবপ্লট)—বিয়োগান্ত নাটকে প্রায়শঃই প্রধান দ্বন্দ্বের পাশাপাশি প্রায় সমজাতীয় অপর এক দ্বন্দ্বের অবস্থান লক্ষ্য কবা যায়,—তারই নাম উপকাহিনী (সাব-প্লট)। নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব বস্তুর গভীরতা, তীব্রতা ও মানসিকতা বুঝতে উপকাহিনী পাঠকমনকে সাহায্য করে, আবার প্রধান দ্বান্দ্বিক স্রোতের ভারসাম্যও রক্ষা করে। যেমন শেক্‌সপীঅরেব 'কিংলীয়র' নাটকে রাজা লীয়রের অপরিসীম বেদনাহত জীবন-দ্বন্দ্বের সঙ্গে পাশাপাশি প্রবাহিত হল ডিউক অব গ্লস্টারের বিয়োগাশ্লিষ্ট জীবন নাটিকা। আবার গোল্ডস্মিথের 'সি স্টুপ্‌স্‌টু কংকার'-এ দেখি নাটকেব প্রধান ও অপ্রধান এই দুই গল্প বস্তুর মধ্যে (কেটি-মার্লো ও হেস্টিংস্‌-নেভিল প্রেমোপাখ্যান) সহজ-সুন্দর ভাবসম্মিলন। বস্তুতঃপক্ষে এই দুই অংশ এত সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্যে অলংকৃত যে, গভীর ও একাগ্র দৃষ্টি ব্যতীত এ দুইয়ের মধ্যে যে নাট্যগত কোনো ব্যবধান আছে তা ধরাই পড়ে না।

'এপিসোড' ও 'সাবপ্লট'—দুই-ই মূল কাহিনীকে জটিল করতে, আকর্ষণীয় করতে এবং গতিময় করে 'তুলতে সাহায্য করে। তবে এপিসোড গড়ে ওঠে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা চরিত্রকে অবলম্বন করে' ; মূলকাহিনীর একাঙ্ক

উপরিতলে তার অবস্থান। সাবপ্লট সেদিক দিয়ে মূল কাহিনীর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকে কুমার-ইলা এবং 'তপতী' নাটকে নরেশ-বিপাশা, উপকাহিনী রূপে বিবেচিত হতে পারে। এখানে উপকাহিনী মূল কাহিনীর ভাব-বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। —অ. ভ.

উপন্যাস ও নাটক—উপন্যাস প্রধানত ঔপন্যাসিকের বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত বিশেষ জীবন সত্যে ধরা সমাজ, জীবন, সাধারণ মানুষ ও ব্যক্তিমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতিশায়ী কল্পনা ও অনুভূতির বিবরণাত্মক ও ব্যাখ্যামূলক কাহিনী-নির্ভর শিল্পকথা। মোটামুটি এই সংজ্ঞা থেকে 'বিবরণাত্মক' ও 'ব্যাখ্যা-মূলক' শব্দদুটি বাদ দিলে বাকি প্রতিটি কথা নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এককথায়, নাটক ও উপন্যাসের আন্তর প্রকৃতি, মুখ্য উদ্দেশ্য ও মূলপ্রতিপাদ্যের দিক থেকে সাদৃশ্য সর্বাংশে। উভয়শিল্পের রসপরিণতিও দুঃখময় বা সুখময় কোনটি-ই হতে বাধা নেই।

অন্যদিকে দু'এর সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিয়েছে প্রধানত এদের প্রকাশ কৌশল। নাট্যকার নাটকের আকৃতি সম্পর্কে যতটা সচেতন ঔপন্যাসিক তা নন। তার প্রধান কারণ, রচনাকালে নাট্যকারের সামনে থাকে জটিল মঞ্চ, বিরাট দর্শক সম্প্রদায়, কখনো-কখনো অভিনেতা-অভিনেত্রীর সুযোগ-সুবিধা। নাটকের পাঠকরা যা পান তা উপরি পাওনা। কিন্তু উপন্যাসকারের রচনাগত দায়িত্বের এত ভার ও বিস্তৃতি নেই। সহৃদয় পাঠকমন এবং লেখক-মনন—উভয়ের সহাবস্থানেই উপন্যাসের ঋদ্ধি। মঞ্চ ও অভিনয়ের কথা চিন্তা ক'রে, এমন কি নাটক অভিনয়ের পরেও বহু নাটকের সংলাপ, ঘটনা, চরিত্র বদলাতে পারেন। এ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির নাটক স্মরণীয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখক প্রতিটি সংস্করণে কিছু অদল-বদল করেছেন—এর নজির আমরা আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির উপন্যাস থেকেই পাই। কিন্তু দু'এর লক্ষ্য বিপরীত ও ভিন্ন। নাট্যকারের লক্ষ্য যেখানে বস্তুধর্মী (objective) উপন্যাসকারের সেখানে ভাবধর্মী (subjective)।

এই দায়িত্বের প্রকারভেদেই নাটকের দেহকৌশল যেখানে পূর্বনির্দিষ্ট, অতি আধুনিক পরীক্ষামূলক নাটকের কথা বাদ দিলে অনেকাংশে প্রথানুগ, উপন্যাসের সে'রকম কোন সার্বজনীন নিয়মকানুন নেই। এই বিধি ব্যবস্থায় নাটকের বিবিধ অঙ্গ সংস্থাপনে নাট্যকার যত সংযত, উপন্যাসকার কোথাও

তা নন। নাটকে নাট্যকার থাকেন একেবারে পিছনে, নাট্যকার অনেকটা নিরাসক্ত, ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠকের সামনে আসেন। চরিত্র-গুলির সংলাপই যেখানে নাট্যকারের একমাত্র নির্ভর, উপন্যাসকারের তা নয়। কাহিনী-গ্রন্থন, ঘটনা-সংঘটন প্রভৃতির ফাঁকে ফাঁকে উপন্যাসকার অনেক কথা ও কল্পনা, তথ্য ও তত্ত্ব যোগ করতে পারেন। এই অর্থেই উপন্যাস 'ব্যাখ্যামূলক' ও 'বিবরণাত্মক', নাটক আদৌ তা নয়।

সূক্ষ্ম শিল্পের ক্ষেত্রে নিছক অঙ্গ সৌষ্ঠব অনেক স্থূল। নাটকেরও স্থূল অঙ্গের প্রাণ হল গতি এবং তার তীব্রতার মধ্যেই নাটকের সার্বিক শিল্প-যাথার্থ্য নির্ভর করে। এই গতির তীব্রতায় কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ও নাট্যকারের দর্শন সবই আলোকিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। উপন্যাস অন্যদিকে অনেক শ্লথ, মন্থর। নাটকের মত গতি উপন্যাসেও আছে, কিন্তু উপরোক্ত 'বিবরণ' ও 'ব্যাখ্যা' তার গতিপ্রাণতায় মন্থরতা দান করে। এক কথায় উপন্যাসের গতি-স্বরূপ স্বতন্ত্র। গল্প বলার ধারাবাহিকতায় ও স্বয়ং লেখকের উপস্থিতিতে গতি উপন্যাস-অঙ্গের বাহির থেকে অন্তর-লোকের টানাপোডেনে এবং অনুভূতির অনুশীলনে ও ক্রমবিবর্তনে ধীর চালে চলে।

এক কথায় নাটক যেখানে পবমুখাপেক্ষী, উপন্যাস সেখানে আত্মগত। নাটকের ক্ষেত্রে আদ্যন্ত দর্শকের সমান মর্যাদা, কিন্তু উপন্যাস রচনার প্রাক্‌কালে পাঠকরা গৌণ, রচনার পর মুখ্য হ'য়ে ওঠে। লেখক-পাঠকে যোগাযোগের ব্যাপারটি উপন্যাসে যত সহজ, নাট্যকার-দর্শকে তত নয়। কারণ মাঝখানে মঞ্চ ও অভিনেতা আছে।

আকারের দিক থেকে নাটক অনেকাংশে শিল্পেব তিলোত্তমা। উপন্যাসকে তা বলা যায় না। নাটকের ঈশ্বর বিভিন্ন দেহে বা বিভিন্ন দর্পণে নিজেকে দেখেন, উপন্যাসের ঈশ্বর একই দেহে বিবিধ বর্ণালির মোহ ছডান। তাই নাটক হ'ল বহু খণ্ড শিল্পের সমবায়, উপন্যাস হ'ল একটি খণ্ডিত শিল্পের সর্বাবয়ব বিশুদ্ধি।

অধুনা, আগে চিত্রনাট্য পরে উপন্যাসে রূপান্তরিত সাহিত্যে এ প্রয়াসের নিদর্শন প্রচুর। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটক যথাক্রমে উপন্যাস ও গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে এ উদাহরণ কোথাও নেই বোধহয়। বরং উপন্যাস যে নাটকে সার্থক রূপ পেতে পারে এর উদাহরণ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

'স্বর্ণলতা'র 'সরলা'য় রূপান্তর, শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'র 'ষোড়শী'র নাট্যরূপ গ্রহণ এবং অতি আধুনিক বহু উপন্যাসে আছে। কিন্তু উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিতে গেলে নাট্যকারের কাছে উপন্যাসের বহু চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ যেমন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তেমনি অন্যদিকে নাটকের দেহে কেন্দ্রীয় বক্তব্যের অতিসংযত প্রকাশের জন্য নূতন দৃশ্য, ঘটনা ও চরিত্র ইত্যাদি সৃষ্টি করতে হয়। উভয়ের সম্পর্ক নির্ণয়ে এদিকটিও উল্লেখ্য।

বর্তমান কাল নাটকের বহু ও বিবিধ পরীক্ষার যুগ। অতি আধুনিক নাট্যকার ভূমিকায়, দৃশ্যারম্ভে, এমন কি দৃশ্য ও নাটক শেষে এমন সব ভাষণ যোগ করেন যা প্রধানত নাট্যকারের। এ প্রচেষ্টায় নাটক উপন্যাসের অনেক সান্নিধ্যে আসতে পারে। কিন্তু যা এখনো পরীক্ষা পর্বে, তার স্থায়ী সিদ্ধান্তে আসা আজও বিলম্বিত। —বী. দ

ঋতু নাট্য—রবীন্দ্র-নাট্যের তিনটি ধাপ আছে। এক শ্রেণীর নাটকে মানব অভিনেতাই দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির কোনো স্থান নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে মানুষ প্রধান অভিনেতা, প্রকৃতি সজীব ও সঙ্কেতময় পটভূমিকা। তৃতীয় শ্রেণীর নাটকে প্রকৃতি প্রধান অভিনেতা, মানুষ পটভূমিতে মাত্র আছে, কখনো ব্যাখ্যাতা-রূপে, কখনো কেবল দর্শকরূপে মাত্র।

আমরা এই তৃতীয় শ্রেণীর নাটককেই প্রকৃত ঋতুনাট্য বলিতে চাই। আমাদের মতে নিম্নলিখিত পাঁচখানি নাটককে প্রকৃত ঋতুনাট্য বলা চলে। শেষবর্ষণ, বসন্ত, নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা, নবীন ও শ্রাবণগাথা। গীতোৎসব, সুন্দর ও বর্ষামঙ্গল প্রায় এই শ্রেণীর রচনা, কিন্তু কোনক্রমেই এগুলিকে নাটক বলা চলে না—এগুলি বিশেষ বিশেষ ঋতু-অভিনন্দন উপলক্ষে রচিত বা সঙ্কলিত গানের মালা মাত্র, নাটকীয় লক্ষণদানের কোন প্রচেষ্টা এগুলিতে নাই। কিন্তু যে পাঁচখানিকে ঋতুনাট্য বলিয়া উল্লেখ করিলাম তাহাও ঋতু-অভিনন্দন উপলক্ষে রচিত, কিন্তু পাত্রপাত্রীর সমাবেশ, প্রবেশ ও প্রস্থান প্রভৃতি ইঙ্গিতের দ্বারা এগুলিকে নাটকীয় করিয়া তুলিবার সচেতন চেষ্টা আছে।

এই সব নাটকে দুই শ্রেণীর অভিনেতা দৃষ্ট হয়, মানব ও প্রকৃতি। হয়তো কোনো রাজসভাতে ঋতু-উৎসব লাগিয়াছে। রাজসভার পারিপার্শ্বিকের

মধ্যে রাজা আছেন, সভাকবি আছেন, পরিষদগণ আছে, নাট্যাচার্য আছেন, নটরাজ আছেন, আবার আভাসে সামাজিক শ্রোতাগণও আছেন। আবার আর একদিকে প্রকৃতির প্রতিনিধিস্বরূপ বিভিন্ন ঋতু আছে; নদী আছে; দক্ষিণ হাওয়া আছে; শাল বীথিকা, বেণুবন, আম্রকুঞ্জ, করবী, বকুল, মাধবী, মালতী ইত্যাদি আছে। শেষোক্ত দলই প্রধান অভিনেতা, পূর্বোক্ত মানুষেরা দর্শক এবং ব্যাখ্যাতা মাত্র।

শ্রাবণগাথা ও শেষবর্ষণের নটরাজ এবং বসন্তের কবি নাট্য-ব্যাপারের ব্যাখ্যাকারী। যেমন কোনো কোনো চলচ্চিত্রে একটি অশরীরী বাণীকে ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে শোনা যায়—অনেকটা সেই রকম আর কি। আবার ওই তিনখানিতে রাজা উপস্থিত আছেন, তাঁহাকে আদর্শ শ্রোতা বলা যাইতে পারে। গ্রীক্ নাটকে কোরাসকে 'Ideal Spectator' বলা হইয়াছে, তাহারা কেবল আদর্শ শ্রোতা মাত্র নয়, প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ঘটনার গ্রন্থি উন্মোচনে সাহায্য করিয়া থাকে। কোরাসের সেই দায়িত্ব এখানে রাজা এবং নটরাজ বা কবির মধ্যে যেন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে।

এই সব নাটকে মানব অভিনেতারা গদ্যে কথা বলিতেছেন। গদ্য ব্যাখ্যার জন্যও বটে, আবার এই গদ্যের সাদা পটের উপরে গানের সুর ও পাত্রপাত্রীর নৃত্য উজ্জ্বলতর ভাবে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে বলিয়াও বটে। নৃত্য ও গীত ইহার প্রধান অঙ্গ। গদ্যাংশ গানের সঙ্গে গানকে, ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাকে জোড়া দিতে সাহায্য করিয়াছে মাত্র। নবীন নাটকখানিতেও গদ্য আছে বটে, এবং তাহার উদ্দেশ্যও পূর্ববর্ণিত-মতো রসব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তাহা যে কে বলিতেছে তাহার উল্লেখ নাই; অভিনয়ের সময় স্বয়ং কবি বলিতেন। যিনিই বলুন, তিনি একাধারে আদর্শ দর্শক ও ভাষ্যকার ছাড়া আর কিছু নহেন।

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালায় গদ্য আদৌ নাই। তৎপরিবর্তে গানে ও কবিতায় এটি মিশ্রিত। কবিতাংশ ইহার পটভূমিকা। এই কবিতাগুলিও অভিনয়কালে স্বয়ং কবি আবৃত্তি করিতেন; তাঁহার কাজ ছিল দর্শকের চিত্তে রসোদ্‌বোধনে সাহায্য করা—এখানেও তিনি ভাষ্যকার ও আদর্শ দর্শকের কাজ একাধারে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

—প্র. না. বি.

একাঙ্ক নাটক (একাঙ্কিকা)—বাংলা একাঙ্ক নাটক বিদেশী প্রভাবে রূপ পেয়েছে। অবশ্য উনিশ শতকের হাস্য-কৌতুক বা প্রহসনধর্মী নাটকগুলি আধুনিক বাংলা একাঙ্ক নাটক গঠনে একেবারেই সহায়তা করেনি, এমন কথা বললে ভুল হবে। পরীক্ষামূলকভাবে ছোট নাটক লেখবার চেষ্টা পৃথিবীর সর্বত্রই হয়েছে। বৈষয়িকতার দিক থেকে ইংরেজী পূর্ণাঙ্গ নাটক ষোড়শ শতকে প্রতিষ্ঠা পেলেও একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সপ্তদশ শতকের রঙ্গমঞ্চ একাঙ্ক নাটককে একেবারে বর্জন করলেও অষ্টাদশ শতকে তা' আবার প্রহসন বা ব্যঙ্গাত্মক নাটকের রূপে ফিরে এল এবং বলা যেতে পারে এ সময়ের পর থেকেই এর স্থায়িত্ব এসেছে।

মৌল শক্তির ক্ষেত্রে একাঙ্ক নাটক পূর্ণাঙ্গ নাটকেব রূপভেদ মাত্র। আর যেহেতু এর পরিসর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তাই ইঙ্গিতমাত্র অবলম্বন করে এর দ্বন্দ্ব-সংশয়-বিমূর্ত ছবি ফুটে ওঠে। ভাব, ভাবনা বা সৃষ্টির দিক থেকে একাঙ্ক নাটক পূণাঙ্গ নাটকের চেয়ে কম কৃতিত্বেব দাবী রাখে না। কোন একটি ঘটনা, ভাব, সংস্কাব বা জীবনের খণ্ডাংশকে রূপ দেওয়ার নাট্য কৌশল-বিস্তৃত পরিসরে হয়তো সহজ কিন্তু একাঙ্কের স্বল্প পরিসরে নাটকীয় জীবনের দ্বন্দ্ব-বেদনাকে প্রকাশ করার শক্তি অনেক গভীর। বলা যেতে পারে, গল্পের ক্ষেত্রে ছোটগল্প যেমন তার নিজস্ব চরিত্র বজায় রেখে উপন্যাসের খণ্ডিতরূপকে তুলে ধরে, তেমনি একাঙ্ক নাটকও মৌলশক্তি এবং পরিণতির দিক থেকে সম্পূর্ণতা পেয়েও পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রতি ইঙ্গিত জানায়।

বিদেশে একাঙ্ক নাটকের প্রতিষ্ঠাব জন্যে রীতিমত আ৻ ালন হয়েছে। আঠারো'শ সাতাশি খ্রীস্টাব্দে পারী'র Theatre Libre, আঠারো'শ উননব্বই খ্রীস্টাব্দে বার্লিনের Freie Buhne বা লণ্ডনের Independent Th. বা চিকাগো বা নিউইয়র্কের Hall House Th. ও Washington Square Players ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থা বা দলের চেষ্টাতেই আজ একাঙ্ক নাটক সার্থক রূপ পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অমৃতলাল বসুর চেষ্টাতেই ছোট প্রহসন লেখা হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'। রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটিকাগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সেগুলির অধিকাংশই দু'তিন দৃশ্যে সম্পূর্ণ।

মন্মথ রায় থেকে শুরু করে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত যাঁরা একাঙ্ক নাটক লিখেছেন—তাতে এ যুগের দ্বন্দ্ব-সংশয়ের সঙ্গে বিচিত্র সংস্কার বা বোধের প্রকাশ দেখা গিয়েছে। তা একদিকে যেমন বিভিন্ন সামাজিক সংঘাতের প্রতিক্রিয়া যুক্ত তেমনি অন্যদিকে বিজ্ঞান-সন্ত্রাস, দেহকামনা বা রাজনৈতিক মতের প্রতিফলন। এ ছাড়া দেশ-বিভাগ—যুদ্ধ বা আধুনিক অবক্ষয়ী অবস্থার ছাপ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। —মি. দা.

একোক্তি—দ্রঃ মোনোলোগ।

এপিলোগ—'এপিলোগ' শব্দটি য়োরোপীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করা হয়। ভাষণ-কে (বক্তৃতা) যে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়, (সূচনা, বক্তব্যের উপস্থাপনা, বিপরীত পক্ষের মত খণ্ডন, উপসংহার)—এপিলোগ তার শেষতম অংশ। এই অংশ সমগ্র বক্তব্যের সারসংক্ষেপ বা ফলশ্রুতি।

নাটকের ক্ষেত্রে 'এপিলোগ' শব্দটির অর্থ প্রসার ঘটেছে। সাধারণতঃ নাটক শেষ হয়ে যাওয়ার পর, একটি 'ক্রোডঅঙ্কে' প্রধান চরিত্রের মুখ দিয়ে দর্শকের উদ্দেশে কিছু বলানোর রীতি, শেক্‌সপীঅরের সময় থেকেই নাটকে দেখা যায়। (দ্রঃ 'টেম্পেস্ট' নাটক)। নাটকের দোষত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা; স্বস্তিবচন কিংবা আত্মকথন নিয়ে এপিলোগ গড়ে ওঠে। সংস্কৃত নাটকেও এক ধরণের 'ক্রোডঅঙ্ক' যোজনার রীতি আছে,—যাকে 'ভরতবাক্য' বলা হয় (দ্রঃ শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক)। 'ভরতবাক্য'কে এক ধরণের এপিলোগ বলা যায়। আধুনিক কালেও ইংরেজী নাটকে এপিলোগের ব্যবহার দেখি। তবে সেখানে এপিলোগ বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই ব্যবহার করা হয়। যেমন বার্নাড শ'র 'সেণ্ট জোয়ান' নাটকে এপিলোগ। সেণ্ট জোয়ানের মধ্যে দিয়ে শ' force of evolution দেখাতে চেয়েছেন। জোয়ান চরিত্রে যে বিকাশ (পরিণতি) ঘটেছে, মানবী থেকে মহীয়সীতে, জাতীয়তা-বুদ্ধি থেকে ধর্মোপলব্ধিতে,—তার জন্য এপিলোগ অংশের নাটকীয় প্রয়োজন আছে। বহিরঙ্গ বিচারে জোয়ানের জীবন ট্রাজিডি, কিন্তু এপিলোগ নিয়ে 'সেণ্ট জোয়ান' নাটক একটি কমেডি। বাংলা নাটকে 'এপিলোগ' ব্যবহারের রীতি দেখা যায় না। —অ. রা.

এপিসোড (খণ্ডকাহিনী)—আরিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্‌স গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে ট্রাজিডির একটি সন্ধি-বিশেষের নাম এপিসোড বলে অভিহিত করেছেন। গ্রীক ট্রাজিডি অঙ্ক-বিভক্ত ছিল না, তা কয়েকটি উপবিভাগে বিন্যস্ত ছিল যেমন—প্রোলোগ, এপিসোড, একসোড, প্যারোড ও স্টেসিমোন। প্যারোড ও স্টেসিমোনকে একত্র বলা হয়ে থাকে কোরাস। দুটি সম্পূর্ণ কোরাস-গানের অন্তর্বর্তী অংশটিকে বলা হয় এপিসোড।

ট্রাজিডির বৃত্তের সঙ্গেই এর মূল সম্পর্ক। আরিস্টটল বৃত্তের সাধারণভাবে দুটো বিভাগের উল্লেখ করেছেন—যৌগিক ও সরল বৃত্ত। এই সরল বৃত্তকেই বলা হয় এপিসোডিক বৃত্ত। এপিসোডিক বৃত্তে ঘটনার পারম্পর্য থাকে বটে, কিন্তু পারস্পরিক অনিবার্য যোগসূত্র গড়ে ওঠে না। অর্থাৎ ঘটনা-পরম্পরা কার্য-কারণ-ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে সমগ্র কাহিনীকে একটি ভাবের সম্ভাব্য বা অনিবার্য বিকাশরূপে তুলে ধরতে পারে না। ফলতঃ ঘটনার সামগ্রিকতা ও অখণ্ডতা ব্যাহত হয়। সুনিয়ন্ত্রিত বিকাশ-ধারা অনুসারে অনিবার্য অথচ স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি লাভ করতে পারলে ঘটনা সমগ্রতা বা অখণ্ডতা লাভ করতে পারে। এপিসোডিক বৃত্ত এই শ্রেণীর সম্ভাব্য ও অনিবার্য বিকাশ-ধারার সঙ্গে সংযুক্ত নয়, তা অসংলগ্ন বিস্তার-বাহুল্যে ও রসবৈচিত্র্যে অন্বিত। এক কথায়, কার্য-কারণ সূত্রের বিরোধ, মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীনতা, পরিস্থিতি বিপর্যয়ের (reversal of situation) অভাব, অন্তর-ঐক্যের অনুপস্থিতি এপিসোডিক বৃত্তের মৌল চরিত্র-লক্ষণ। রসের দিক থেকেও এপিসোড গভীর হতে পারে না। যৌগিক বৃত্তে অন্তর্লীন ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ঘটনা যেমন করুণা ও বিস্ময় উদ্রিক্ত করতে পারে, স্বভাবতই সরল বৃত্তে তা সম্ভব নয়। এই জন্যই এপিসোডিক বৃত্তের গঠন ত্রুটিপূর্ণ। আরিস্টটলও একে অপকৃষ্ট গঠন বলে উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তী নাট্যসাহিত্যে এপিসোড কিছু পরিমাণ অর্থ-প্রসার লাভ করেছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন, শাখা কাহিনীর সঙ্গে পৃথক, সম্ভাব্য ও অনিবার্য ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন খণ্ড কাহিনীকে এপিসোড বলা হয়ে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে এপিসোডিক বৃত্তের প্রাধান্য। বাংলা নাট্যসাহিত্যের উদ্ভবকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নাটকে এর অসদ্ভাব ঘটেনি।

প্রথম যুগের নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে'র

ফুলকুমারীর কাহিনী থেকে সুরু করে দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' নাটকের তারা অপহরণ ও পুনরুদ্ধার কাহিনী, 'কমলেকামিনী নাটকে'র শৈবলিনী-প্রসঙ্গ, গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের করিমচাচা ও বহু নাটকে ঐ শ্রেণীর পাগল-চরিত্রের আখ্যান, এমন কি রবীন্দ্রনাথের নাটকেও এপিসোডের অভাব নেই। —অ. গ.

এক্সপোজিশন—দ্রঃ নাটকের গঠন (পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্র)।

ঐক্য—দ্রঃ ত্রয়ী ঐক্য।

ঐতিহাসিক নাটক—ইতিহাস-কাহিনী থেকে ঘটনা, চরিত্র ও পটভূমি গ্রহণ করে যে নাটক লেখা হয়, তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা হয়। ইতিহাস স্থান-কাল-পাত্রের গণ্ডীতে আবদ্ধ। একটা সীমিত কালের সাময়িক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা হয় ইতিহাসের মধ্যে। সেখানে তথ্যই একমাত্র নির্ভর স্থল—এবং তথ্য যেখানে দুর্লভ সেখানে ইতিহাস-কাহিনীও অসম্পূর্ণ। ইতিহাসকে অবলম্বন করে যখন উপন্যাস বা নাটক লেখা হয়, তখন সেখানে শুধু ইতিহাসের সত্য নয়, সাহিত্যের সত্যও রক্ষিত হয়। অথচ ইতিহাসের সত্য ও সাহিত্যের সত্য এক নয়। ইতিহাসের সত্য,—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিশেষ সত্য', অন্যদিকে সাহিত্যে 'নিত্যসত্যে'র প্রকাশ। ঐতিহাসিক উপন্যাস বা নাটকে ইতিহাসের সত্যকে অবিকৃত রেখে সাহিত্যের রস পরিবেশণ করতে হবে। এবং এই সাহিত্য-রস সৃষ্টিতে কবি-কল্পনার প্রয়োজন আছে; রবীন্দ্রনাথ বলবেন: 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি—ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' ঐতিহাসিক উপন্যাস বা নাটকে ইতিহাস অবলম্বনমাত্র,—ইতিহাসের সত্যকে পরিবর্তন করা যাবে না, কিন্তু ইতিহাসের সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে হবে। ইতিহাসের মধ্যে যে অংশগুলি ফাঁকা, স্বাধীন কল্পনার যোজনায় তাকে ভরাট করতে হবে।

অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং নাটকের মধ্যে ইতিহাসের আপেক্ষিক প্রাধান্য নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতান্তরের অবকাশ আছে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, উপন্যাসেই ইতিহাসকে আনুপূর্বিকভাবে রক্ষা করতে হবে, কারণ সেখানে খুঁটিনাটি ব্যাপারও বর্ণিত হয়। অন্যদিকে নাটকে, ইতিহাসের

সারভূত অংশটি গ্রহণ করলেই চলে, সেখানে সীমিত ক্ষেত্রে কালানৌচিত্যও মার্জনীয়। আসলে ঐতিহাসিক নাটককে নাটক হিসেবে সার্থক হতে হবে, এবং অতীতকে জীবন্ত করে তুলতে হলে, তাকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত না করলেই নয়। কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। এইদিক দিয়ে ঐতিহাসিক নাটক বিচার না করলে আমরা তার প্রতি অবিচার করব।

শেক্‌সপীঅরের ঐতিহাসিক নাটকগুলি আজও আমাদের আকর্ষণ করে। কিন্তু কেন? দেশ ও কালের ব্যবধান তো অনেকখানি,—কেমন করে এই দূরত্বের অপনোদন সম্ভব হোলো? বলাবাহুল্য, এর উত্তরের মধ্যেই রয়েছে, ঐতিহাসিক নাটকের সফলতার রহস্য।

সমালোচকেরা শেক্‌সপীঅরের ঐতিহাসিক নাটকগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার মধ্যে বিশেষ একটি লক্ষণ দেখেছেন, যা তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতাদের ছিল না। শেক্‌সপীঅর যদিও ইতিহাস থেকে চরিত্র আহরণ করেছেন, এবং রাজনৈতিক পটভূমিও যথাযথ রক্ষা করেছেন, তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক কতকগুলি মানুষের বর্ণনা করেননি, তাঁর রিচার্ড সেকণ্ড, রিচার্ড থার্ড, হেনরী ফিফ্‌থ, সীজার প্রভৃতি কতকগুলি 'ব্যক্তি-চরিত্র' রূপেই আজও আমাদের আকর্ষণ করে। আসলে শেক্‌সপীঅর চরিত্র সৃষ্টিকালে কোন রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেননি বা ব্যক্তিগত পক্ষপাতের পরিচয় দেননি—ফলে হ্যামলেট, ম্যাকবেথের মতই আন্তর-পরিচয় সমন্বিত চরিত্র হয়ে উঠেছে রিচার্ড সেকণ্ড এবং অন্যান্যেরা। ইতিহাসের চরিত্র নাটকের চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। হ্যাজলিট্ শেক্‌সপীঅরের নাটক আলোচনা কালে ওয়াল্টার স্কটের সঙ্গে তুলনায় তাঁব কৃতিত্ব বিচার করেছেন, এবং ইতিহাসের পরিবেশণায় শেক্‌সপীঅরের প্রকৃত শক্তিকে 'over informing power' নামে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাকে বলতে পারি 'সত্যরক্ষা পূর্বক বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতা'। বলাবাহুল্য সৃষ্টিক্ষম কল্পনা ব্যতীত ইতিহাস প্রাণলাভ করে না, রবীন্দ্রনাথ-ঈপ্সিত 'ঐতিহসিক রস'ও সঞ্চারিত হয় না।

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'ই (১৮৬১) বাংলার আদি ঐতিহাসিক নাটক। যদিও তার উৎস টডের 'রাজস্থান' সর্বদা তথ্যাশ্রয়ী নয়। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী

বা চিতোর আক্রমণ নাটক' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) প্রভৃতি নাটকগুলির কাহিনী ইতিহাসের পটে স্থাপন করা হলেও, তার মধ্যে দেশপ্রেমের উন্মাদনাই অধিক প্রকাশ পেয়েছে; 'চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ত্ব' নেই। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' (১৩১২), 'মীর কাসিম' (১৩১৩) ও "ছত্রপতি' (১৩১৪) নাটকও 'দেশপ্রেমাত্মক ঐতিহাসিক নাটক'। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে (প্রতাপ সিংহ—১৩১২, দুর্গাদাস ১৩১৩, নূরজাহান—১৩১৪, মেবার পতন—১৩১৫, সাজাহান—১৩১৭ ও চন্দ্রগুপ্ত—১৩১৮) ইতিহাসের সত্যকে আদর্শবাদ ও মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র-বিকাশের আধারে পরিবেশণ করা হয়েছে। সমালোচকেরা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটককে 'ঐতিহাসিক নাটক' বলতে রাজী নন; কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, কল্পনার যোজনা ও কালানৌচিত্য দোষ থাকা সত্ত্বেও,—ঐতিহাসিক রস ও নাট্যরস পরিবেশনে বাঙালী নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছেন। —অ. রা.

কবিতা ও নাটক—দৃশ্যতঃ এবং চরিত্রের দিক থেকে স্পষ্ট ভিন্নতা সত্ত্বেও নাটক এবং কবিতার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সংযোগ সহজেই লক্ষণীয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমানের পরীক্ষা-চঞ্চল পর্বেও এই সংযোগ অক্ষুণ্ণ। গদ্য জন্মলাভের পুর্বে যখন কাব্যই ছিল-সাহিত্য শিল্পীর অনন্য মাধ্যম, তখন যে নাটক রচিত হ'ত স্বভাবতই তা' কবিতার উচ্চারণ পদ্ধতি এবং স্বভাবের অচ্ছেদ্যতা থেকে বিমুক্ত থাকতে পারত না। বর্তমানেও কবিতা এবং নাটককে বিভিন্ন কৌশল ও মানসিকতায় মিশ্রিত ক'রে নব্য আঙ্গিক সৃষ্টির দৃষ্টান্তও বিরল নয়। ভারতীয় প্রাচীন আলংকারিকদের বিচারেও নাটক যখন দৃশ্যকাব্য ব'লে বর্ণিত তখন কবিতা ও নাটকের আত্মীয়তা স্পষ্টই স্বীকৃত হয়েছে।

কবিতা কবির নির্জন আত্মার আবেগ-স্পন্দিত সুশৃংখল আলোকিত কলরব। হৃদয়ের অভ্যন্তরের আন্দোলিত বিস্ময়, অনুভব কিংবা রহস্যময় কম্পন কবির ব্যক্তিচৈতন্যের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়। এই স্পন্দিত ধ্বনি নিরবধি কাল ও চিরকালের মানুষের প্রতি ধাবিত হ'য়ে যে ভাবলোক নির্মাণ করে তার বিশ্বকর্মা ও ঈশ্বর কবি স্বয়ং। কবিতায় কবির একনায়কত্ব অহংকৃত ঘোষণা লাভ করে। কবিতার চরিত্রলিপিতে একটি হৃদয়ের

ক্রিয়াদ্বন্দ্বই প্রায় সব কথা। অপরপক্ষে নাটক বহুচরিত্রের সমবায়, নানা ঘটনা ও দ্বন্দ্বের আবর্তভূমি। নাটকের মূল বিষয়টি ক্রমশ বিস্ফোরিত হয়ে বিভিন্ন ঘটনা, চরিত্র ও সংঘাতের মধ্যে অগ্নিকণার মতো জ্বলতে থাকে। নাটক ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে তাই খণ্ড খণ্ড হয়ে অখণ্ডতা নির্মাণ করে—যেন অনেক গ্রহ, উপগ্রহ নক্ষত্রের মিলিত আকাশ। কবিতার নভোমণ্ডলে প্রায়শই একটি মাত্র জ্যোতিষ্ক—তা কবির আবিষ্ট মনোলোক। সেখানে বহু মানুষের বেদনা, বিস্ময়, আবেগের তরঙ্গ উপনদী শাখানদীর মতো বহমান থাকে মাত্র, কবি হৃদয়ের মন্ময় স্রোতটিই প্রধান। এ ছাড়াও কবিতা এবং নাটকের মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নাটক ঘটনা আশ্রিত, কবিতা ঘটনার প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি। কবিতায় নাটকের মতো কাহিনী আবশ্যিক নয়। মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য ইত্যাদিতে কাহিনী থাকলেও কেবলমাত্র কাহিনী গৌরবেই কাব্যের প্রতিষ্ঠা কোথাও নেই, কাব্যচরিত্রের উজ্জ্বল প্রকাশই কবিতার প্রথম ও শেষ কথা। নাটকের মঞ্চযোগ্যতা, প্রত্যক্ষতা এবং বস্তুসাপেক্ষতা কবিতার ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। নাটকের উপস্থাপনা প্রত্যক্ষ মঞ্চে, কবিতার ক্রিয়া-সংঘাত অলক্ষ্য, অন্ধকার মনোভূমির নিভৃতে।

এ-জাতীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও নাটক ও কবিতাকে পূর্ণ বিচ্ছেদে আলাদা করা সম্ভব নয়। প্রাচীন গ্রীক্ ও ভারতীয়, মধ্যযুগের য়োরোপীয় এবং প্রাচীন চীন ও জাপানের নাটকগুলির মধ্যে কবিতার ভূমিকা স্মরণীয়। এ-পর্বের প্রত্যেক নাট্যকারই কবি বলে সমশ্রদ্ধায় সম্মানিত। গ্রীক নাট্যকার; শেক্‌সপীঅর, মার্লো; কালিদাস, ভাস, ভবভূতি, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা যেখানে নাট্যকার সেখানেই কি কবি বলেও বন্দিত নন?

নানাক্ষেত্রে কবিতা ও নাটকের মধ্যে মিল রয়েছে। **ড্রামাটিক মনোলোগ**, বা নাটকীয় আত্মভাষণের মধ্যে নাটক ও কবিতার সখ্যতা স্পষ্ট। এখানে নায়ক বা নায়িকার ক্রীয়াশীল আত্মা (soul in action) বিক্ষুব্ধ আবর্তে আহত হয়ে জীবনের একটি নাট্য-মুহূর্তকে কবিতায় প্রকাশ করে। এই শ্রেণীর রচনা কবিতা হলেও পরিবেশ, আবেগ এবং ভাব-সংকটের দিক থেকে নাটকের সমধর্মী। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রসঙ্গত স্মরণীয়। ব্রাউনিং (My Last Duchess, The Bishop Orders his Tomb-কবিতা), টেনিসন (Ulysses), ফ্রস্ট লোয়েল, টি. এস. এলিয়ট (The

Love Song of J. Alfred Prufrock) ড্রামাটিক মনোলোগ রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। য়োরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে 'ক্লোসেট্ ড্রামা' বলে পরিচিত বিষয়টি নাটকের আঙ্গিকে লিখিত হলেও শ্রব্যকাব্য হিসেবেই গৃহীত হয়েছে। রেণেসাঁস পর্বে ইংলণ্ডে 'মাস্ক' জাতীয় নাটকগুলির মধ্যেও কাব্য ও সঙ্গীতধর্ম প্রকট ছিল। Fletcher, Ben Jonson এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিশেষ করে মিলটনের 'Comus' মাস্কটি উচ্চশ্রেণীর কাব্যশক্তির চিহ্ন বহন করে। এলিয়টের Murder in the Cathedral, Family Reunion, The Coktail Party, The Confidential Clerk নাটক হলেও কবি এলিয়টের ক্ষমতাকেও উজ্জ্বল করেছে। কবি ইয়েট্‌সের কাব্য-নাটকগুলিও উচ্চাঙ্গের কাব্যশক্তির নিদর্শন। বর্তমানকালে কাব্যনাটক রচনায় যে প্রবল উৎসাহ লক্ষণীয় তার পশ্চাতে কবিতা ও নাটকের মিশ্রণ ও সম্পর্ক নির্ধারণের সচেতন পরীক্ষা কাজ করছে। —মো. চ.

কমেডি (সুখময় নাটক)—যা সুখময় ও শুভান্ত তাই-ই কমেডি। একটি প্রসন্ন অথচ প্রদীপ্ত বিষয় নিয়ে কমেডির কাহিনী রচনা করা হয়। সমাজের অতি সাধারণ লোকেরা কমেডির মধ্যে ভিড় করে দাঁড়ায়। তাদের জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তরঙ্গপ্রবাহের ন্যায় দ্রুততালে একটা পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। একদিকে বহির্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, অপরদিকে তাদের জীবনের সুখ, দুঃখ ও বেদনা—উভয়প্রকার আলোড়নে নাটকীয় ঘটনা জটিলতর হয়ে ওঠে। সে জটিলতা নাটকের সমাপ্তিতে মধুর ও আনন্দময় হয়ে দেখা দেয়। সুতরাং কমেডি সম্বন্ধে সহজেই এই কথা বলা চলে যে—"In Comedy the poet imitates the action of the people in middle or low condition. The ending of the Comedy is happy."

কিন্তু ক্লাসিক্যাল্ কমেডি রচনার আর একটি সর্ত ছিল। ক্লাসিক্যাল্ কমেডির আরম্ভ হত দুঃখময় ঘটনা দিয়ে এবং শেষ হত সুখময় ঘটনায়। Terence-এর নাটকে এইরূপ আদর্শ লক্ষ্য করা যায়। দান্তে তাঁর মহাকাব্য আরম্ভ করেছিলেন নরকের বীভৎস দৃশ্য দিয়ে এবং সমাপ্ত করেছিলেন একটি আনন্দময় পরিণতিতে। এইজন্যই বোধহয় তাঁহার কাব্যের নামও দিয়েছিলেন—Divine Comedy; কিন্তু এই নিয়ম এখনকার দিনে আর চলে না।

কমেডি জীবনের গভীরতম প্রশ্নের জবাব দেয় না, জীবনের সহজ ও লঘু দিকটি উজ্জ্বল করে তোলে। ট্রাজিডিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে একটা পরম শান্তি, একটা প্রকাণ্ড সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ট্রাজিডির ন্যায় কমেডিতেও অসংগতির আঘাত লক্ষ্য করা যায়। এ অসংগতি বা বিরোধ ট্রাজিডিতে যেমন প্রবল, কমেডিতে অবশ্য ততটা নয়। কমেডির দুঃখ হাস্যরসে সমুজ্জ্বল, ট্রাজিডির দুঃখ অশ্রুজলে রূপান্তরিত— 'যেমন, বরফের উপর প্রথম রৌদ্র পড়িলে তাহা ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকে এবং রৌদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিলে তাহা গলিয়া পড়ে।' সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা চলে যে,—'অসংগতি কমেডিরও বিষয়, অসংগতি ট্রাজিডিরও বিষয়। কমেডিতে ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পায়। ফল্‌স্টাফ উইণ্ডসরবাসিনী রঙ্গিনীর প্রেমলালসায় বিশ্বস্তচিত্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দুর্গতির ...শস লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন. রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করিয়া, বনবাস প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া, রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্য সুখের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় স্থলেই আশার সহিত ফলের, ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, অসংগতি দুই শ্রেণীর আছে, একটা হাস্যজনক, আর একটা দুঃখজনক। ··অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইয়া থাকে (কৌতুক-হাস্যের মাত্রা : পঞ্চভূত)

এখন বলা যেতে পারে যে, ট্রাজিডি ও কমেডির পার্থক্য শ্রেণীজাত নয়, মাত্রাগত। একই অসংগতির উঁচু ও নীচু সুরের উপর ট্রাজিডি ও কমেডি গড়ে ওঠে। ট্রাজিডির ন্যায় কমেডি কোন গভীর বিষয়ের সমাধান করে না বটে, কিন্তু দর্শকের মনকে সর্বপ্রকার তুচ্ছতা ও মলিনতার ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।

সমালোচকগণ কমেডিকে নানাভাবে ভাগ করেছেন। (১) যে নাটকের মধ্যে কবিত্ব ও কল্পনার প্রাচুর্য থাকে, তাকে Romantic Comedy বলে। (২) সামাজিক রীতিনীতির বিদ্রূপাত্মক অবতারণাকে বলে Comedy of Manners, (৩) Comedy of Intrigue-র পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে

কেবল চক্রান্তই দেখতে পাওয়া যায়। (৪) যে নাটকে মানবজীবনের দোষ গুণ বিচিত্র চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, তাকে বলে Comedy of Characters. (৫) নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামির দ্বারা যে নাটকে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়, তাকে Low Comedy বলে।

বাঙ্‌লা ভাষায় অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক শুভান্ত কমেডির অভাব নেই। বাঙ্‌লা সমাজের নানা দুঃখময় সমস্যা (যেমন বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, ঘরজামাই রাখার রীতি, বৃদ্ধের তরুণী ভার্যাগ্রহণ, মদ্যপানের আধিক্য, জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি, গলাবাজি প্রভৃতি) নানা ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন করে কমেডির মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'নবীন-তপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা', 'খাসদখল', 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'মৌচাকে ঢিল', প্রভৃতি কমেডির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। —বি বা.

কাটাসট্রফি—দ্রঃ নাটকের গঠন (পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্র)।

কাথারসিস্ (Catharsis)—কাথারসিস্ বলতে সাধারণতঃ বোঝায় আবেগের শুদ্ধি অথবা অবরুদ্ধ আবেগের ফলশ্রুতিকে চেতনার স্তরে নিয়ে এসে শোধিত করণ।

আরিস্টটলের 'পোয়েটিক্স্' গ্রন্থে বিয়োগান্তাশ্রিষ্ট শোধন (ট্রাজিক কাথারসিস্) সম্পর্কে তাঁর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ সমালোচকদের মধ্যে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও তাঁদের সমালোচনা অদ্যাপি কোনো সুনির্দিষ্ট ও সন্তোষজনক মীমাংসায় পৌঁছুতে পারেনি। 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের এই বিতর্কমূলক সূত্রটি এখানে উদ্ধৃত হোলো: 'Tragedy through pity and fear effects a purgation (Catharsis) of such emotions.' করুণা ও ভীতির এই কাথারসিস্ বা শোধন বলতে প্রকৃতপক্ষে আরিস্টটল কী বোঝাতে চেয়েছেন এবং কেমন করেই বা বিয়োগান্ত নাটকে এই শোধন ক্রিয়া সংঘটিত হয়?

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'কাথারসিস্'কে এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: 'কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই পরিশোধন নৈতিক, কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহার উপমা পাওয়া যায় ধর্মোন্মাদনার উপশমে; অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে কাথারসিসের ব্যাখ্যার সূত্র পাওয়া যাইবে শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্রে। কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে, কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ধর্মের কথা

শুনিতে শুনিতে বা ধর্মের গান শুনিতে শুনিতে মূর্ছাহত হইয়া পড়েন। তখন তাহাদিগকে সেই ভাবাবেশ হইতে মুক্ত করিতে হইলে ঠিক সেইরকম সঙ্গীত প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয়, যাহা তাঁহাদের সমাধি বা মূর্ছা আনয়ন করিয়াছিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও এই মতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রোগের যে-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকেই উদ্রিক্ত করিলে যে-বিষ ভিতরে আছে তাহা বাহির হইয়া যাইবে এবং রোগের উপশম হইবে। আমাদের হৃদয়ে নানাবিধ প্রবৃত্তি আছে—ভয় ও অনুকম্পা তাহাদের অন্যতম। ইহারা বেদনাদায়ক। ভয়ের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, অনুকম্পাও পীড়াদায়ক, অপরের দুঃখের জন্য দুঃখিত হইলেই অনুকম্পা জাগ্রত হয়। ট্রাজিডিতে যে কাহিনী বর্ণিত হয়, যে ভাবে চরিত্র সৃষ্টি করা হয়, যে-সকল ভাব প্রকাশিত হয় তাহা হইতে আমাদের হৃদয়ে নাট্যোল্লিখিত নায়ক-নায়িকার জন্য তীব্র অনুকম্পা উদবোধিত হয় এবং ভয়ও হয় যে, আমরাও তো এইরূপ মানুষ, এবং অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে আমাদেরও তো এই দশা হইতে পারে। এইভাবে ভয় ও অনুকম্পার উদ্রেক হইলে, ইহাদের মধ্যে যে বেদনাদায়ক আতিশয্য আছে তাহা নির্গত হইয়া যায় এবং চিত্ত সুস্থ, প্রশান্ত অবস্থা লাভ করে।'

আরিস্টট্‌ল সম্ভবতঃ এই কাথারসিস্ বা শোধন শব্দটি মানসিক ক্ষেত্রে প্রবলতর প্রবৃত্তি বা আবেগের সবজয়ী সংঘাতময়তার কথা ভেবে প্রয়োগ করেছেন (যেমন আমরা শেক্‌সপীঅরের ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট ইত্যাদি নাটকে উচ্চাশা, ঈর্ষা, জিঘাংসা ইত্যাদির ভয়াবহ সংঘাত দেখতে পাই)। প্রবৃত্তি বা আবেগজাত এসব সংঘাত স্বভাবতঃই করুণা ও ভীতিপ্রদ উপসংহারের জনক এবং মঞ্চে প্রবৃত্তির এই ভয়াবহ পরিণাম প্রদর্শনের দ্বারা তাদের অবদমন-প্রচেষ্টার মধ্যেই কাথারসিস্ বা শোধনের কারুকৃতি নির্ভরশীল। সহজ কথায়, মঞ্চে প্রবৃত্তির ভয়াবহ পরিণাম দেখানোর মধ্য দিয়ে প্রবৃত্তিকে দমন বা সংযত করার নামই 'শোধন'। —অ. ভ.

কাব্য-নাট্য—কবিতার ভাষা ছিল প্রথমযুগে নাটকসৃষ্টির স্বাভাবিক অবলম্বন। ফলে কাব্য-নাট্যকে বলা যায় নাটকের প্রাথমিক রূপ। কিন্তু গ্রীকরা অথবা শেক্‌সপীঅর ভালোই জানতেন যে নাট্যকলা জীবনের প্রত্যক্ষ ছবি। কবিতার ভাষা কেমন করে জীবনের এই প্রত্যক্ষতা প্রমাণ করে? ড্রাইডেন

এ-সমস্যা উত্থাপন করেছিলেন। আমরা কি ছন্দে কথা বলি? না, ছন্দে বলি না, তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও আলাপন থেকে যে ছন্দ আবিষ্কৃত হয় এবং যা আমাদের আদিম সত্তার স্পন্দনের সঙ্গে স্মৃতির দ্বারা যুক্ত করে দেয়, তাকে যোগ্য রূপ দেওয়াই সাহিত্যের ধর্ম। তবে নাটকের ছন্দ নির্বাচনপ্রসঙ্গে মনে রাখতে হয় যে লোকভাষা ও লোকস্পন্দনের নিকট-সন্নিহিত হতে হবে তাকে, যেন পদ্যছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তা গদ্যের এক বিপরীত মেরু রচনা না করে। গ্রীক্ নাটকের ছন্দ ছিল তৎসাময়িক লোক-ভাষাবহনের সর্বাধিক উপযোগী। শেক্‌সপীঅরের ব্ল্যাঙ্কভার্স এলিজাবেথীয় যুগের প্রশ্বাসকে ঠিকমতো স্পর্শ করতে পেরেছিল। অনুরূপ সাধনায় বাঙলাদেশে গিরিশচন্দ্রকে গৈরিশ ছন্দ উদ্ভাবন করতে হয়, অথবা রাজা ও রাণী থেকে বিসর্জন-চিত্রাঙ্গদার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবহমান ছন্দকে ক্রমেই আলাপচারীর ভাষা করে তুলতে চান।

কিন্তু পরবর্তী কবিকুল পূর্বসূরীর সাধনাকে পেয়ে যান প্রথার মধ্যে। প্রথার সাধনায় ক্রমে জীবনের নিঃশ্বাস অস্পষ্ট হয়ে আসে। তখন 'নাট্য' কথাটি এক ম্রিয়মান আঙ্গিক হয়ে পড়ে মাত্র, কাব্যই অধিকার করে নেয় প্রধান ভূমি। কবি তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ ও ধারণাবলী বিন্যস্ত করে প্রকাশ করতে চান, জীবন থেকে অনুভবে নয়, অনুভব থেকে জীবনের দিকে অগ্রসর হতে চান। এ-পদ্ধতির জন্য স্বতন্ত্র রীতি প্রয়োজন। তার পরিবর্তে যদি পুরাতন কাঠামোকে গ্রহণ করেন কবি তবে কাব্য-নাট্যের পরিবর্তে দেখা দেয় নাট্য-কাব্য, কখনো বিশদ, কখনো সংহত।

নাট্যচর্চায় শেলি বা কীটস্ ভালো করে লক্ষ্য করেননি যে পূর্বতন নাট্য-ছন্দের রীতি এখন অব্যবহার্য, তাতে লোকভাষার স্পন্দন নেই। নাট্যোপযোগী সেই মুক্ত ছন্দ অনেক পরে আবার ইংরেজিতে এলো, এলিয়টের মধ্যে। মঞ্চসাফল্যের দিক থেকে শিলার যে গ্যেটের চেয়ে বড়ো ছিলেন, এও তাৎপর্যপূর্ণ। গ্যেটের ছিল আত্মার সন্ধান। তাঁর চরিত্র সেই সন্ধানের প্রতীক। শেক্‌সপীঅর যেমন অনায়াস কৌশলে গভীর আত্মধ্যান এবং চরিত্রের প্রতীকী তাৎপর্যকে জীবনের প্রত্যেক বিন্দুতে মিলিয়ে দিতে পারেন, গ্যেটে বা পরবর্তী কাব্যনাট্যের স্রষ্টারা সেই বহির্জীবন বা objective correlative-কে সবসময়ে দৃঢ় মুঠোয় রাখতে পারেন না। এই [illegible] যতই শিথিল হয়ে পড়ে, কাব্য-নাট্য ততই নাট্য থেকে এগিয়ে যায় কাব্যের দিকে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিশ্বমঞ্চে বাস্তবতার দাবি ঘোষিত হলো। বস্তুত এ-দুটি পরস্পর অন্বিত বিষয়। একের প্রয়োজনে অপরের শক্তিসঞ্চয়। কিন্তু ইবসেন বা শ'এর সমাজচর্চাকে ঈষৎ অগ্রাহ্য করে অল্পদিনের মধ্যেই পরা-বাস্তব-সন্ধানী প্রতীকসম্বল এক লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব হলো। কেবল গদ্যভাষা নয়, মঞ্চে তাঁরা আবার ফিরিয়ে আনলেন কবিতাকে। রোমান্টিক বা ভিক্টোরীয় যুগের দ্বিধা অতিক্রম করে এখন তাঁরা কাব্য-নাট্যের এক বহুলতা-বর্জিত ঘটনা-দীন প্রতীকী রূপ সৃষ্টি করলেন এবং ইয়েটস্ জানিয়ে দিলেন, 'whatever we lose in mass and in power we should recover in elegance and in subtlety !'

ফলে এই সময় থেকে কাব্য-নাট্যের এক নূতন সংজ্ঞা রচিত হতে লাগল। কাব্য-নাট্য এখন গদ্য-নাট্যের প্রতিস্পর্ধী, elegance এবং subtlety যার লক্ষ্য। এক সময়ে যখন নাটক বলতেই কাব্য-নাট্য বোঝাত, তার থেকে আমরা অনেক সরে এসেছি। এই নূতন অর্থে কবিতা হলো নাটকের অপরিহার্য অন্বেষণ। কেননা রহস্যময় আত্মিক এবং সাঙ্গীতিক জগতের ধ্যান ও সন্ধান, এই হলো ইয়েটস্-প্রমুখ নাট্যকারদের বিষয় বা থীম। এই বিষয়ের জন্য যোগ্য ভাষা প্রয়োজন, কবিতার মেদুরতা তাই অত্যাবশ্যক। প্লট বা কাহিনী এ-সব রচনার পক্ষে গৌণ হয়ে এলো, গভীরতর সত্যসন্ধানের উপযুক্ত থীম-ই এখন পুরোবর্তী হয়ে দেখা দিচ্ছে। তবে এই অর্থে কাব্য-নাট্যে গদ্যভাষাও ব্যবহৃত হতে পারে কিনা তা বিবেচ্য। গদ্য কবিতা যদি সম্ভব, তবে গ র সাহায্যে কাব্য-নাট্যের অভিপ্রেত মায়াজগতে পৌঁছনোও বা অসম্ভব কেন ? মেটারলিঙ্ক বা সীঞ্জ-এর কোনো কোনো গদ্য অথবা রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরে যে গদ্যের ব্যবহার, তার প্রত্যেক স্পন্দনে তো কবিতারই নিঃশ্বাস।

তবে গদ্যের দ্বারা কাব্য-নাট্যের এই সম্ভাবনা এলিয়ট স্বীকার করবেন না। অল্পদিনের ব্যবধানে অ্যাবারক্রম্বি,ইয়েটস্ এবং এলিয়টকে কাব্য-নাট্যের সম্ভাবনা ঘোষণা করে প্রবন্ধ এবং নাটক রচনায় উৎসুক দেখতে পাই। সৃষ্টির বিচারে অ্যাবারক্রম্বি ততো জরুরী নন, কিন্তু ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য নাট্যের নবযুগ দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমি অর্জন করল। ইয়েটসীয় ধরণ থেকে এলিয়টী এই ধরণ অনেক পৃথক। ইয়েটসের থীম বা প্রতীক বা কাব্যকৌশল স্বতঃপ্রকাশ। কিন্তু কাব্য-নাট্যের

অপর মুখ যে বাস্তবতার অভিমুখী, এ সত্য তিনি কার্যত ভুলেছিলেন। অর্থাৎ এ-ধরণের রচনায় কবির ক্রিয়া বেশি, নাট্যকার অনুবর্তী। সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে কাব্য-নাট্যের যে নবীন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে তাও এই বাহুল্যবর্জিত নাট্যনির্যাস রূপ। মঞ্চের সঙ্গে অথবা জনরুচির সঙ্গে এর সংগ্রাম যেন প্রকাশ্যে ঘোষিত। কিন্তু এলিয়টের ধরণ আরো বেশি সাহসী, উচ্চাশী, জীবনকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবার দিকে আরো বেশি উন্মুখ। ফলে নাট্যস্বভাবে এলিয়ট অনেক অগ্রসর।

জীবনের সমগ্র সত্তাকে গ্রহণ করাই যদি তাঁর নাটকের অভিপ্রায়—এমনকি আধুনিক চরিত্রাবলীকে তাঁদের সঙ্গত জীবনবৃত্তে উপস্থাপিত করাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য—তবে কাব্য-নাট্য কেন, গদ্য-নাট্য কেন নয়? 'সমগ্র' বলেই গদ্য-নাট্য নয়, এই হয়তো এলিয়টের উত্তর হবে। বস্তুত কাব্য-নাট্যের প্রবক্তা যাঁরা, তাঁরা মনে করেন গদ্যের দ্বারাই জীবনকে আমরা খণ্ডীকৃত বা অংশ করে নিই, তার দ্বারা কিছু সাময়িক সমস্যার উত্তেজক রূপটি ধরা যায় বটে কিন্তু তা কখনোই চিরন্তনের সামগ্রী হতে পারে না। গ্রীক্‌নাট্য বা শেক্‌সপীঅরেব তুলনায় বার্নাড´শ' কতোই ক্ষণজীবী। যদি জীবনের লিরিক মুহূর্তগুলির যথোচিত আবিষ্কার এবং ব্যবহার না করতে পারি, যদি জীবনেব অন্তর্গত নক্সাটিকে ঠিকমতো লক্ষ্যগোচর না করতে পারি—তবে নাটক তাব মহিমা হারায়। কিন্তু এই প্রয়োজনে 'গদ্য নিষ্ফল, গদ্যকে সহসা কবিতার দিকে নিয়ে যাওয়া অথবা 'কাব্যিক গদ্য' নির্মাণ করাও এলিয়টের প্রস্তাবে অসমীচীন, কেননা তার দ্বারা সাহিত্যমাধ্যমের শুদ্ধতা এবং ঐক্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা।

যে-কোনো মুহূর্তে ভাবনা বা অনুভব অনুকূল গাঢ়তায় প্রবেশ করতে পাবে, এমন কাব্যভাষা তাই নির্মাণ করতে হবে কাব্যনাট্যে, তার জন্য স্থিতিস্থাপক, নম্য এক ছন্দের প্রয়োজন এবং এর দ্বারা একদিকে যেমন নাটকে জীবন-চিন্তার সাময়িকতা ও কবিকল্পনার চিরন্তনতা যুক্ত হবে, অন্যদিকে তেমনি কবিতার জগৎও প্রসারিত হবে বহুদূর। নিছক ব্যক্তিগত আবেগ থেকে কবিতাকে সরিয়ে আনা প্রয়োজন, তাকে স্থাপনা করা উচিত বস্তুগত ক্রিয়াশীলতার মধ্যে, এই আধুনিক কাব্যচিন্তারও একটি সক্ষম প্রকাশ তাই দেখতে পাব আধুনিক কাব্য-নাট্যে।

এই শতাব্দীতে এখন সময়ের চেতনা পরিবর্তিত। একটি মুহূর্তের মধ্যে

সমস্ত কাল সঞ্চিত, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়ে যায়। এই মুহূর্তের উপলব্ধি ও বিস্তার, ত্রিস্তর এই সময়ের উদ্ঘাটন কাব্য-নাট্যেরই বিষয় হতে পারে। আবার এরই প্রয়োজনে নাট্যগত গাঢ় ঐক্যের চেতনা আবার ফিরে এলো। শ'এর অনুমান সত্য করে আধুনিক নাট্যচর্চা গ্রীক্ নাটকের দিকে হেলে পড়ছে, কেবল কাব্যরূপ বা কোরাসের পুনর্ব্যবহারে নয়, তার সামগ্রিক গঠনের মধ্যেও। আজ তাই অল্পসময়ের মধ্যে বিশ্বের সর্বত্র কাব্য-নাট্য এক ব্যাপক আন্দোলনের অন্তর্গত হলো, ফ্রান্সে ক্লোদেল আর ককতো, জার্মানিতে হফ্‌মানস্টল, ইতালিতে দানুৎসিও, স্পেনে লর্কা এবং ইংরেজি ভাষায় অডেন আর ইশারউড ইতিমধ্যে যাকে এক দৃঢ় সম্ভাবনার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। সর্বোপরি আছেন আধুনিক কাব্যনাট্যের কুলগুরু, টি. এস. এলিয়ট। —শ. ঘো

কার্য—দ্রঃ নাটকের গঠন (সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র)।

কোরাস—কোরাস শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ বাংলাভাষায় নেই এবং যে অর্থে গ্রীক্ নাটকে এর প্রয়োগ তা বাংলা নাটকে হয়নি। বাংলায় একে ঐকতান, ধুয়া বা দোহার বলা চলতে পারে। আরো স্পষ্টভাবে কোরাসকে নৃত্যগীত-বাদক সম্প্রদায় বলাই বাঞ্ছনীয়।

প্রাচীন গ্রীক্ নাটকে এই নৃত্য-গীত-বাদক সম্প্রদায় নাটকের এক বিশেষ অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে নিয়ে গঠিত হত এই দল। সংখ্যার দিক থেকে এস্কিলাস বারোজনের সম্প্রদায় ব্যবহার করেছেন, যেমন সোফোক্লিস ব্যবহার করেছেন পনেরো জনের। হাস্যরসাত্মক নাটকগুলিতে বারোজন পুরুষ ও সমান সংখ্যক স্ত্রীর ভূমিকা থাকতো।

গ্রীক্ নাটকের (Tragedy + Satyr-play) প্রধান চরিত্রগুলির চেয়ে হীন মর্যাদার একদল নারী বা পুরুষকে নৃত্যগীত-বাদক সম্প্রদায়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হত। সাধারণতঃ উঁচুমঞ্চে দাঁড়িয়ে নৃত্যগীতের সাহায্যে নাট্য অনুষ্ঠানকে গাম্ভীর্য ও বিরাটত্ব দেবার জন্যে এরা নিয়োজিত হ'ত। এ ছাড়া নাটকের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের পরিণতি (ভাগ্য) সম্পর্কে দর্শকদের আগ্রহ ও কৌতূহল জাগিয়ে তোলা ছিল এদের কাজ। এই সম্প্রদায় সাধারণত দলপ্রধানের নেতৃত্বে রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়াতো আর এদের সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত ও নাটকীয় সংলাপের মাঝে মাঝে অবস্থানুযায়ী সম্প্রদায়ের প্রধান পুরুষ কথা বলতো।

কাহিনী যুক্ত গানগুলি একযোগে সবাইকে গাইতে হত—ঘোরা বা আধ-ঘোরা অবস্থায় এবং নৃত্যভঙ্গীর সঙ্গে এর যোগ ছিল।

হাস্যরসাত্মক নাটকে এই সম্প্রদায় পাখি, মেঘ বা জীবজন্তুর প্রতীকে অধিকাংশ সময়েই উপস্থিত হয়েছে। প্রতীক্ অবস্থায় এই সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব হল এই যে এরা কোন শোকাত্মক ঘটনা, অনেকগুলি গান বা কথাব পর এগিয়ে এসে সমকালীন ঠাট্টা-রসিকতা এবং জনসাধারণ সম্পর্কে টিপ্পনী কাটতো।

এস্কিলাসের নাটকে এই সম্প্রদায় অনেক সময় নাটকীয় ঘটনায় অংশগ্রহণ করেছে। আবার সোফোক্লিসের নাটকে এরা যেমন চরিত্রগুলির কাজ ও তাদের নৈতিক ব্যাখ্যার দায়িত্ব নিয়েছে, তেমনি চরিত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ শক্তির পরিচয় বহন করছে। ইউরিপিডিস্ শুধুমাত্র গানের বৈচিত্র্য আনার জন্যে এদের ব্যবহার করেছেন এবং বলা যেতে পারে তাঁর পর এই সম্প্রদায়ের রূপ বিচ্ছিন্নভাবে এবং কখনো কখনো একেবারেই যোগসূত্রহীন অবস্থায় দেখা দিয়েছে।

যথাযথ অনুকরণের যুগছাড়া নৃত্য-গীত-বাদক দল প্রায়শই ব্যবহৃত হত এবং অত্যন্ত গীত-ধর্মী, প্রতীকী বা ধর্মীয় নাটকগুলিতে এদের ব্যবহাব দেখা গিয়েছে।

বাংলা নাটকে এই নৃত্য-গীত-বাদক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়নি। তবে পুরোনো যাত্রায় অত্যন্ত ক্ষীণ হলেও 'বিবেক' নামধাবী চরিত্রের সঙ্গে এর আংশিক মিল আছে।

অজিতকুমার চক্রবর্তীর মতে (কাব্যপরিক্রমা, পৃঃ ৪৮-৪৯), 'গ্রীক্ নাটকে কোরাসের যে কাজ ছিল, ঠাকুরদা ও তাঁহার দলের ঠিক সেই কাজ এ নাটকে ('রাজা') দেখিতে পাই। এ নাটকে লিরিক-অংশের সন্নিবেশ ঐখানে।

'গ্রীক্ কোরাসের আসল অর্থ ছিল নৃত্য কিংবা নৃত্যের রঙ্গমঞ্চ। গ্রীক্ দেবতাদের উৎসবে নৃত্য একটা বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান ছিল। এই নৃত্য হইতেই ক্রমে গ্রীক্ নাট্যের উৎপত্তি। গোড়ায় নৃত্যে কোনো কথা ছিল না, ক্রমে নাট্যের উৎপত্তি হইতে কোরাসের মুখে কথা জোগাইল। এই কোরাস গ্রীক্ নাট্যে একটা বিশেষ লিরিক-রস সঞ্চার করিয়াছিল।

'গ্রীক্ ড্রামা হইতে এই কোরাসের ভাব লইয়া যে রবীন্দ্রনাথ রাজা নাট্যে

ঠাকুরদার দলটিকে আনিয়াছেন তাহা বলি না। ইহা নাটকের একটি গভীরতর প্রয়োজন হইতে আসিয়াছে। গিল্‌বার্ট মারে গ্রীক্ কোরাসের যে প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন তাহাও এখানে কতকটা খাটে। তিনি বলিয়াছেন: 'It (chorus) will translate the particular act into something universal'. কোরাস একটি বিশিষ্ট ঘটনাকে বিশ্বব্যাপক করিয়া তাহার রূপ পরিবর্তিত করিয়া দেয়। কিন্তু তাহার চেয়ে বড়ো প্রয়োজন এই যে, সকল নাট্যদৃশ্যের পিছনে একটি অদৃশ্য সত্তার অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে —সে দ্রষ্টা, সে সাক্ষী। নাট্যের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া যে চরম পরিণাম বা climax তৈরি হইয়া উঠিতেছে, সে তাহার সবটাই যেন জানে। তাহার কাছে যেন রঙ্গমঞ্চের সকল দৃশ্য, সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ, নেপথ্য পর্যন্ত অনাবৃত। নাটকের সেই বিচিত্র রসকে সে আপনার অখণ্ড দৃষ্টির দ্বারা এক-রস করিয়া লয়। মধ্যে মধ্যে তাই এই কোরাস আসাতে সেই অখণ্ড রসটি, অখণ্ড সুরটি, সকল বিচিত্রতার ভিতরে ভিতরে জাগিতে থাকে বলিয়া নাটক জিনিসটা নাটক থাকিয়াও একটি লিরিকের সম্পূর্ণতা লাভ করে।' —মি. দা.

কাটাসট্রফি—দ্রঃ নাটকের গঠন (পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্র)।

ক্লাইম্যাক্স—দ্রঃ নাটকের গঠন (পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্র)।

ক্লাসিক নাটক—সাধারণভাবে গ্রীক নাটককে ক্লাসিক নাটক বলা হয়। য়োরোপে প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমান সাহিত্য ক্লাসিক নামে অভিহিত। রেনেসাঁস-পরবর্তী সাহিত্যের সঙ্গে পার্থক্যসূত্রেই এই অভিধার সার্থকতা। রোমান্টিক সাহিত্যান্দোলন নাটকের ক্ষেত্রে পূর্বতন রীতি-নীতির পরিবর্তন ঘটায় (দ্রঃ রোমান্টিক নাটক), ক্লাসিক নাটক ও রোমান্টিক নাটক ঐতিহাসিক কারণেই স্বতন্ত্র ভাব ও অবয়ব লাভ করেছে।

ক্লাসিক নাটক 'সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।' রোমান্টিক নাটকে পাই 'বহু শাখায়িত বৈচিত্র্যব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত।' ক্লাসিক নাটকের গঠন পারিপাট্য সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ; অবান্তর দৃশ্য ও এপিসোড নেই বললেই চলে, কাহিনী একমুখী, ঘটনার গতি দ্রুত, পট বা প্রেক্ষিত নিরলংকৃত। ক্লাসিক নাটকে কোরাসের ব্যবহার দ্বারা আবহাওয়া সৃষ্টি করা হোতো। কাল-ঐক্য, স্থান-ঐক্য, ঘটনা-ঐক্য রক্ষায় চেষ্টা প্রথম যুগের ক্লাসিক নাটকে না থাকলেও, অর্বাচীন যুগের ক্লাসিক নাটকে এবিষয়ে

বাধ্যবাধকতা লক্ষিত হয় (দ্রঃ ত্রয়ী ঐক্য)। আদিযুগে কোরাস স্থান-ঐক্য. রক্ষায় সাহায্য করতো, অর্বাচীন যুগে কোরাসের ব্যবহার যখন উঠে গেল, তখন স্থান-ঐক্যের জন্ম নাটককে কিছু কৃত্রিম কলাকৌশল গ্রহণ করতে হোলো।

ক্লাসিক নাটকে ঐতিহ্যের অনুসরণ করা হয়,—স্বকীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ সেখানে নেই। ব্যক্তিগত অনুভূতি বা আবেগের প্রকাশ নয়; সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টিই নাট্যকারের লক্ষ্য। কাহিনীকে সেইজন্ম বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে, বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে হবে, সত্য বলে প্রতিভাত হতে হবে। অর্বাচীন যুগের ক্লাসিক নাটক রচয়িতাদের কাছে, 'whether the characters and situations are authentic or fiction, the task is to create the belief that could have existed. In this way Racine maintains the essentially classical conception of the art, which requires that drama should be a play of feelings having a universal bearing.'—Eugéne Vinaver : Racine and Poetic Tragedy, 1962.

গ্রীক্ নাটকে যে সহজ সারল্য, স্বচ্ছন্দ প্রবাহ ও জীবনমুখিতা লক্ষ্য করি, অর্বাচীন ক্লাসিক নাটকে তার অভাব দেখা গেল। গ্রীক নাটকে জীবনের যে প্রত্যক্ষ প্রকাশ, নিষ্ঠুর সত্যের উপস্থিতি ও তীব্র সমস্যার রূপায়ণ ঘটেছিল, পরবর্তী নাটকে তা বর্ণনাত্মক, আদর্শবাদ প্রেরিত ও অনুকরণাত্মক হয়ে উঠলো। নাটকের প্রাণ রক্ষা করা অপেক্ষা নাটকের আইন রক্ষায় নাট্যকারেরা বেশী আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

আদি যুগের ক্লাসিক নাটক দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, একটি গ্রীক্ ও অন্যটি রোমান। গ্রীক্ নাট্যকারদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য-Æschylus, Sophocles, Euripides ও Aristophanes। রোমান নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—Seneca, Plantus ও Terence। রোমান নাট্যকারেরা দেশীয় রুচির অনুকূলে গ্রীক্ নাটকের রূপান্তর সাধনের চেষ্টা করেন,—এবং রোমান দর্শকসাধারণের স্থূলরুচি, রক্তপিপাসা, আকস্মিক ও চিত্তচমৎকারী দৃশ্যের প্রতি আকর্ষণ এবং বাগাড়ম্বর-প্রিয়তা রোমান নাটকের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। তবে গঠনের দিক দিয়ে গ্রীক্ নাটকই রোমান নাটকের আদর্শ ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে য়োরোপে গ্রীক্-রোমান সভ্যতার পুনর্জন্ম হয়; বিশেষ করে ইতালিতে রেনেসাঁসের পূর্ণপ্রকাশ লক্ষিত হয়। ক্লাসিক নাটক আবার পূর্ণ মর্যাদায় ফিরে এলো—কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ক্লাসিক নাটক আর রচিত হয়নি। অবশ্য হোরেসের সাহিত্যসম্বন্ধীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে ক্লাসিক নাটকের নির্দিষ্ট রূপ ও রীতি প্রচার লাভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতালি, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে ক্লাসিক নাটকই নাটকের একমাত্র আদর্শ হয়ে ওঠে। একেই অর্বাচীন ক্লাসিক নাটক বলেছি। Gryphins, Corneille, Dryden প্রভৃতি নাট্যকারেরা ক্লাসিক নাটক লিখলেন। অর্বাচীন কালে, ফরাসী নাট্যকার রাসিনকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্লাসিক নাটক রচয়িতা বলা যেতে পারে।

বাংলা নাটক ক্লাসিক নাটকেব আদর্শ গ্রহণ করেনি। সাধারণভাবে, শেকসপীঅ্রীয় অর্থাৎ রোমাণ্টিক নাটকই তার আদর্শ। তবে কোনো কোনো বাংলা নাটকে ক্লাসিক নাটকের সামান্য প্রভাব দেখা যায়। মধুসূদনের পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলিতে কখনো কখনো গ্রীক্ নাটকের ছায়াপাত হযেছে। রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটক গঠনের দিক দিয়ে ক্লাসিক নাটকের লক্ষণাক্রান্ত। —অ.বা.

ক্লোসেট ড্রামা—অভিনেয়তা নাটকের মুখ্য অঙ্গীকার, কারণ তা দৃশ্যকাব্য। তথাপিও, শ্রুতি-অধিগম্যতা বা নিতান্তই পাঠযোগ্যতার নিবিষ্টতায়-ও ঐ নাট্যরস, বসপিপাসুর চরিতার্থতা সাধনে সক্ষম। যদিও স্বীকার্য, উক্ত নাট্যাদর্শে বস্তুজীবন অপেক্ষা ভাব-জীবনের বিশ্লেষণ নয়, প্রতিফলনই সমধিক। অধিকন্তু, রঙ্গালয়ের সসীম পরিবেশ যা· কবি-প্রাণের বিপুল আত্মতন্ময়তার যোগ্য বাহক না হয়, তখনই নানাচারী ব্যক্তিত্বের আপাত বৈষম্যের দুরূহ সংগ্রাম প্রকাশের জন্যে নাট্যকাব পাঠ-অভিপ্রেত নাট্যরূপটিকে (Closet Drama) প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। সেই কারণেই দেখা দিয়েছে শেলীর 'প্রমিথিয়ুস আনবাউণ্ড'। বাংলায় রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' এবং 'নরকবাস' অনুরূপ নাট্যাঙ্গিকের সাক্ষ্য দেবে। ('ডাকঘর', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটক অভিনয় সাফল্যলাভ করলেও—পাঠযোগ্যতাই এর প্রধান সংবেদনশীলতা বলেই আমার ধারণা।) —স. দ.

ক্রাইসিস্—দ্রঃ নাটকের গঠন (পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্র)।

গর্ভসন্ধি—দ্রঃ নাটকের গঠন (সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র)।

গীতাভিনয়—দ্রঃ অপেরা ও যাত্রা।

গীতিনাট্য—দ্রঃ অপেরা।

চরিত নাটক—মহাপুরুষদের চরিত্র বর্ণনা করে নাটক লেখার রীতি এ দেশে বহুকাল থেকে চলে আসছে। চৈতন্যদেব থেকে আধুনিক কালের বহু ধর্মগুরুর জীবনেতিহাস অবলম্বনে নাটক লিখে যাত্রায় এবং রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু সেগুলি সাধাবণ মানুষের জীবন চরিত নয়। সাধারণ বলতে আমি এই কথা বলতে চাই যে, ধর্মসাধনার বাইরে থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এমন মানুষের নয। যোরোপে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও রাষ্ট্র নেতাদের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে কয়েকখানি নাটক অভিনীত হযেছে বলে জানা যায়। চলচ্চিত্রে আমরা এমিলি জোলার জীবনী চিত্রিত হতে দেখেছি। বাঙলাদেশে বনফুল সর্বপ্রথম চবিত নাটকের (Biographical Play) প্রবর্তন করেছেন। তাঁর 'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর' নাটক বসিকজনের তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হয়েছে। এই সকল নাটকেব উদ্দেশ্য মহাপুরুষদিগেব জীবনেব মহিমা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। বতমানে বনফুলের অনুকরণে অনেকেই চরিত নাটক লিখতে আবম্ভ করেছেন। তন্মধ্যে মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল' ও 'মহাবাজ নন্দকুমার' এবং নিতাই ভট্টাচাযের 'মধুসূদন' উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথেব জীবনেব কোন কোন অংশ নাটকাকারে গ্রথিত হয়ে অভিনীত হতে শোনা গেছে।

ভবিষ্যতে এরূপ নাটক আরও হয়তো অনেক লিখিত হবে এবং অভিনীত হবে। কিন্তু চরিত-নাটক লেখা খুবই শক্তি-সাপেক্ষ। একটি জীবনের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে জুড়ে প্রদর্শন করলেই তা নাটক হয়ে ওঠে না। সমাজের যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বিস্তৃত জীবনের কেবলমাত্র সংঘর্ষময় অংশটুকু বেছে নিয়ে নাটকে সাজাতে হয়। তাব মধ্যে অলীক কল্পনার স্থান নেই। জীবনকে যথাযথ রেখে প্রকাশভঙ্গি ও আকর্ষণী শক্তির দ্বারা জীবনের ক্রমপরিণতির রহস্য উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। মহান্ ব্যক্তি মাত্রেরই জীবনের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। সেই উদ্দেশ্যের সফলতায় কেউ ধর্মনেতা, কেউ রাষ্ট্রপতি, কেউবা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পর্যায় উন্নীত হন। নাট্যকারকে

সেই উদ্দেশ্যের নিবিড় অনুভূতিকে আবিষ্কার করে তাকেই জীবনের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে হয়। অথচ অনেকের এমন ধারণাও আছে যে, কোন জীবন-চরিতকে সহজ কথায় সংলাপময় আকারে রূপান্তরিত করতে পারলেই তা নাটক হয়ে ওঠে। এরূপভাবে রূপদান করে অনেক নাটক ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। সাধারণ নাটক রচনার যে নিয়ম-পদ্ধতিগুলি আছে, সেগুলি চরিত-নাটক সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। মনে রাখতে হবে—'ঘটনাব ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মুখ্য চরিত্র কখনও সরল রেখায় যায় না। জীবন একদিকে যাইতেছিল, এমন সময় ধাক্কা খাইয়া তাহার গতি অন্যদিকে ফিরিল, পুনরায় ধাক্কা খাইয়া আবাব অন্যদিকে অগ্রসর হইল হইল—নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে।** ফলতঃ সুখেব ও দুঃখেব বাধা ও শক্তি, চরিত্র ও বহির্ঘটনা' সংঘর্ষণে নাটকের জন্ম। যুদ্ধ চাই, তা সেই বাইরের ঘটনাবলীর সহিতই হোক কিংবা নিজের সঙ্গেই হউক। অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকে দেখানো হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।' (দ্বিজেন্দ্রলাল)

বাঙলায় যে কয়খানি চরিত-নাটক প্রচলিত আছে, তার মধ্যে সবগুলি সার্থক হয়ে উঠেনি। কোনখানি অভিনয়ের গুণে সুখ্যাতি অর্জন করেছে, কোনখানিতে নাট্যকারের কিছুটা কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। নাটক বচনার মূলসূত্রটি অবলম্বন করে বর্ণনীয় চরিত্রেব অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিকতা রক্ষা কবে চবিত নাটক লেখাব প্রয়োজন এখনো আছে।

—বি. রা.

ট্রাজিডি—নাটকের ষড়ঙ্গকে স্বীকাব করেই নাট্যসাহিত্যের বিশেষ শাখা ট্রাজিডি সম্ভাবিত, ভয় এবং শোচনাই তার বৈশেষিক লক্ষণ।

এই ভয় ও শোচনার উৎস অবশ্যই একটি সম্ভাবনাপূর্ণ চবিত্রের অবাঞ্ছিত বিনষ্টিতে, যাকে বলা হয়ে থাকে 'ট্রাজিক অপচয়'—তারই মধ্য দিয়ে। রাজপুরুষ থেকে সমতলভূমির মানুষ—ট্রাজিডির নায়কত্ব যে কেউই দাবী করতে পারেন, অবশ্যই তা শর্তসাপেক্ষ। একটি অসাধারণত্বের মর্যাদা তারা লাভ করবেন। আর ঠিক উক্ত শর্তেই রাজকুলতিলক এবং নিরীহ অধ্যাপক-

তুল্য মর্যাদার অধিকারী। এই অসাধারণ মহিমাই যখন সহস্র শিখায় বিদীর্ণ এবং বিকীর্ণ হয়, তখন আমরা বলি এখানেই Sublimation, এখানেই Grandeur ; চরিত্র এখানেই অত্যুন্নত, এখানেই দীপ্ত। তাদের প্রত্যাশার দারুণ দাহ-ই তাদের এই অসাধারণত্ব দান করে থাকে—এবং অকস্মাৎ ঐ সর্বগ্রাসী প্রত্যাশা পরিপূর্তির সঙ্গতিকে অস্বীকার করে বসে। চরিতার্থতার প্রান্তবিন্দুতে নিদারুণ পরিণাম অকরুণ হয়ে ওঠে। এখানেই আমাদের অবিশ্রান্ত প্রশ্ন, কেন এই শোচনীয় পরিণাম ? কবি কল্পনায় সেই পতন রন্ধ্রটিই আলোকিত হ'য়ে ওঠে এক চকিত মুহূর্তে। একেই বল্‌ব ট্রাজিক কাহিনীর উষসী গোধূলি। 'The spirit of inquiry meets the spirit of poetry and tragedy is born.'

সাহিত্যে আকস্মিকতার অনুপ্রবেশ অমার্জনীয় ছন্দঃপতন। অথচ, 'The spirit of enquiry', অনুক্ষণ অন্বেষা, পতনের সঙ্গত সূত্র দাবী করে। পতনরন্ধ্র যেখানে আয়ত্তাতীত, দুর্জ্ঞেয়, সেখানে সিদ্ধান্ত, নিয়তি অপ্রতিবোধ্য। আবার কখনও চরিত্রের মধ্যেই সে কণ্টকের নিভৃত-নিবাস। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই একটি অনভিনিবেশ কিম্বা বিচার-বিভ্রান্তি কিম্বা অজ্ঞতাজনিত অপরাধ—এই পতনের মুখ্য কারণ। 'দৈব' বা 'নিয়তির' পরিহাসে নায়ক অসহায় পরিণতিকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়—যেমন ইডিপাস, আর সজ্ঞান-অপরাধের প্রতিভূ ম্যাকবেথ—এখানে Character is destiny. বাংলা নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'কর্ণ' চরিত্রটি যেমন জন্মসূত্রেই বিড়ম্বিত, আর রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকে বিক্রম স্বাধিকার প্রমত্ততায় বিপর্যস্ত। নাট্যকার আনুপূর্বিক কাহিনীতে সুকৌশলে এই বীজ বপন করবেন—যা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব, কিন্তু গভীরতর বিচারে সুসমঞ্জস। এখানেই তার পর্যবেক্ষণ শক্তির অগ্নিপরীক্ষা। অবশ্য, কখনও কখনও নিতান্তই অকারণে পতন সম্ভব। যেখানে অজ্ঞতাজনিত ভ্রান্তি বা সজ্ঞানকৃত অপরাধ—কোন সূত্রটিই অপ্রযুক্ত। যেমন ধরা যাক ইউরিপিডিস্-এর 'ইফিজেনিয়া'। পিতা আগামেমনন, কন্যা ইফিজেনিয়া—কোনক্রমেই দায়ী ছিলেন না এই শোচনীয় পরিণতির জন্যে। অন্যক্ষেত্রে যে অজ্ঞতা, ভ্রান্তি, পাপ—যাকে পরিভাষায় বলা যেতে পারে Hamartia বা The tragic flaw—সম্পূর্ণতই সে সূত্রটি এক্ষেত্রে অপরিচিত, তথাপিও পরিণতি একান্তই নির্মম। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র কথাটিও

মুহূর্তে এই আলোকেই প্রতিফলিত হবে। ইউরিপিডিসের "ট্রোজান উইমেন" নাটকটিও এই Tragedy of Innocence-এর সাক্ষ্য।

'পাপ', 'অপরাধ' 'ভ্রান্তি' বা 'অজ্ঞতা' Tragic flaw হিসাবে যে কোন একটিই দেখা দিক না কেন, কোন ভারসাম্যস্থিত চরিত্রে তার অনুপ্রবেশ অসম্ভব; অন্তত, ট্রাজিডিব যথাযথ বিস্তারে এবং রসসঞ্চারে তা অপারঙ্গম। সুতরাং নায়ক চরিত্রের মৌল অস্তিত্বের মধ্যেই একটি সংঘর্ষের সূত্রপাত অনিবার্য। সে সংঘাত বহির্সংঘাতই হোক, অথবা অন্তর্সংঘাতের রূপই লাভ করুক। এমন কি, কখনও কখনও তা' প্রবৃত্তির সীমা ছাড়িয়ে দ্বৈত ভাবাদর্শের সংঘাতও হ'তে পারে। প্রকৃত পক্ষে সংঘর্ষের একটি ধারায় নায়ক চরিত্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল হবে, সমতীব্রতা সম্পন্ন বিপরীত ধারাটি তাকে বিচলিত করবে। এই অবিরাম সংঘাতই নাটকের Conflict. ক্রমবিকাশে সংঘাতজনিত চবম সঙ্কটের মুহূর্তে বিপর্যস্তচিত্ত নায়ক দ্বিধাবিনির্মুক্তিবাসনায় পরম প্রয়োজনীয় ভ্রান্তিকেই প্রশ্রয় দেবে। অতঃপর সেই নিশ্চিত, দুর্দম, ভয়ঙ্কব পবিণাম। অবশ্যই স্মবণীয়—শুদ্ধমাত্র ভয়ঙ্করের প্রতিষ্ঠাতেই নাটকের রসনিষ্পত্তি এবং নাট্যকারের সিদ্ধি সুদূর পবাহত। '.. for tragedy, as we have seen, must not only thrill with the sense of awe, but must also uplift with the sense of majesty'.

শুভ এবং অশুভে আকীর্ণ মানবচরিত্র কিন্তু প্রথমাবধিই পতনোন্মুখ নয়। স্বাভাবিকতার সীমা-সান্নিধ্যে সে তখনও সুশোভন। কিন্তু, একদিকে জঙ্গমতা, অপরদিকে বিপুল প্রত্যাশা—এই যুগল সম্মিলন যত দুর্বার, নায়ক ততই মৃত্তিকাস্পর্শ-পরিহারী। অমিত শক্তিতে, অপরিমিত আত্মবিশ্বাসে অবিচল আস্থা স্থাপন করে সে এখন মহানভ-অঙ্গনে একক সূর্যের মতই দেদীপ্যমান। কিন্তু যেহেতু স্বর্গচ্যুতি মানুষের জন্ম-অভিশাপ, সেই হেতুই অপার বিস্ময়ে লক্ষ্য করি স্বরাজ্যে স্বরাট এই স্পর্দ্ধিত চরিত্র কী শোচনীয় পতনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। প্রত্যাশা এবং পরিপূর্তির দুস্তর ব্যবধানে নায়ক আচম্বিতে লক্ষ্য করে সে নিঃসঙ্গ, একান্তভাবেই একক অতঃপর মৃত্যুই হোক অথবা দুর্ভর জীবন নির্বাহের দুঃসহ যন্ত্রণাই হোক—সমভাবেই তা' মর্মান্তিক। নাট্যকার নির্মম বিধাতার মতই এ পতন মুহূর্তটিকে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে সৃষ্টি

করেছেন। দীর্ঘদিনের অবিশ্বাস দিয়েই শেক্‌সপীঅর এমন অমূল্য মুহূর্তটির ভূমিকা প্রস্তুত করেছেন, অন্যথায় একটি বস্ত্রখণ্ডের পতনে এতবড় শূন্যতা অসম্ভব ছিল। সূচনা থেকে সঙ্কটসন্ধি পর্যন্ত নাট্যকারের দায়িত্ব অভ্রান্তভাবে এবং অবিচলিত সঙ্কেতে এই সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। যে মহিমায় দীপ্যমান চরিত্রাবলী দুর্জয় তার ভিত্তি আত্মবিশ্বাস। কিন্তু, প্রবৃত্তির তীব্রতায় মোহগ্রস্ত, অথবা ভাগ্যের পরিহাস বিড়ম্বিত, কিংবা নিয়তির দুর্জ্ঞেয় কার্য-কারণ সম্পর্কে ভ্রমাত্মক কর্মে লিপ্ত চরিত্রের সেই বিশ্বাসের মূলে এখন শত নাগিনীর ফণা বিস্তার। বিষজ্বালায় সে আসনের প্রত্যেকটি অণুতে যে নিশ্চিত মরণের সহস্র কল্লোল—নায়কের মৃত্যু তারই স্পর্শে। ম্যাক্‌বেথের মৃত্যুর জন্যে ম্যাক্‌ডাফের উপস্থিতি অধিক-যোজনা, বনস্পতিদের চলার মধ্যেই ম্যাকবেথের মৃত্যুর অলিখিত ইতিহাস। পর্যায়ক্রমে বিশ্বাসের গ্রন্থি শিথিল হয়। আর ভারসাম্য বিচলিত নৈরাশ্য-প্রপীড়িত নায়ক আর্ত-গম্ভীর যন্ত্রণায় মহতী বিনষ্টিকে মুখর করে—It's a tale told by an idiot·· সান্ত্বনাবাক্য এখানে সঙ্কুচিত, কারুণ্য অবগুণ্ঠিত, অনুকম্পা দ্বিধাগ্রস্ত—শুদ্ধমাত্র শোচনাই, মধ্যাহ্ন-দাহের ভাস্বরতায় জ্বালাময়ী।

উপরোক্ত গুণাবলী যে কাহিনীতে সংহতি এবং সঙ্গতি লাভ করে সমালোচকের কথায় তাই সিরিয়াস প্লট এবং ট্রাজিডির পক্ষে সঙ্গত কাহিনী। সমগ্র কাহিনী কোন প্রলোভনেই মর্যাদার অনুশাসনকে লঙ্ঘন করবে না। সূচনা, সঙ্কট, সমাপ্তি সম্যক্‌ভাবেই বিস্তৃত হবে। শৈথিল্যের দাক্ষিণ্যভারে রসাভাস সুনিশ্চিত, কৃত্রিম-কাঠিন্যে অতিরিক্ত সংহতিও রসহানির সহায়ক। যেমনটি হ'য়েছে 'মালিনী' নাটকে। ক্ষেমঙ্কর চরিত্রে ট্রাজিক নায়কের সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ঘট্‌লো না চরিত্রটির যোগ্য বিস্তৃতির অভাবে। কাহিনীর প্রত্যেক 'ক্রম'-ই সংশ্লিষ্ট হ'বে ঘটনা স্রোতের আবর্তে। সচেতন শিল্পী এদের সমন্বয়েই সম্ভব করবেন সেই বহুবিতর্কিত কাথারসিস্ ভাব-মোক্ষণের ফলে, আমরা পাঠকেরাও উত্তীর্ণ হব 'নন্দন'-এর আনন্দতীর্থে।

(ক) **গ্রীক্ ট্রাজিডি**—ট্রাজিডির রসনিষ্পত্তি নির্বিশেষ হ'লেও দেশকালের ধারায় তার স্বাতন্ত্র্য আছেই এবং নানা রূপান্তরের মধ্যে সেই 'বিশেষ'ও বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ। অনুরূপ সূত্রেই গ্রীক্ ট্রাজিডির উৎস এবং বৈশিষ্ট্যটুকু অনুধাবনযোগ্য।

সভ্যতার প্রথম প্রত্যুষেই গ্রীক্ ট্রাজিডির উদ্ভব। সমকালীন পার্থিব জীবনের বহুমুখী বিশৃঙ্খলায় মানসিক শক্তির বিপুল অপচয়ই যেন গ্রীক ট্রাজিডির ধ্রুবপদ। যদিও এ বিনষ্টি অকারণ এবং অনভিপ্রেত। অতঃপর অজ্ঞাত 'দৈব' বা দুর্জ্ঞেয় 'নিয়তি' ব্যতীত অন্যতব কোন সঙ্গত ব্যাখ্যাই সে ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। অনিবার্যভাবেই তাই এই নাটকাবলীতে ধর্মের স্থান প্রশস্ত হ'য়ে পড়েছে। মনে হয়, যেন Practical Religion বা আচরণমূলক ধর্মবোধ গ্রীক্ ট্রাজিডির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। 'Tragedy first arose in association with some religious rite, performed at the grave of a dead hero or the alter of a living god—a rite which acknowledged the influence of the unseen upon the seen, never at anytime lost sight of by the Greeks,..' আগামেমননের দুর্দৈবে ইফিজিনিয়াকে বলিদানের ঘটনাটি দৈবানুশাসনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যেরই ফল স্বরূপ। যে কোন মূল্যে দেবতার তুষ্টিবিধানই যেন এর এক এবং অদ্বিতীয় লক্ষ্য। গ্রীক্ নাটকে তাই ট্রাজিক পতন-সূত্রটি অন্ধনিয়তি বা সক্রিয় দৈব বাহিত।

ঠিক আলোচ্য কারণেই এ নাটকের সংঘর্ষ বা Conflict-কে আমরা প্রধানতঃ বহির্সংঘাত বল্‌তে বাধ্য। যদিও মিডিয়া নাটকে জ্যাসনের তপ্ত কামনাই ভয়াবহ পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছে। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে—মূলতঃ বহির্ঘটনা সংঘাতের ফলে সামগ্রিক বিচারে এদের অন্তর্বেদনা স্ফুরণের অবকাশ সঙ্কুচিত।

উদ্ভবের এই কারণকে সামাজিক বা দার্শনিক যেমনই বলি না কেন গঠনের দিক থেকে আরিস্টটলের আলোচনাই আমাদের আশ্রয়। বহির্লক্ষণের যোগ্য বিশ্লেষণ তিনিই প্রথম করেছিলেন। তাঁর মতে :—কাহিনীর মধ্যে একটি আদর্শ সত্য থাকবে, কারণ 'Poetry is more philosophical (i.e. more universal)।' ত্রয়ী ঐক্য সে কাহিনী হবে দৃঢ়-সংবদ্ধ এবং Surprise বা বিস্ময়ের মধ্য দিয়েই হবে রহস্যোদ্ঘাটন আর সেই সূত্রেই নির্ণীত হবে মহতী বিনষ্টি। যে চরিত্রকে অবলম্বন করে এ কাহিনী গড়ে উঠবে সে চরিত্রটি হবে মর্যাদাসম্পন্ন রাজপুরুষ এবং 'a rather goodman coming to a bad end।' অন্যান্য গুণের মধ্যে চরিত্রটি হ'বে 'True to life' বা

বা জীবনের প্রতি অনুগত, 'True to human nature' মানবিক গুণসম্পন্ন, 'Consistent' দৃঢ়চরিত্র। এরকম চরিত্রের পতনেই উৎসারিত হবে শোচনা এবং সম্ভব হবে ভাব-মোক্ষণ বা কাথারসিস্ যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আনন্দে। অবশ্যই একথা আরিস্টটল বলেছেন শ্রেষ্ঠ নাটকাবলীকে সামনে রেখেই। তিনি দেখেছিলেন গ্রীক্ নাটকে কোরাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও দ্বিতীয় চরিত্রের অবতারণা ঘটিয়ে ইস্কাইলাস কোরাসের অংশ সংক্ষিপ্ত করেছেন—সংলাপ হ'য়েছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সোফোক্লেস উপস্থিত করেছেন তৃতীয় চরিত্র এবং দৃশ্যপটের ব্যবহারও তিনি করেছেন।

আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি—যেমনই হোক্ না কেন, মূলতঃ নায়ক চরিত্রে প্রত্যাশা এবং পরিপূর্তির (প্রাপ্তির) দুস্তর ব্যবধানই এই শূন্যতার সৃষ্টি করে। ইডিপাস, মিডিয়া,—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এটি অভ্রান্ত সত্য। ক্ষেমঙ্করের শূন্যতাও ঐ একই প্রত্যাশা ভঙ্গের কারণে। আসলে দৈবে যার সূচনা—ক্রমবিকাশে মানবই তার অবলম্বন।

(খ) **ট্রাজিডি প্রসঙ্গে হেগেল-এর ভাষ্য**—ট্রাজিডি প্রসঙ্গে আরিস্টটলের **কাথারসিস্** বা ভাব-মোক্ষণের সিদ্ধান্তটি সবচাইতে বিতর্কিত। ট্রাজিডি চিত্ত-নন্দন করে নিঃসন্দেহে; কিন্তু. বেদনার কুক্ষিকায় আনন্দের সম্ভাবনার সঙ্গতি কোথায়? আরিস্টটলের সিদ্ধান্ত—ঐ ভাব মোক্ষণই চিত্ত-রঞ্জিনী। তথাপি, সমগ্র সিদ্ধান্তটিই অ-লৌকিক রসবাদের বিশ্বস্ত সহচর। অনুসন্ধিৎসার প্রাবল্যে নানা সমালোচক নানা দিক্‌দর্শী। Emile Faguet-এর Malevolence theory (জিঘাংসাবাদ) থেকে রবীন্দ্রনাথের আত্মোপলব্ধি তত্ত্বের আয়ত পরিসরে আরিস্টটল কোথাও সমর্থিত, কোথাও বা সমালোচিত। যদিও সম্যক্ ভাষ্যের অবকাশ সাম্প্রতিক কালেও বর্তমান।

সেদিক থেকে প্রশংসনীয় স্বাতন্ত্র্য এবং যুক্তিগ্রাহ্য ভাষ্যের অধিকারী দার্শনিক হেগেল। যদিও নন্দন-তাত্ত্বিকেরা দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলতে পারেন—তথাপি হেগেলের সিদ্ধান্তটি অনুধাবনযোগ্য।

ট্রাজিডিতে অবিরাম সংঘর্ষের সূত্র শুভ এবং অশুভের মরণ-আলিঙ্গনের মধ্যেই—এ বিশ্বাস সহৃদয় হৃদয়ে নিরঙ্কুশ। আর, সেই বিশ্বাসের মূলেই হেগেলের স্বাতন্ত্র্যের প্রচণ্ড অভিঘাত। লৌকিক ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন এই স্বতন্ত্রচারীর ব্যাখ্যায় ঐকান্তিকভাবেই অবান্তর। কারণ, তাঁর দৃষ্টিতে,

মানবের রূপসজ্জা যেমনই হোক না কেন, স্বরূপত তার স্বাতন্ত্র্য বিশ্ববিধানের সঙ্গেই অবিনাবদ্ধ। 'The man who guides himself and his will in accordance with the Universal is the freeman, and thus represents the universal will and not his own particular morality.' —Philosophy of Religion : vol. II

অতঃপর কোন একক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন একেবারেই গৌণ—মুখ্যত, মানব চরিত্রে যে দ্বন্দ্বের প্রতিভাস, সে দ্বন্দ্ব পূর্ণ স্বরূপের দু'টি খণ্ডরূপের পারস্পরিক সংঘাত। সম্পূর্ণতার বিকল্পবিহীন, প্রতিকল্পাতীত। কিন্তু, যেহেতু, পার্থিব রূপমাত্রেই প্রাতিভাসিক, সেই হেতুই সম্পূর্ণের স্বরূপ প্রতিবিম্বন তার সামর্থ্যাতীত। এই জন্য হেগেলের সিদ্ধান্ত—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হ'ল 'Imperfect mirror' এবং সত্যস্বরূপ খণ্ডের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত ও ঐ 'Imperfect mirror'এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত বলেই 'in this our world the absolute right may become two wrongs.' সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, হেগেলের সূত্রানুযায়ী এই সংঘর্ষ হবে 'conflict between Ethical substance'—কারণ, সংঘর্ষের আশ্রয় যে চরিত্র, সে মুহূর্তেই 'identifies himself wholly with the power that moves him.' চরিত্রের এই দ্বন্দ্ব 'ethical substance' বা নৈতিক সত্তার মধ্যে (কারণ মানব মাত্রেই 'universal will' এর প্রতিনিধি) একথা স্বীকার করে নিলে, ট্রাজিডির দ্বন্দ্ব শুভ এবং অশুভের মধ্যে,—নাট্যরসিকদের এ সিদ্ধান্ত পরিহার্য হ'য়ে পড়ে। কারণ, নৈতিক সত্তা কোনক্রমেই অশুভের প্রতীক নয়। সুতরাং ট্রাজিডির দ্বন্দ্ব শুভ এবং শুভেরই দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্ব মর্যাদার সঙ্গে কর্তব্যের, স্নেহের সঙ্গে ন্যায়বোধের, আনুগত্যের সঙ্গে দেশপ্রেমের অথবা অন্য যে কোন রূপেই হোক না কেন। মর্যাদা, কর্তব্য, স্নেহ-প্রেম, ন্যায়বোধ এবং আনুগত্য—এদের প্রত্যেকটিই সেই 'spiritual principle,' এবং 'Each demands obedience, deserves obedience, is justifiable, yet when espoused by the individuals, who identify themselves each with one, in defiance of other rights, other goods, the peace of Olympus is disturbed ; we have division among the spiritual powers. And this is tragedy.'

হেগেলের বিশ্লেষণ অনুসারে রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকটিকে বিচার করা যাক। ক্ষেমঙ্কর এবং সুপ্রিয়ের দ্বিমুখী বিশ্বাসের পূর্ণসত্য দ্বিধাগ্রস্ত। এবং যেহেতু দাবী উভয়তঃই সর্বগ্রাসী অতঃপর একটির অবলুপ্তি ব্যতীত সমাধান সুদূরপরাহত। এই অবলুপ্তির অর্থ অস্বীকৃতি (Denial) নয়, সাঙ্গীকরণ (Reconciliation)। আর এই চরম এবং পরম-এর অঙ্গীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্ত পরিণতি। অনুরূপ বিশ্লেষণ 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকাব্য প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। ধৃতরাষ্ট্রের ধর্ম অন্ধপুত্রস্নেহ, দুর্যোধনের প্রত্যাশিত শর্ত-নিরপেক্ষ রাজধর্ম, আর গান্ধারীর মধ্যে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সংশ্লেষণ। কখনও Destruction এর মধ্য দিয়েও অনুরূপ সাঙ্গীকরণ সম্ভব—যেমনটি ঘটেছে "তপতী" নাটকের উপসংহৃতিতে। যদিও, 'রাজা ও রাণী'তে বিক্রমের শুভ বুদ্ধির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে Reconciliation সম্ভব হ'য়েছে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে—দ্বন্দ্ব যদি শুভ এবং শুভের মধ্যেই, তবে ক্ষেমঙ্কর, দুর্য্যোধন, বিক্রম চরিত্র কোন শুভ-ইঙ্গিত বাহী? বিশেষতঃ তিনটি চরিত্রই ত' রবীন্দ্রজীবনাদর্শের পরিপন্থী। প্রাণহীন শাস্ত্রাচার, ক্ষমাহীন রাজধর্ম এবং শুচিতাহীন প্রেমকে ত' রবীন্দ্রনাথ ধিক্কারই দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত—'Hegel is not discussing at all what we should generally call the moral quality of the acts and persons concerned, or, in the ordinary sense, what it was their duty to do. And, in the second place, when he speaks of 'equally justified' powers what he means, and, indeed, sometimes says, is that these powers are in themselves equally justified.' আর ঠিক সেই কারণেই ক্ষেমঙ্কর চরিত্রের সঙ্গে রঘুপতি চরিত্রের মেরু-ব্যবধান। রঘুপতি শাস্ত্রাচারের নিষ্ঠাহীন কলঙ্কিত রূপ—ক্ষেমঙ্করের আচার-নিষ্ঠার অবিচলতার কাছে পাণ্ডুর, ম্লান, বিমর্ষ।

অখণ্ড স্বরূপের এই ভগ্নাংশের বিপর্যয়ই আমাদের শোচনার গোমুখী, আর সংশ্লেষণের তৃপ্ত সমারোহ-ই আনন্দের অবিরল ধারা।

কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায় শুভ এবং শুভের দ্বন্দ্ব যদি শুভান্তই হয় তবে আদৌ ট্রাজিডির রস-সঞ্চার সম্ভব কিনা? কারণ, মধ্যবর্তী ঘটনা-বৈপরীত্যের সংঘাত ত' 'কমেডি'তেও ঘটতে পারে! তা' হ'লে!! —স. দ.

ডিউস এক্স মেকিনে—(Deus Ex Machina) প্রাচীন গ্রীক্ নাটকে নাট্যবস্তুর বা কাহিনীর গ্রন্থি মোচনার্থে যান্ত্রিক কৌশলে নাটকে দৈবী আবিভাব বা অন্য কোন পাত্র-পাত্রীর অবির্ভাব ঘটানো হোতো। এরই নাম ডিউস এক্স মেকিনে (God from the machine)। এস্‌কিলাস ও সফোক্লিস অত্যাশ্চার্য শিল্পচাতুর্যে নাটকে এর প্রয়োগ করেছেন, যদিও ইউরিপিদিসই একমাত্র নাট্যকার যাঁর হাতে আলোচ্য নাট্য-কৌশলটি নাটকে একটি সাধারণ রীতি হিসেবে প্রচলিত হয়।

সমালোচকেবা কিন্তু প্রথমাবধিই এই 'ডিউস এক্স মেকিনে'কে একটি অবাস্তব মঞ্চ কৌশল হিসেবে তীব্র সমালোচনা করেন। আরিস্টটল তাঁর ক্ষুরধার সমালোচনায় মন্তব্য কবেন যে, নাটকে দ্বন্দ্ববস্তুর বা কাহিনীর গ্রন্থি মোচনের সম্ভাব্য হেতু নাট্যবস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকা উচিত। বিয়োগান্ত নাটকের অন্তঃসীমাব মধ্যে কোন যুক্তিহীন কৌশল-চতুরতা অবাঞ্ছিত। সেদিক থেকে 'ডিউস এক্স মেকিনে' বলতে আজকাল বোঝায় এমন যে কোন অবাস্তব বা কৃত্রিম কৌশল ও ঘটনাবিন্যাস যা নাটকের গতিকে সংহত করতে সাহায্য কবে। মধ্যযুগেব '**মিস্ট্রি**' নাটকে এইভাবেই ভার্জিন মেবীব অংশ গ্রহণ দেখানো হোতো। বাংলা পৌরাণিক নাটকে একদা এইভাবে দেবতা, দেবদূত বা অপ্সরাদের মর্ত্যে আনয়ণ করা হোতো। একদিকে বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি, অন্যদিকে অলৌকিক ঘটনার দ্বারা ধর্মীয় আবহাওয়াব সৃষ্টি, —এই উভয় প্রয়োজনেই পৌবাণিক নাটকে ডিউস এক্স মেকিনেব ব্যবহার ছিল। —অ. ভ.

ডিক্‌সন (ভণিতি)—দ্রঃ নাটকেব ষডঙ্গ।

ড্রামাটিক আয়রনি (নাট্য-শ্লেষ)—নাট্য-শ্লেষ (Dramatic Irony) নাটকীয় ক্রিয়া (action) সৃষ্টির অন্যতম উপায়। কোন নাটকীয় ঘটনা সম্বন্ধে নাটকীয় চরিত্র ও দর্শকের জ্ঞানের মধ্যে যখন পার্থক্য ঘটে, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা তথ্য না জানাব ফলে সুকৌশলে প্রযুক্ত একই নাটকীয় সংলাপ যখন নাটকীয় চরিত্রের কাছে শুধু বাইরের অর্থই বহন করে অথচ সেই একই বিষয় বা তথ্য জানার ফলে যখন দর্শক সেই সংলাপের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন তখনই নাট্য-শ্লেষের উৎপত্তি হয়। নাট্য-শ্লেষ দর্শকের মনে কৌতুক ও বেদনা উভয় প্রকার অনুভূতিই উদ্রিক্ত করতে

পারে। সেজন্য কমেডি ও ট্রাজিডি উভয় প্রকার নাটকের মধ্যেই এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। নাটকীয় চরিত্র জানে না অথচ আমি জানি, এই গৌরববোধ থেকেই দর্শকচিত্তে এই হাসির প্রেরণা আসে। নাট্য-শ্লেষ বা ড্রামাটিক আয়রনি যখন ট্রাজিডিতে ব্যবহৃত হয় তখন এই শ্লেষ একটি বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ট্রাজিডির বেদনাকে তীব্র, গভীর ও চিরন্তন করে তোলে। 'ওথেলো' নাটকে ওথেলো যখন ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যা করতে এসেছে তখন সরলা, অপাপবিদ্ধা ডেস্‌ডিমোনা স্বামীকে সম্বোধন করে বলছে 'Will you come to bed my lord ?'—এই কথার মধ্যে মর্মস্পর্শী আয়রনি রয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' নাটকে পদ্মাবতী নিজের মনে রাধার অপূর্ব মাতৃস্নেহের আলোচনা করতে গিয়ে যখন বলেন—'ওই যে অপূব স্নেহ বাৎসল্য অপূর্ব, তুল্য যার কেবল—কেবল যশোদার'—পরে নিজের মনেই প্রশ্ন করেন 'যশোদার ?'—তখন তাঁর অজ্ঞাতেই কর্ণের প্রকৃত জন্ম-পরিচয়ের আভাসে নাট্য-শ্লেষের সৃষ্টি হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নুরজাহান' নাটকের প্রথম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে শের খাঁর প্রতি নুরজাহানের উক্তি—'এবার যদি যাও, নিশ্চয় জেনো আর ফির্ত্তে হবে না'—ভাবী ঘটনার বিষাদ-করুণ আভাস বহন করে মর্মন্তুদ নাট্য-শ্লেষ হয়ে উঠেছে। —অ. ঘো.

ড্রামাটিক মোনোলোগ—দ্রঃ কবিতা ও নাটক, এবং মোনোলোগ।

ড্রামাটিক সাস্‌পেন্স (নাটকীয় অনিশ্চয় উৎকণ্ঠা)—অনিশ্চয় উৎকণ্ঠা নাটকের প্রাণবস্তুস্বরূপ। এই আঙ্গিকের কৌশল একদিকে যেমন নাটকেব কাহিনীতে গতিবেগ সঞ্চারিত করে, অপরদিকে তেমনই নাটকীয় চরিত্রেব দ্বন্দ্বকে গভীরতর করে তোলে। নাটকের পাঠক এবং নাটকের অভিনয় দর্শকের চিত্তে একটি অনিশ্চিত পরিণাম-উৎকণ্ঠার সৃষ্টিও এর লক্ষ্য। এ দিযে নাটকের কাহিনীর মধ্যে এমন একটি ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনার সৃষ্টি করা হয়, যাতে —অতঃপর কি হবে, এই চিন্তায়, এই ব্যাকুলতায়—রসগ্রহণোন্মুখ মন অধীর আগ্রহে সন্দেহদোলায় দুলতে থাকে। প্রত্যেক বড নাট্যকারের নাটকেই এইরূপ অনিশ্চয় উৎকণ্ঠা বা Dramatic Suspense-এর সাক্ষাৎ মেলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইব্‌সেনের 'The Doll's House'-এর সেই চিঠির বাক্সের চিঠির দৃশ্যটির উল্লেখ করা চলে। নোরা যে লোকটিকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করতেন, ভাগ্যের পরিহাসে সে-ই যখন, নোরার সই জাল করে হ্যাণ্ডনোটে টাকা নেবার

ঘটনাটি নোরার স্বামীকে জানাবার জন্য একটি চিঠি লেখে এবং তা যথারীতি নোরাদের ঘরের চিঠির বাক্সে এসে পৌঁছায়, তখন নোরার সে কী আশঙ্কা-ব্যাকুলতা! চিঠিটি যাতে স্বামী না দেখতে পান, সেজন্য তাঁর কী প্রাণপণ প্রয়াস! ছন্দহীন উদ্দাম নৃত্যের ভিতর দিয়ে স্বামীর দৃষ্টিকে যখন তিনি কেবলই চিঠির বাক্সের দিক থেকে ফেরাবার চেষ্টা করতে থাকেন, তখন সেই নাটকের দর্শকের চিত্তও অনিশ্চয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ভাবতে থাকে,—'তাই তো, নোরার প্রয়াস কি শেষ পর্যন্ত সফল হবে? তাঁর স্বামী কি চিঠিব কথা জানতে পারবেন না? যদি পারেন, তবে তার ফল কী দাঁড়াবে? নোরার অবস্থা তখন কী হবে?' একেই Dramatic Suspense বা নাটকীয় অনিশ্চয় উৎকণ্ঠা বলি। এই উৎকণ্ঠা একদিকে যেমন নাটকীয় চরিত্রের, অপরদিকে তেমনই অভিনয়-দর্শকের। বাংলা নাটকে অনিশ্চয়-উৎকণ্ঠার উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রবোধ মজুমদারের 'শুভযাত্রা' নাটকের সেই স্থানটি যেখানে বিকৃত মস্তিষ্কা মৃণালিনী সাময়িকভাবে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ হয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহোদ্যোগী তাঁর স্বামীর ঠিক 'শুভযাত্রা'র পূর্বক্ষণটিতেই স্বামীব কাছে উপস্থিত হন। নাট্যকারের অশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি নাটকেব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই উৎকণ্ঠা জাগ্রত রাখতে পেরেছেন। শেক্‌স্‌পীঅরের 'Hamlet'-এব ৩য় অঙ্কের ২য় দৃশ্যটি (পিতার প্রেতাত্মার কথার সত্যতা যাচাই করাব জন্য হ্যামলেট কর্তৃক নাটকাভিনয়ের আয়োজনের দৃশ্য), 'Romeo and Juliet'-এব একেবারে শেষ দৃশ্যটি, 'Othello'-র ৩য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্য (যেখানে ডেস্‌ডিমোনা তাঁর রুমাল ফেলে যান এবং ইয়াগো ওথেলোর মনকে বিযাক্ত করবাব জন্য সেই রুমালের কাহিনীটিকেই বিকৃত করে পরিবেষণ করেন) Dramatic Suspense-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নাটকীয় অনিশ্চয়-উৎকণ্ঠা সৃষ্টির ব্যাপারে অস্কার ওয়াইল্ড ছিলেন নিপুণতম শিল্পী। তাঁর 'Lady Windermere's Fan', 'Importance of Being Earnest' প্রভৃতি নাটকের ভিত্তিই হচ্ছে অনিশ্চয়-উৎকণ্ঠা। মোট কথা, অনিশ্চয়-উৎকণ্ঠা রচনায় যিনি যত বেশী নিপুণ, তাঁর নাট্যকৃতিও তত বেশী সফল। -ক. ব.

নাটকের ঘটনাপ্রবাহ সরল ও সমতল হয়ে চলে না,—শ্লেষ (Irony), প্রচ্ছন্নতা (Concealment) ও সংকট (Crisis) রচনার কৌশল ব্যবহার করে পরিস্থিতির অভাবিত পরিবর্তন দ্বারা বিস্ময় বা চমক (Surprise) সৃষ্টি করতে

হয়। এই সব প্রক্রিয়ার দরুণই নাটকটি কমেডি বা ট্রাজিডির পরিণামের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। এবং শ্লেষ, প্রচ্ছন্নতা ও সংকট সৃষ্টি করে নাটকের মধ্যে দর্শকচিত্তে উদ্বেগ, উত্তেজনা ও উদ্বেল মুহূর্ত উদ্ভাবনার কৌশলকে নাট্যোৎকণ্ঠা বলা হয়।

নাট্যোৎকণ্ঠা নাটকে বেগ ও গতি অনুক্ষণ অব্যাহত রাখার অন্যতম প্রকৃষ্ট কৌশল।

বাংলা নাটক থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক: রবীন্দ্রনাথেব 'বিসর্জন' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য, রঘুপতি জয়সিংহকে রাজরক্ত আনতে পাঠিয়ে মন্দিরের মধ্যে অত্যন্ত অস্থির উদ্বিগ্নতায় তার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করছে; বাইরে দারুণ দুর্যোগ; প্রবল ঝড় বইছে, ঝড় বইছে রঘুপতির বুকে; কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঝড় উঠেছে দর্শকদেব মনে, তারাও জয়সিংহের জন্য উন্মুখ ও উৎকন্ঠিত। তাদের প্রতীক্ষা যখন উদ্বেল হয়ে উঠল, তখনই জয়সিংহের প্রবেশ আর রঘুপতিব প্রায় আর্ত-জিজ্ঞাসা: 'জয়সিংহ রাজরক্ত কই।' জয়সিংহ: 'আছে, আছে, ছাড়ো মোরে নিজে আমি করি নিবেদন।' এখানে নাট্যোৎকণ্ঠা চরম হযে উঠেছে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে ক্ষেত্রমণির উপব রোগ সাহেবেব বলাৎকারের দৃশ্যটি নাট্যোৎকণ্ঠার একটি সার্থক দৃষ্টান্ত। উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' নাটকে খনিগহ্বরে চাপাপড়া শ্রমিকদের জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম দৃশ্যটি নাট্যোৎকণ্ঠায় সার্থক। শেষ মুহূর্তেও এই হতভাগ্য শ্রমিকরা উদ্ধাব পাবে, দর্শকদের এই মানসিক আকাঙ্খাকে নিহত করে খনিগহ্বর নদীর জলে প্লাবিত এবং অতগুলি অসহায় মানুষের হত্যা সংঘটিত হওয়ার মধ্যে এই নাট্যোৎকণ্ঠার অবসান হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পৌরাণিক নাটকে প্রকৃত নাট্যোৎকণ্ঠা থাকে না, কারণ পুরাণের সিদ্ধচরিত্র ও চিত্র দর্শকদের এতই পূর্ব-জ্ঞাত যে ওর মধ্যে তাদের উদ্বেগ, উত্তেজনা ও বিস্ময়ের অবকাশ নাস্তিগভ। —হ মু.

ত্রয়ী ঐক্য—নাটকের ত্রয়ী ঐক্য—যথা ঘটনা-ঐক্য, স্থান-ঐক্য এবং কাল-ঐক্য প্রসঙ্গটির সূত্রপাত আরিষ্টটলের পোয়েটিক্স গ্রন্থে। (১) ঘটনা ঐক্যের কথা আরিষ্টটল নাটকের একটি অন্যতম মূলসূত্র হিসাবে আলোচনা

করেছেন। তিনি নাটকে একক ঘটনাকে উপস্থাপ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ কবার নির্দেশ দিয়েছেন—'So the plot being an imitation of action, must imitate one action and that a whole.' একক ঘটনা বলতে আরিষ্টটল একটি মাত্র ঘটনাব কথা বলেননি—একক ঘটনা একাধিক ঘটনা নিয়েও সম্ভব—যদি সেই ঘটনার মধ্যে সম্ভাব্য বা অনিবার্য সম্পর্ক স্থাপন কবা যায়। সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্যই নাটকের মূল বিষয় ও সুরের পরিপোষকরূপে প্রদর্শিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং নাটকটি যেন আদি, মধ্য ও অন্ত্য-সম্বলিত একটি একটি অখণ্ড সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়। একই সঙ্গে ঘটনার ঐক্যবদ্ধ রূপ, তার সঙ্গে বৈচিত্র্য ও জটিলতা—এই দুটি আপাতবিরোধী গুণেব মধ্যে সুমিত সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী আরিষ্টটল। ঘটনা-ঐক্যেব কথা পোয়েটিক্স গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হলেও, নাটকের অন্যতম মূলসূত্র হিসাবে স্থান-ঐক্য ও কাল-ঐক্যেব কথা আরিষ্টটল আলোচনা করেন নি। এই শেষের দুটি ঐক্য সম্পর্কে তিনি মহাকাব্য ও ট্রাজিডির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে প্রসঙ্গত কিছু সাধাবণ মন্তব্য কবেছেন মাত্র। (২) তাঁব মতে মহাকাব্যের কালব্যাপ্তি সীমাহীন, কিন্তু ট্রাজিডি যেহেতু দৃশ্যকাব্য তাই তাব কালসীমা যতদূব সম্ভব সূর্যেব একটিমাত্র আবতন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টাব মধ্যে (কারও কারও মতে ১২ ঘণ্টা) সীমায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয। (৩) স্থান-ঐক্যেব কথা আবিষ্টটল স্পষ্ট কবে কোথাও বলেননি, মাত্র এক জায়গায় মহাকাব্যের স্থানগত ব্যাপ্তিব আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ট্রাজিডি সম্পর্কে বলেছেন– 'In a play, one can not represent an action with a number of parts going on simultaneously , one is limited to the part on the stage and connected with the actors.'—Trans. by Bywater. p.p 82।

নাটকের অবশ্যপালনীয সূত্র হিসাবে আরিষ্টটল এই তিনটি ঐক্যের, বিশেষ করে স্থান-ঐক্য এবং কাল-ঐক্যের বিধান দেননি। তিনি এগুলির সম্ভাব্যতা নিয়েই আলোচনা করেছেন। এমনকি আরিষ্টটল ঐক্য সম্পর্কে যা বলতে চেয়েছিলেন—গ্রীক্ নাটকে অনেক সময়ই তা লক্ষ্য করা যায় না। ঘটনা-ঐক্য গ্রীক্‌নাটকে কিছুটা মানা হলেও, স্থান-ঐক্য বা কাল-ঐক্য বহুক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়েছে। আরিষ্টটল নিজেও তা চাননি। কাল-ঐক্য প্রসঙ্গে আরিষ্টটলের কথায়, 'endeavours to keep,' 'as far as possible',

'something near that'-এর শিথিল রূপটি ধরা পড়ে। স্থান-ঐক্য সম্পর্কে কোলরিজ মন্তব্য করেছেন যে, এটি গ্রীক্ নাটকের একটি অপরিহার্য সূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত না। গ্রীক্ থিয়েটারে কোন পর্দা ব্যবহৃত হত না, কোরাস-ই বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা করত। সেজন্য ঘটনা সাধারণত একই স্থানে না ঘটে পারত না। এবং যেহেতু স্থান-ঐক্য গ্রীক্ নাটকের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল না, সেই জন্য বহু নাটকে এর শিথিল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। Eumenides নাটকের একটি দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চ থেকে কোরাসের বিদায়ের পরবর্তী দৃশ্যটি স্থানান্তরিত হয়েছে এথেন্সে এবং সেখানে ওরেষ্টাসের প্রথম আবিভাব ঘটে মিনার্ভাব মন্দিরে। এইখানে ওরেষ্টাসের অনুসরণে আবার আমরা কোরাসের পুনরাবিভাব দেখি। কোরাসের এই দুটি আবিভাবের মধ্যে স্থান গত দূরত্ব কম নয়।

প্রাচীন গ্রীক্ নাটকের প্রসঙ্গে এই ত্রয়ী-ঐক্য বিধি আক্ষরিকভাবে সর্বত্র প্রযোজ্য না হলেও—এই তিনটি ঐক্যের অবতারণার সার্থকতা নিহিত রয়েছে গ্রীক্ নাটকের উদ্ভব কালীন বিশিষ্ট যুগ মানসের উপব। ডায়োনিসাস্ মন্দিরের বেদীতে গ্রামের ভক্ত পূজাবীরা যে কোরাস সংগীত গাইত তাই থেকে ট্রাজিডির জন্ম। দেবতার কহিনী ও ধর্মীয় আবেগ ছিল নাটকের প্রথম বিষয় বস্তু—এই ধর্মীয় আবেগকে প্রথম পযায়েব গ্রীক্ নাটকে প্রকাশ করা হত সরল ও সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মাধ্যমে—যাব কালব্যাপ্তি ছিল খুবই অল্প। দ্বিতীয়তঃ নাটকের কাহিনী সূত্রপাত থেকে পরিণতি পর্যন্ত কোরাসের মাধ্যমে উপনীত হত। কোরাস ছিল গ্রীক্ নাটকেব ঐক্য বিধায়ক মূল শক্তি—একাধারে সূত্রধার, বিভিন্ন পর্বের মধ্যে সংযোগ-বিধায়ক ভাষ্যকাব এবং অন্যতম চবিত্র। এ ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে নির্দিষ্ট একদল লোক নিদিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকত। ফলে নাট্যকারকে বাধ্য হয়ে দৃশ্যপট অপরিবর্তিত ও সময়কে মোটামুটি সীমাবদ্ধ রাখতে হত। তাই নাটকের মধ্যে দৃশ্য পরিবতন, অঙ্ক বিভাগ, স্থান পরিবতনের বিশেষ প্রশ্ন উঠত না। সমস্ত ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের সুযোগ কোরাসের কেন্দ্রানুগ শক্তির আকর্ষণে একটি আশ্চর্য সংহতি লাভ করত। প্রথম যুগের গ্রীক্ নাটকে ত্রয়ী ঐক্যের সুষ্ঠু প্রয়োগ যতখানি লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তীকালের নাটকে তা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে যাবার প্রথম কারণ এই যে কোরাস পরবর্তী কালের নাটকে গৌণ হয়ে ধীরে ধীরে ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপ

অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। ইস্কাইলাস ও সফোক্লিসের নাটকে কোরাসের ভূমিকা অধিক বলেই ত্রয়ী-ঐক্যের নির্দশন সেখানে বেশী, আবার পরবর্তী নাট্যকার ইউরিপিডিস বা এরিষ্টোফেনিসের নাটকে কোরাসের ভূমিকা স্বল্প বলেই ত্রয়ী ঐক্যের নিদর্শন সেখানে কম। গ্রীক্ নাটকে কোরাসের এই বিবর্তনধারার সঙ্গে সঙ্গে ত্রয়ী ঐক্যের বিবর্তনধারা যুক্ত।

আরিষ্টটল সমকালীন গ্রীক্ নাটকের প্রেক্ষিতে নাটকের তিনটি ঐক্যের কথা উল্লেখ করে বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন ঘটনা ঐক্যের দিকে, কিন্তু স্থান-ঐক্য ও কাল-ঐক্যকে নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে উল্লেখ না করে ঐ দুটিকে সাধারণভাবে নাটকীয় প্রবণতা হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নাটকের ক্ষেত্রে, য়ুরোপে নবজাগরণের লগ্নে ষোড়শ শতাব্দীতে, নাটকের ত্রয়ী ঐক্য একটি অবশ্য পালনীয় নাটকীয় তত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হয় এবং নাট্যসমালোচনার ক্ষেত্রে অন্যতম মানদণ্ড হিসাবে প্রযুক্ত হতে থাকে। নবজাগরণোত্তর ছদ্ম-ক্লাসিক সমালোচকগণ যথা কস্তেলভেত্রো, স্কালিগের প্রভৃতি ইতালীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন যে এই ত্রয়ী ঐক্য যথাযথ রক্ষিত হলেই বাস্তব জীবনানুগ ও স্বাভাবিক হবে। ফরাসী সমালোচক বঁইলু নাট্যরচনার অপরিহার্য সূত্র হিসাবে নির্দেশ-নামা দেন—একটি মাত্র একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘটনাবৃত্ত, একটি মাত্র দৃশ্য এবং একটি মাত্র দিনের কালসীমা। গ্রীক্ নাটকে ত্রয়ী ঐক্য যতখানি না অনুসৃত হয়েছে বা অনুসরণ করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল—তার চেয়ে অনেক বেশী কঠোরতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ত্রয়ী ঐক্য বিধি পালন করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল ফ্রান্স ' ইতালীতে ছদ্ম-ক্লাসিক নাট্যসমালোচক ও নাট্যকারদের মধ্যে। সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছদ্ম-ক্লাসিক সাহিত্যের পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ফরাসী দেশে কর্ণেই, রাসিন, ভোলতের বা ইতালীতে আলফিয়েরী, ইংরেজী সাহিত্যে জন্‌সন্ এই ত্রয়ী ঐক্যকে নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ ও মূল সূত্র হিসাবে প্রয়োগের চেষ্টা করেন। নাটক যেহেতু দৃশ্যকাব্য, সুতরাং অভিনয়ের বাস্তব সম্ভাব্যতার উপর এঁরা অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। নাটকীয় আখ্যান ভাগ রঙ্গমঞ্চে দেখাতে যতক্ষণ সময় লাগে, বাস্তব জীবনে সংঘটিত হতে যেন ঠিক ততক্ষণ সময় লাগে—কাল-ঐক্যের দাবীর ভিত্তি এই বাস্তব স্বাভাবিকতার উপর। দ্বিতীয়তঃ ঐ একই কারণে ছদ্ম-ক্লাসিক নাট্যকারগণ দাবী করেন

যে, নাটকে এমন কোন স্থানের উল্লেখ থাকতে পারবেনা, যেখানে নাট্যনির্দেশিত সময়ের মধ্যে নাটকের কুশীলবগণ যাতয়াত করতে পারবে না। তৃতীয়তঃ ঘটনা ঐক্যের ব্যাপারে ছদ্ম-ক্লাসিক নাট্যকারগণ আরিষ্টটলের একক ঘটনাবৃত্ত বলতে ('an action one and complete') উপকাহিনীহীন ও প্রাসঙ্গিক দৃশ্য বা চরিত্রের উপস্থিতিহীন সরল কাহিনীবৃত্ত বুঝেছেন। বস্তুতঃ আরিষ্টটলের ঘটনাবৃত্ত সম্পর্কে নির্দেশনামার মধ্যে এই বহিরঙ্গগত ঋজুতা ছিল না—একথা আগেই বলা হইয়াছে। আরিষ্টটল বহিরঙ্গ বৈচিত্র্যের মাধ্যমে অন্তরঙ্গ অনিবার্যতা ও সম্ভাব্যতার প্রেক্ষিতে জৈবিক ঘটনাবৃত্তের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ছদ্ম-ক্লাসিক নাট্যরচিয়তাগণ বহিরঙ্গ ঐক্য ও অন্তরঙ্গ ঐক্য —ঘটনাবৃত্তের বেলায় এই দুটি দিকেই সমধিক জোর দিয়েছেন। ফলে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে এই সূত্রটি একটা সুনির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

অথচ নবজাগরণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ য়ুরোপে শুধু মাত্র গ্রীক্-রোমক্ সভ্যতার প্রতি স-নিষ্ঠ আগ্রহ নয়, জাতীয় জীবনে সদ্যজাগ্রত রোমান্টিসিজম, বৈচিত্র্য, বিস্তৃতি, বন্ধনমুক্তি, কল্পনা বিস্তার প্রভৃতির প্রতি নবোদিত আসক্তি দেখা দিচ্ছে। ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের অভাব লক্ষ্য কবা যায়। ইতালিতে এই পবিস্থিতি তীব্র আকার ধারণ করে। নাট্যসমালোচনার ক্ষেত্রে আরিষ্টটলের ঐক্য সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্যগুলি এক নিয়ামক সূত্র হিসাবে পালিত হতে থাকে, অন্যদিকে যুগ-চাহিদা পরিবর্তন, উত্তেজনামুখী। একই সঙ্গে কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ এই দোটানায় পড়ে ইতালীয় নাট্যকারগণ এক উভয়-সংকটে পড়েন। ত্রয়ী ঐক্যের কঠোর অনুশাসন মেনে তাঁরা একদিকে নাটকের সংহতিদানের চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে যুগরুচির প্রেক্ষিতে তাঁদের নাটকে কিছু কিছু শিথিলতাও দেখা দিয়েছে। ফরাসী নাট্যকারগণও এই দ্বিধা থেকে মুক্তি পাননি। কর্ণেই মনে প্রাণে রোমান্টিক ভাবাপন্ন ছিলেন, অথচ তিনি ত্রয়ী ঐক্যবিধি মেনে ট্রাজিডি রচনা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত ও বহুবিতর্কিত Le Cid নাটকটি ত্রয়ী ঐক্যের সুষ্ঠু প্রয়োগের নিদর্শন হিসাবে বিবেচনা করা হলেও, তার মধ্যেই ত্রয়ী ঐক্যের শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। প্রণয়ীর প্রতি ইনফ্যাণ্টার প্রেমের দৃশ্যটি উপকাহিনী হিসাবে পরিণতি লাভ না করলেও মূল কহিনীর প্রেক্ষিতে একটি স্বতন্ত্র সুরের সৃষ্টি

করেছে। এদিক দিয়ে ছদ্ম-ক্লাসিকগণের ঘটনা-ঐক্যের দাবী খানিকটা শিথিল হয়েছে—একথা স্বীকার করতেই হবে। অন্যদিকে Le Cid নাটকে রাজার সঙ্গে নায়িকার সাক্ষাতের দৃশ্যগুলিতে বা দ্বৈত-সমরেব ঘটনা দুটিতে বা মুরদের সঙ্গে বিরাট যুদ্ধ কাহিনী প্রসঙ্গে কাল-ঐক্য অনেকখানি পরিমাণে শিথিল হয়েছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অন্যদিকে ইউরোপে নবজাগরণের অব্যবহিত পরিণতি যেমন ছদ্ম-ক্লাসিক সাহিত্য রচনার প্রেরণা দিয়েছে, তেমনি পাশাপাশি রোমান্টিকতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য আন্দোলনে এই ত্রয়ী ঐক্যেব বাধ্যবাধকতা নিতান্তই শিথিল হয়ে পড়ে। সমাজ জীবনে জটিলতা বৃদ্ধি, কল্পনা শক্তির, উন্মেষ, রোমান্সরসের প্রেক্ষিতে জীবনের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের প্রতি নবোদ্ভূত আকর্ষণ ইত্যাদি কারণে নাট্যরচনায় এই ত্রয়ী বিধির ঋজুতা অবহেলিত হয়ে পড়ে। ইংরেজী সাহিত্যে এলিজাবেথীয় ও স্টুয়ার্ট-যুগের নাট্যকারদের হাতে বিশেষ করে শেক্‌সপীঅরের হাতে এই ত্রয়ী ঐক্যের সমাধি রচিত হতে দেখি। জার্মান নাট্যকাব লেসিং, গোতে, শিলার এবং ফরাসী নাট্যকার আলেকজাণ্ডার ডুমা, ভিক্টর হুগো এবং সমসাময়িক অন্যান্য রোমান্টিক নাট্যকাবগণ গ্রীক্ নাটক প্রসঙ্গে উল্লিখিত ত্রয়ী ঐক্যের বিধি-বিধানকে অবহেলা করে নতুন দৃষ্টিকোণে নাটক রচনার সূত্রপাত করেন। ঘটনা-ঐক্যের ক্ষেত্রে একটিমাত্র সবল কাহিনীর উপস্থাপনার পরিবতে মূল কাহিনীর পাশাপাশি উপকাহিনীর সৃষ্টি কবে একদিকে কাহিনীর জটিলতা ও বৈচিত্র্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে এই ভিন্নমুখী ঘটনার স্রোতধারাকে অন্তিমে একই রসানুভূতির সাগরসঙ্গমে মিলিত করার জৈবিক কৌশল (Organic) রোমান্টিক নাট্যকারদেব অন্যতম সিদ্ধি বলে পরিগণিত হল। রোমান্টিক নাট্যআন্দোলনের পুরোধা শেক্‌সপীঅরের নাটকের ঘটনা-বৈচিত্র্য, সময়ের সীমারেখার যত্রতত্র উল্লম্ফন, স্থানের স্থাণুত্বের বাধাকে অতিক্রম করে ভৌগোলিক প্রসার —নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে মুক্তির নবদিগন্ত রচনা করল। ঘটনার বৈচিত্র্য, স্থান-কালের সীমারেখা অতিক্রম—ইত্যাদি প্রসঙ্গ আধুনিক জীবনযাত্রাব অগ্রদূত রোমান্টিক আন্দোলন স্বাভাবিক হিসাবে গ্রহণ করল। ত্রয়ী ঐক্যের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণার চূড়ান্ত নিদর্শন শেক্‌সপীঅরের The winter's Tale নাটকটি। নাটকটির তৃতীয় অঙ্ক ও চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে ষোল বছরের কাল ব্যবধান লক্ষ্য করা গেছে।

অন্যদিকে শেক্‌সপীয়র গ্রীক্ নাট্যকলার শিথিল ঐক্যবিধি বা ছদ্ম-ক্লাসিক যুগের আরোপিত ঐক্যবিধির অপরিহার্যতার প্রতি নিদারুণ অবহেলা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও, তিনি যে ত্রয়ী ঐক্যবিধিকে প্রথাগতভাবে মেনে নাটকরচনা করতে পারেন এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যই যেন অন্ততঃ দু'খানি নাটক রচনা করেন—Comedy of Errors এবং The Tempest. এ'দুটি নাটকে ঘটনাবৃত্ত একদিনের মধ্যে এবং একটিমাত্র স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে The Tempest নাটকের কালসীমা তো আক্ষরিক অর্থে ছদ্ম-ক্লাসিকদের বাঞ্ছিত কালসীমা—অর্থাৎ অভিনয়ের কালসীমা ও ঘটনার কাল-পরিধি অভিন্ন। মাত্র চার ঘণ্টা কাল-পরিধি নিয়ে নাটকটির ঘটনাবৃত্ত সমাপ্ত হয়েছে। স্থান-ঐক্য The Tempest নাটকে প্রায় পূর্ণভাবে পালন করা হয়েছে। মিলটনের Samson Agonistes নাটকে যেভাবে নিখুঁত স্থান-ঐক্য লক্ষ্য করা যায়—অর্থাৎ দৃশ্যেব কোন পবিবর্তন না করে একই স্থানের মধ্যে ঘটনাকে সীমাবদ্ধ রাখা—ঠিক ততখানি স্থান ঐক্য The Tempest-এ নেই। ঝড়েব পরে সেই জনবিরল দ্বীপে প্রসপেবোর গুহার সামনেই অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে। কেবল মাত্র চাবটি দৃশ্যে (২য় অঙ্ক—১ম, ২য় দৃশ্য। ৩য় অঙ্ক—২য়, ৩য় দৃশ্য) ঘটনার স্থান পবিবর্তিত হয়ে দ্বীপের অন্য আর একটি অংশে সংঘটিত হয়েছে। স্থান-ঐক্য এই নাটকে কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়েছে সেটা বোঝা যায় শেক্‌সপীঅরেব অন্যান্য নাটকেব সুদূরবর্তী স্থানে ঘটনার দ্রুত পটপরিবর্তনের কথা মনে বাখলে। ক্লাসিকাল ঐক্যরীতির বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও শেক্‌সপীঅর যে ক্লাসিকাল পদ্ধতিতে নাটকরচনায় সিদ্ধহস্ত—এই বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় উল্লিখিত নাট্যদ্বয়ের সংযোজনায়।

সংস্কৃত নাটকে তত্ত্বহিসাবে এই ত্রয়ী ঐক্যের প্রসঙ্গ কিছু কিছু উত্থাপিত হলেও সাহিত্যের প্রয়োগক্ষেত্রে সংস্কৃত নাট্যকারগণ ঐ সূত্রগুলি আদৌ অনুসরণ করেন নি বলা চলে। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে', বিশ্বনাথের 'সাহিত্য-দর্পণে,' ধনঞ্জয়ের 'দশরূপকে' এই ঐক্যের প্রশ্ন সরাসরি না হলেও প্রাসঙ্গিক-ভাবে উত্থাপিত হয়েছে। নির্দিষ্ট রসবৃত্তে উপনীত হবার জন্য কোন অবান্তর ঘটনা বা দৃশ্য বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বরং প্রয়োজন হলে সেই প্রসঙ্গগুলি কোন চরিত্র বা সূত্রধারের বিবৃতির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যেতে

যেতে পারে। দর্শকের রসানুভূতি যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় এজন্য যুদ্ধ, হত্যা, বিবাহ বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ভোজন, নিদ্রা, স্নান ইত্যাদি গার্হস্থ্য নিত্যক্রিয়াগুলি নাটকে রূপায়িত করার ব্যাপারে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণেব দৃঢ় আপত্তি ছিল। অবশ্য নাট্যকারগণ এই নিদেশগুলি সর্বদা পালন করেন নি। এই ভাবে উদ্দিষ্ট রসবৃত্তে উপনীত হবার জন্য যে বহু ঘটনা বা দৃশ্য বর্জন কবা দরকার এটি সংস্কৃত অলঙ্কারিকগণ বুঝেছিলেন। সংস্কৃত নাট্য আলোচনার পরবর্তী স্তরে সময়ের ঐক্য সম্পর্কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে একটি সমগ্র নাটকের ঘটনাবৃত্ত এক বৎসর বা তদূর্দ্ধ কালব্যাপী হতে পারে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একটিমাত্র অঙ্ক সম্পর্কে 'নাট্যশাস্ত্রে'ব নিদেশ—'একদিবসঃ প্রবৃত্তঃ কার্যস্ত্বঙ্কো অথ বীজমধিকৃত্য।' (২০শ পরিচ্ছেদ, ২৪শ শ্লোক)। বা 'সাহিত্যদর্পণেব' নির্দেশ—'নানেকদিননির্বত্য কথযা সম্প্রযোি‍ ‍ং।' (৬ষ্ঠ পবিচ্ছদ)। যদিও সংস্কৃত নাটকের প্রয়োগক্ষেত্রে এই জাতীয় সময়ের ঐক্য আদৌ পালিত হয়নি, এমনকি দীঘ বারো বছরের ঘটনাবৃত্ত নাটকে প্রদর্শিত হয়েছে—তবুও কোনও কোন ক্ষেত্রে যেমন ভবভূতির 'মহাবীরচরিত' নাটকে বা রাজশেখরেব 'বালবামচরিত' নাটকে আলঙ্কারিক নির্দেশিত সময়ের ঐক্য কিছুটা পালন কবা হয়েছে। যদিও এসমস্ত ক্ষেত্রে মহাকাব্যের সংক্ষিপ্তকরণেব মধ্যে সময়ের ঐক্য মেনে চলার একটা প্রবল বাধা রয়ে গেছে। স্থানের ঐক্য সংস্কৃত নাটকে অজ্ঞাত ছিল, কাবণ দৃশ্যপটের অনুপস্থিতি। বাজসভা ও মুক্ত অঙ্গনে অভিনয় সম্প ত হত বলে স্থানেব ঐক্য সম্পর্কে ঔদাসীন্য ছিল। দৃশ্য পরিবর্তনের কথা পুস্তকেই উল্লেখ করা হত। মহাকবি ভাসেব একাঙ্ক নাটিকাগুলিতে একটিমাত্র ঘটনাকে একটিমাত্র দৃশ্যে এবং একটিমাত্র কালপর্বে ও অবিচ্ছিন্ন কালধারায় উপস্থাপিত করে ত্রয়ী ঐক্যেব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে দেখি।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ ঘটেছে পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক নাট্য আন্দোলনের ধারাকে অনুসরণ করে, কিছুটা বা সংস্কৃত নাটকের ধারাকে অনুসরণ করে—সুতরাং ত্রয়ী ঐক্যবিধি পালন করার তাগিদ বাংলা নাট্যকারগণ কোন দিনই অনুভব করেন নি। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনাকৌশলের মধ্যে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় এক বিরল ব্যতিক্রম। ফলে তাঁর নাটকে ত্রয়ী ঐক্যের

কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা,' 'রক্তকরবী' নাটকে দৃশ্যের কোন পরিবর্তন নেই, ফলে স্থান-ঐক্য মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনটির মধ্যে স্থান-ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। 'মালিনী' নাটকটিতে ঘটনাবৃত্ত আদর্শ গ্রীক্-নাটকের ঐক্য বজায় বাখতে সক্ষম হয়েছে।

আরিষ্টটলের আমল থেকে বর্তমান শতক পর্যন্ত গ্রীক্-নাটকের ত্রয়ী ঐক্যেব অনেক সমালোচনা হলেও, এবং বাস্তব প্রযোগ ক্ষেত্রে এর শিথিল রূপ দেখা গেলেও বিশুদ্ধ তত্ত্ব হিসাবে, অভিনয়কলার দিক দিয়ে বিচার করলে বা বর্তমান সমাজ মানসিকতাব প্রেক্ষিতে এই তিনটি ঐক্যের মূল্য অস্বীকাব কবা যায় না। প্রথমতঃ বাস্তবধর্ম, প্রত্যক্ষ ক্রিয়া এবং উপস্থাপনা ধর্ম যেহেতু নাটকেব মূল ধর্ম, অতএব যে সব ঘটনা বা দৃশ্য, কালব্যাপ্তি দর্শকেব বাস্তব বিশ্বাসবোধে বাধা সৃষ্টি কবে সেই সব ঘটনা বা দৃশ্য পরিহার কবাই ভালো। দ্বিতীযতঃ, অভিনেযতার দিক দিযে বিচাব কবলে দীর্ঘকালব্যাপী ঘটনাব রূপ দিতে গিযে পাত্রপাত্রীর বয়ঃক্রম ঠিক বাখা সম্ভব নয়। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত একটি চরিত্রের জীবনালেখ্য একটি মাত্র অভিনেতাব দ্বাবা অভিনীত হওযা সম্ভব নয়। সুতরাং অভিনয় সার্থকতার দিক দিযে সময়েব ঐক্য বজায রাখা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, শুধু মাত্র বাস্তব জীবনেব আভাস সৃষ্টি কবা নয়, শৈল্পিক প্রয়োজনে এই ত্রয়ী ঐক্য মেনে চলা উচিত। বুচারেব অভিমত উদ্ধাব কবে আধুনিক সমালোচক টি, এস, এলিয়ট মন্তব্য কবেছেন—এই ত্রযী ঐক্য হচ্ছে—'The casual connection that binds together the several parts of a play'—এবং এগুলি যেখানে পালন করা হয—'the whole series of events, with all the moral forces that are brought into collission, are directed to a single end.' (The Use of Poetry and the Use of Criticism—1940. p.p. 45 ff.) ত্রয়ী ঐক্যের আব একজন আধুনিক সমর্থক লিটন স্ট্রাচীব মতে নাটকের চূড়ান্ত সিদ্ধির পক্ষে এই ঐক্যগুলি লক্ষ্য বিন্দুব প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখার সহায়ক স্বরূপ—'The true justification of the unities of time and place is to be found in conception of drama as the history of a spiritual crisis—the vision thrown up, as it were by a bulls', eye lantern, of the final catastrophie phases of a

long series of events.' (Literary Essay. 1948.p.62)। চতুর্থতঃ, বর্তমান কালে নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে একাঙ্কিকার স্থান অনস্বীকার্য। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখ সমস্যার কথা আজকের দিনে সাহিত্যের একটি মৌল জিজ্ঞাসা—যা রূপলাভ করছে ছোট গল্প, একাঙ্কিকা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। আজকের দিনের সদা কর্মব্যস্ত মানুষ একাঙ্কিকার ক্ষুদ্র পরিসরে জীবনের নানাবিধ সমস্যার একটি ভগ্নাংশের পূর্ণ রসরূপ দেখেই অধিকতর তৃপ্তিলাভ করে—ফলে একাঙ্কিকার জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। স্বভাবধর্মের জন্য এই একাঙ্কিকাগুলিতে ত্রয়ী ঐক্যের নিখুঁত প্রতিফলন বাঞ্ছনীয়। —শ্যা. স.

নাটক—সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নাটককে বলা হয়েছে দৃশ্যকাব্য। সাহিত্য দর্পণের মতে 'দৃশ্য , তত্রাভিনেয়ম্'। অর্থাৎ, দৃশ্যকাব্য হ'ল সেই কাব্য যা অভিনীত হয়। আ[illegible]ও বলেছেন…'in a play the personages act the story'. সুতরাং এই অভিনেয়ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই নাটক রচনা করা হয়। নিছক পাঠ্যরূপে যে নাটক রচিত হয় তার কোনো মূল্য নেই। অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই নাটক [illegible]ত হয় ব'লে অভিনয়কলার সঙ্গে নাট্যকলার অঙ্গাঙ্গী যোগ রয়েছে। নাট্যকার যখন নাটক রচনা করতে বসেন তখন তাঁকে চিন্তা ক'রে নিতে হয়, তিনি যে-সব দর্শকের জন্য নাটক লিখছেন তাঁদের রুচি ও রসবোধ কিরূপ এবং যে রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনীত হবে তাতে নাট্য-প্রয়োগ ও অভিনয় কৌশলের সুযোগই বা কিরূপ। সেজন্য যুগে যুগে দর্শকদের [illegible] ও মানস প্রকৃতি অনুযায়ী নাটকের ভাব ও আকৃতির পরিবর্তন হয়েছে এবং রঙ্গমঞ্চের রূপ ও রীতি অনুযায়ী নাটকের রূপ ও রীতিও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। নাট্যকার নাটকে রস সৃষ্টি করেন, অভিনেতা সেই রস ফুটিয়ে তোলেন এবং দর্শক সেই রস আস্বাদ করেন। সুতরাং নাটকের সার্থক রসসৃষ্টি এই তিন শ্রেণীর লোকের পারস্পরিক সুষ্ঠু সহযোগিতার উপর নির্ভর করে।

নাটক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতমূলক ঘটনা অবলম্বন ক'রে তার মধ্যে উত্তেজনাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির দ্বারা তীব্র গতিবেগ সঞ্চার ক'রে তাকে এক নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে দ্রুত টেনে নিয়ে যায়। [illegible] গতিবেগই নাটকের প্রাণ। গতিবেগ সৃষ্টির জন্য নাট্যকারকে কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করতে হয়। গতিবেগের জন্য প্রয়োজনীয় সংঘাত, নাট্যোৎকণ্ঠা, নাট্যশ্লেষ, আকস্মিকতা

প্রভৃতির সুকৌশলে অবতারণা করা। নাটক বহুলোকের মন একসঙ্গে প্রবলভাবে আকৃষ্ট ক'রে রাখবার জন্য রচিত হয়, সেজন্য নাট্য-ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কৌতূহল ও উত্তেজনাজনক উপাদান থাকা চাই।

নাটকের বিভিন্ন অঙ্গ—যথা, ঘটনা সংস্থাপনা, চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপ। ঘটনাসংস্থাপনকৌশল বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়। নাট্য-ঘটনার উপস্থাপনা, বিবর্তন ও পরিণতি সৃষ্টি করবার কৌশলের উপরেই নাটকের রসসৃষ্টি ও দর্শকচিত্তে তার আবেদন নির্ভর করে। নাটকের মধ্যে একটা জটিলতা সৃষ্টি করা এবং সেই জটিলতা মোচন করাই হল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। তার জন্য তাঁকে ঘটনাকে নানা কৌশলে সাজাতে হয়। ঘটনার সাময়িক বিরতি দিবার জন্য অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ। আবার একটি ঘটনার সঙ্গে অনেক সময় উপঘটনাও যুক্ত হ'য়ে থাকে। তবে আধুনিক সংক্ষিপ্ততার যুগে ঘটনাবৈচিত্র্য নাটকে কমে এসেছে। নাটকে ঘটনা প্রধান, না চরিত্র প্রধান এই নিয়ে চিরকাল তর্কবিতর্ক হ'য়ে এসেছে। আরিস্টটল ঘটনাকে প্রধান বলেছিলেন। অবশ্য ঘটনা ও চরিত্র পরস্পরেব সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, এদের কোনোটিবই আপেক্ষিক প্রাধান্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। নাটকের বাণীরূপ ফুটে ওঠে সংলাপের মধ্যে। সংলাপকে নাটকেব সর্বপ্রধান অঙ্গ বলা যেতে পাবে, কারণ বাহ্যত নাটকের সংলাপ ছাড়া আর কিছুই নেই। ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টি এই সংলাপের মধ্য দিয়ে মূর্ত হ'য়ে ওঠে। সংলাপের দুটি দিক, একটি হ'ল তার নাটকীয় দিক আর একটি হল তার চিরন্তন সাহিত্যিক দিক। এই সাহিত্যিক গুণের ফলেই নাটক তার রঙ্গমঞ্চের গণ্ডি ও অভিনেয়তার সীমা অতিক্রম ক রে নিত্যকালের সাহিত্য দরবারে স্থান পায়।

নাটকের আকৃতি ও রীতি অনুযায়ী নাটকের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা হ'য়ে থাকে, যথা, রোমান্টিক, ক্লাসিক, বাস্তবধর্মী, সাঙ্কেতিক, প্রকাশবাদী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক। আবার বাংলা নাটকের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীও গণ্য হ'য়ে থাকে। নাটকের রসপরিণতি অনুযায়ী আবার নাটকের দুটি মৌলিক বিভাগ স্বীকৃত হয়েছে, যথা, ট্রাজিডি ও কমেডি। উভয় রসাত্মক নাটকও আবার সূক্ষ্মতর নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে থাকে।

—অ. কু. ঘো.

নাটকীয় দ্বন্দ্ব—নাটকীয় বিষয়বস্তুর প্রকাশ নাটকীয় ক্রিয়ার (dramatic action) মধ্য দিয়ে—এই নাটকীয় ক্রিয়া সৃষ্টিতেই নাটকের নাটকত্ব নিহিত। এই ক্রিয়াসৃষ্টির জন্য নাট্যকার কতকগুলি উপায় অবলম্বন করেন যার মধ্যে প্রধানতম, নাটকীয় দ্বন্দ্ব (dramatic conflict)। নাটকীয় ক্রিয়া তখনই তীব্র হয় যখন নাটকীয় চরিত্র কোন না কোন জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, আর এর ফলেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। নাটকীয় দ্বন্দ্বের আবার দুটি প্রকারভেদ আছে। বহির্মুখী (outer conflict) এবং অন্তর্মুখী (inner conflict)। চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের, মনের সঙ্গে মনের, ব্যক্তির সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বা কোন অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য শক্তির যে দ্বন্দ্বের ফল বাহ্য ক্রিয়া বা action এর দ্বারা প্রকাশিত হয় তাকেই বহির্মুখী দ্বন্দ্ব (outer conflict) বলে। প্রাচীন গ্রীক্ ট্রাজিডিতে এই দ্বন্দ্ব বহুল পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে। অদৃশ্য, অলঙ্ঘ্য দৈবশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের দ্বন্দ্বই গ্রীক্ ট্রাজিডির ট্রাজিক রসের সূচনা করেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' (১৯২৬) নাটকে দৈবের সঙ্গে কর্ণের পুরুষকারের সংঘাতে এই বহির্দ্বন্দ্বই রূপায়িত। অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তখনই যখন চরিত্রের অভ্যন্তরেই প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কর্তব্যবোধের, সমাজানুগত্যের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যবোধের, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়বোধের, আদর্শ চেতনার সঙ্গে বাস্তবদৃষ্টির বিচিত্র সংঘাত উপস্থিত হয়। গ্রীক্ ট্রাজিডি লেখকদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ ইউরিপিডিসের নাটকে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস যদিও পাওয়া যায়—তথাপি এ সত্য অনস্বীকার্য যে এলিজাবেথীয় নাটক তথা শেক্‌সপীঅরীয় ট্রাজিডি থেকেই এই অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়ণের যথার্থ সূত্রপাত। শেক্‌সপীঅরীয় নাটকেই সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের যুগপৎ অবস্থান লক্ষ্য করা যায়—সেখানে দুই-ই ট্রাজিক রস সৃষ্টি করেছে তবে অন্তর্দ্বন্দ্বই নিঃসন্দেহে অধিকতর গুরুত্ব ও তীব্রতা লাভ করেছে, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যই ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট প্রভৃতি চরিত্র ট্রাজিক জগতের উচ্চতম অধিবাসী হয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' নাটকের নায়ক কর্ণের মধ্যে একদিকে মর্ম বা হৃদয়বোধ যা পরাজয় কামনা করে, আর অন্যদিকে সত্যবোধ, ও মনুষ্যত্ববোধ যা নিষ্ঠুরতা আকাঙ্ক্ষা করে—এ দুয়ের তীব্র আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখতে পাই।

'মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়,
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা … …'

—দ্বিতীয় অঙ্ক ,চতুর্থ দৃশ্য।

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের জয়সিংহের মধ্যে হৃদয়ধর্ম ও স্নেহপ্রেম এবং শাস্ত্রবিধি ও গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাসের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। প্রতিমা ও রঘুপতির বন্ধন তার চিত্তকে যেমন কঠিনভাবে বেড়েছে, অপর্ণার আকর্ষণও তেমনি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নুরজাহান' নাটকের নায়িকা নুরজাহানের চিত্তে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যবোধজাত শ্রদ্ধা ও অপরিমিত উচ্চাশা—যার প্রকাশ ভারতের সম্রাজ্ঞী পদের জন্য লোলুপ কামনায় —এ দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির তীব্র দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। শুধু ট্রাজিডি নয়, কমেডির মধ্যেও নাটকীয় দ্বন্দ্বই হাস্যরসসৃষ্টির মুখ্য কারণ। যে এই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তার প্রয়াসের প্রতি আমাদের মনে সহানুভূতি না জেগে যদি কৌতুকবোধ জাগে তবেই নাটকটিতে কমিক রসের সৃষ্টি হয়। অবশ্য কমেডির দ্বন্দ্ব সাধারণতঃ বহির্দ্বন্দ্ব—বাহ্য ঘটনা ও চরিত্রের বাহ্য আবরণের মধ্যেই তা পরিস্ফুট হয়—এক পরিস্থিতির সঙ্গে অপর পরিস্থিতির, পরিস্থিতির সঙ্গে চরিত্রের বাহ্যসংঘাতেই কমেডির নাট্যরস ঘন হয়ে ওঠে। —অ ঘো.

নাটকীয়-অনিশ্চয় উৎকণ্ঠা—দ্রঃ ড্রামাটিক সাস্‌পেন্স।

নাটকের গঠন (পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্র)—নাটক যেহেতু দৃশ্যকাব্য, কয়েক ঘণ্টার জন্য দর্শকের উপস্থিতির প্রেক্ষিতে নাট্যকাহিনীর সমাপ্তি অবশ্য পালনীয়—তাই সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা (যথা, উপন্যাস) নাটকের কাহিনী (Plot) বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকারকে অনেক বেশী সতর্ক এবং সংযত হতে হয়। নাট্যকারকে তাই বিষয়বস্তুর সংহতি, মূলকাহিনীর পটভূমিকায় অনাবশ্যক দৃশ্য-বর্জন ও আবশ্যকীয় উপাদান নির্বাচনের দিকে অখণ্ড মনোযোগ দিতে হয়। সেই কাহিনী এলোমেলো, গতিহীন ও পরিণতিহীন হলে চলবে না। তার একটি আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণতি থাকবে। এই আদি-মধ্য-অন্তসমন্বিত একটি নিটোল কাহিনীই নাটকের উপজীব্য।

নাটকীয় কাহিনীর মূল কথা বিপরীতমুখী শক্তির সংঘাত। নাটকের প্রকৃতি অনুযায়ী এই সংঘাত কোথাও তীব্র কোথাও বা লঘু—তবুও কমবেশী

সংঘাত ছাড়া কোন নাটকের কাহিনীর মধ্যে গতিবেগ সৃষ্টি করা যায় না। কোথাও ব্যক্তির সঙ্গে দৈবের কোথাও বা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির; কোনক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, অন্যত্র ব্যক্তির নিজস্ব চরিত্রগত বিপরীত প্রবণতার মধ্যে এই সংঘাত সৃষ্টি হয়। সংঘাতের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, এই সংঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকীয় কাহিনীর সূত্রপাত হয়, এবং সংঘাতের অবসানে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। নাটকীয় সংঘাতের সঙ্গে নাটকীয় কাহিনীর এই সহ-সম্পর্ক আছে বলেই নাটকের কাহিনী একটা সুনির্দিষ্ট ধারায় পরিণামমুখী হয়। পরস্পর বিপরীত দুটি শক্তির সংঘাত থেকে কাহিনীর মধ্যে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, তা নানা প্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিতে বাড়তে বাড়তে এমন একটা স্তরে উপনীত হয় যেখানে গিয়ে কাহিনীর গতিপথ, শক্তি দুটির যে কোন একটি পক্ষকে অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেয়, এবং অতঃপর কাহিনীর ধারা সামান্য বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে অনিবার্যভাবে একটা পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়। নাটকীয় কাহিনী ধারার এই ক্রমবিকাশকে আদি-মধ্য-অন্তসম্বলিত কাহিনী ঐক্য বলতে চেয়েছেন আরিষ্টটল। প্রত্যেক নাটকীয়-কাহিনীর মধ্যে আদি-মধ্য-অন্তসম্বলিত একটা নাটকীয়-রেখা লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকীয়-রেখার পাঁচটি স্তর-বিভাগ পরিকল্পিত হয়েছে—(১) প্রারম্ভ—সংঘাতের সূত্রপাত। (২) প্রবাহ—সংঘাতের তীব্রতাবৃদ্ধি, অথচ ফলাফল এই স্তরে অনিশ্চিত। (৩) উৎকর্ষ-সংঘাতের চূড়ান্তরূপ এমন একটা স্তরে উপনীত হয় যেখানে পরস্পর-বিরোধী শক্তি দুটির একটি প্রবলতর হযে সমস্ত কাহিনীর ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে—এবং অদূর ভবিষ্যতে একটি শক্তির উ ন, ও অন্যটির পতনের ফলে দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে নাটকীয় কাহিনী একটা সমাধানে উপনীত হতে পারবে, এ জাতীয় বোধের সূত্রপাত। (৪) গ্রন্থিমোচন—প্রবল শক্তির জয় ঘোষণার পর্যায়। (৫) উপসংহার—এখানে কাহিনীর সংঘাতের পরিপূর্ণ অবসান।

ইংরেজী অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী নাটকীয় রেখার ক্রমপরিণতির এই পাঁচটি স্তরকে বলা হয়—(১) Initial Incident (২) Rising Action বা Growth বা Complications, (৩) Climax, বা Crisis বা Turning Point; (৪) Falling Action বা Resolution বা Dénouement; (৫) Catastrophe বা Conclusion.

নাটকীয়-রেখার এই পাঁচটি স্তরের উপর ভিত্তি করে খুব সম্ভবতঃ নাটকে পাঁচটি অঙ্কের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রেণেসাঁস-পরবর্তীযুগে ইংলণ্ড, ইতালী এবং ফরাসী দেশে নাটকীয় কাহিনীর গঠন-কৌশলে অঙ্ক-বিভাগ পরিকল্পনাটি সেনেকার লাতিন ট্রাজিডির পঞ্চাঙ্ক-বিভাগ পরিকল্পনা দ্বারা সমধিক প্রভাবিত—এবং সেনেকার এই পঞ্চাঙ্ক বিভাগ যে গ্রীক্-ট্রাজিডির একটি প্রোলোগ (Prologue), তিনটি এপিসোড (Episode) এবং একটি এক্সোডাস (Exodus) —মোট এই পাঁচটি বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য পঞ্চাঙ্ক-মাত্রেই নাটকীয়-রেখার উপরোক্ত পাঁচটি স্তরকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলে তা নয়। অধিকাংশ পঞ্চাঙ্ক নাটকের অঙ্কবিভাগ পরিকল্পনা কৃত্রিম। কিন্তু নাটকীয় রেখার পাঁচটি স্তরের মধ্যে ঘটনা-বৃত্তের একটা জৈবিক (organic) বিবর্তনের ধারা অনুসৃত হয়। অধিকাংশ নাটকেই দেখা যায়, এমন কি শেক্সপীঅরের নাটকও ব্যতিক্রম নয় যে, প্রথম অঙ্কেই ঘটনার জটিলতা এবং তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত সেই জটিলতার প্রসারণ, আবার তৃতীয় অঙ্কে একই সঙ্গে ঘটনার জটিলতা, চূড়ান্ত পরিস্থিতি এবং পরিণতির পূর্বাভাস, অন্যদিকে আবার ঘটনার পরিণতি চতুর্থ অঙ্কের মধ্য দিয়ে পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কিন্তু নাট্যরেখার স্বাভাবিক স্তর বিন্যাসগুলি নাটকের পাঁচটি অঙ্কের কৃত্রিম ঘটনাবিন্যাসের উপর নির্ভর করে না। আধুনিক কালের চার-অঙ্ক বা তিন-অঙ্ক বা একাঙ্ক নাটকগুলিতেও নাট্যরেখার স্তরগুলি বিদ্যমান থাকে।

এই পঞ্চস্তর-সমন্বিত নাটকীয় রেখার প্রথম স্তরেই একটি সংঘাতকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনীর সূত্রপাত হলেও, তাবও একটি ভূমিকা থাকে। কারণ কোন সংঘাত সৃষ্টি হতে গেলে চরিত্র ও ঘটনার পারস্পরিক যোগাযোগের এমন একটি পটভূমিকা থাকে, যার ফলে সংঘাতটি অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। সংঘাতের এই পটভূমিকাকে একটি স্বতন্ত্র অভিধায় নামাঙ্কিত করা হয়—'সূচনা' (Introduction বা Exposition)। বস্তুতঃ নাটকীয় রেখার এই 'সূচনা'-অংশেই নিহিত থাকে 'প্রারম্ভে'র (Initial Incident) এবং নাটকীয় সংঘাতের বীজ। সুতরাং সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে নাটকীয় রেখার মোট স্তর ছয়টি।

(ক) **সূচনা (Exposition)**—সমগ্র কাহিনীর ধারাকে ভালোভাবে বোঝার জন্য দর্শককে কাহিনীর সমগ্র পশ্চাদ্‌পট ও তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখার উদ্দেশ্যে সূচনা বা Expositionএর সার্থকতা। বস্তুতঃ নাটকের উপোদ্‌ঘাত দৃশ্যে কাহিনী বা চরিত্র সম্পর্কে থাকে একটা প্রাথমিক অথচ প্রয়োজনীয় পরিচিতি—যা কাহিনী, চরিত্র বা ঘটনা সম্পর্কে দর্শককে কৌতূহলী করে তোলে। নাটকে বর্ণিত কাহিনী বা চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের এই পরিচয় স্থাপনের ক্রিয়াটি নাট্যকারের পক্ষে বেশ দুরূহ ব্যাপার। এ ব্যাপারে নাট্যকার নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। তার মধ্যে সবচেয়ে অনাটকীয় পদ্ধতি হচ্ছে কোন অপ্রধান চরিত্রের বিবৃতির মাধ্যমে নাটকের মূল ঘটনা বা চরিত্রগুলির পরিচয় দান। এই দীর্ঘ বিবৃতি দানের পদ্ধতি দর্শকের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিজনক। দর্শকের এই বিরক্তি কিছুটা প্রশমিত হতে পারে, যদি নাট্যকার দ্বিতীয় আর একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন—দীর্ঘ বিবৃতির মধ্যে কিছুটা সংলাপ অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিলে। অবশ্য দর্শকের পক্ষ থেকে সেখানেও কিছুটা বিরক্তির উপাদান থেকে যায়—কারণ সচেতন দর্শক মাত্রেই বুঝতে পারে যে দৃশ্যপরিকল্পনাটা নিতান্তই পরিচিতি-প্রয়োজনে, নাট্য-কাহিনীর অনিবার্য তাগিদে নয়। সব চেয়ে ভাল পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমেই মূল চরিত্রগুলির উপস্থিতি এবং তাদের সংলাপের মাধ্যমে দর্শকের সঙ্গে পরিস্থিতির পরিচয় স্থাপন। যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই যদি দর্শক প্রধান চরিত্রগুলিকে সংলাপ ও ক্রিয়ারত অবস্থায় দেখতে পায়, তবে একদিকে যেমন মূল ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় স্থাপিত হয়, তেমনি অজ্ঞাতসারে তাদের ভাবী পরিণাম সম্পর্কে দর্শক সহজেই কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারে। বস্তুতঃ একটি নিখুঁত সূচনা-দৃশ্য উপস্থাপিত করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার—এ ব্যাপারে নাট্যকারের অম্বিষ্ট হবে—সূচনাদৃশ্যকে যতদূর সম্ভব সরল, সংক্ষিপ্ত এবং নাটকীয় করে তোলা। নাটকের প্রারম্ভ দৃশ্যের (Initial Incident) সঙ্গে এর যোগ অনিবার্য হওয়া উচিত—এবং সূচনাদৃশ্যটি এমন অপ্রত্যক্ষ হবে যাতে তার বাহ্য যান্ত্রিকতাটুকু (অর্থাৎ দর্শকের সঙ্গে নাটকের চরিত্র ও ঘটনার পরিচয় স্থাপন-প্রসঙ্গ) দর্শকের কাছে অনুদ্‌ঘাটিত থাকে।

(খ) **প্রারম্ভ (Initial Incident)**—সূচনাদৃশ্যটি একটি স্বতন্ত্র বিভাগ, অথচ তা মূল কাহিনীর প্রস্তুতিপর্ব। বস্তুতঃ মূলকাহিনীর সঙ্গে সূচনাদৃশ্যটির

ভেদরেখাটি অনেকখানি কাল্পনিক, যেহেতু সূচনাদৃশ্যটুকুর পরিসমাপ্তির আগেই মূলকাহিনীটি সুরু হয়ে যায়। নাটকের প্রথম দৃশ্যে না হলেও, প্রথম অঙ্কের মধ্যে আমরা কাহিনীর সংঘাতের বীজ উপ্ত হতে দেখি (ফ্রেতাগের ভাষায় 'the exiciting force')। অবশ্য এই সংঘাতকে সূত্রপাতলগ্নেই প্রকট হয়ে উঠতে হবে, বা সংঘাতকে সূত্রপাতলগ্নে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে তার ফলে দর্শক সহজেই বুঝতে পারে যে এইবার সত্যকারের কাহিনী সুরু হলো—তার কোন মানে নেই। অবশ্য শেক্‌সপীঅরের অধিকাংশ নাটকেই এই সংঘাতের প্রারম্ভ লগ্নটি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে। কাহিনীর সূত্রপাতের এই প্রারম্ভিক সংঘাত ঘটনাগত বা চরিত্রের মনস্তত্ত্বগত—বা দুটোই হতে পারে। আবার যেখানে মূল-কাহিনীর সঙ্গে উপ-কাহিনী যুক্ত থাকে, সেখানে প্রতিটি কাহিনীর স্বতন্ত্র প্রারম্ভ থাকে, সেগুলি আবার নাটকের প্রকৃতি অনুযায়ী কখনও ঘনিষ্ঠ বা কখনও বিযুক্ত থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, মূল-কাহিনীর কোন কোন কৌতূহল নিবৃত্ত হবার পরে তৎসংক্রান্ত কোন প্রাসঙ্গিক ঘটনা নাটকের কোন পরবর্তী অঙ্কে উপস্থাপিত হয়—এ ধরণের দেরীতে ঘটনা-উপস্থাপন পদ্ধতিটি (later introduction of new motives) বাঞ্ছনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা জানি যে মালিনী ব্রাহ্মণগণসহ রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে। সেখানে তৃতীয় দৃশ্যে রাজা ও মহিষীর মালিনীর জন্য ব্যাকুলতা অ-নাটকীয়, কারণ মালিনী-সংক্রান্ত কৌতূহল ইতিপূর্বেই দর্শকদের চরিতার্থ হয়ে গেছে।

(গ) **প্রবাহ** (Rising Action)—নাটকীয় রেখার এই প্রারম্ভিক স্তরটি অতিক্রম করে আমরা প্রবাহ-স্তরে উপনীত হই—এবং সেখানে নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়ি। এই স্তরটিতে নাট্যকারের স্পষ্টতা এবং অনিবার্যতা-বোধের সুকঠিন পরীক্ষা হয়। এই স্তরে চরিত্র এবং পরিস্থিতির ঘটনাপ্রবাহের টানাপোড়েনে অনিবার্য অগ্রগতি বাঞ্ছনীয়, পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী ঘটনার অনিবার্য যোগসূত্র নাটকটিকে জৈবিক গঠনের অনুকূল করে তোলে। সমগ্র কাহিনীর ক্রমবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে যাতে প্রধান কাহিনীকে অতিক্রম করে অপ্রধান ঘটনা—তা সে যতই আকর্ষনীয় হোক না কেন, প্রাধান্যলাভ না করে সেদিকে নাট্যকারের সচেতন থাকা উচিত। দ্বিতীয়তঃ নাটকের উদ্দেশ্য যাতে সুস্পষ্টভাবে এই

প্রবাহস্তরে দর্শকের সম্মুখে প্রতিফলিত হয়, সেদিকে নাট্যকারের অতন্দ্র দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে ঘটনা ও চরিত্রের, দৃশ্য ও স্থানের পারস্পরিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ নাটকীয় উপযোগিতার দিক দিয়ে বিচার করলে এই প্রবাহ-স্তরে নাট্যকারের উপাদান-প্রয়োগ-পদ্ধতি অনেক সময় সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণ দর্শক হয়তো প্রবল উৎকণ্ঠা-বশতঃ সংঘাতে জটিলতাবৃদ্ধির প্রসঙ্গে নাট্যকারের অজস্র উপাদান-প্রয়োগকে সহজভাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু প্রতিটি উপাদান যদি স্বাভাবিক ও স্বতোৎসারিত না হয়, তবে তা যতই কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি করুক, সচেতন দর্শক তাতে তৃপ্ত হবে না।

কাহিনীর জটিলতা-বৃদ্ধির প্রসঙ্গে উপরে আলোচিত মূল সূত্রগুলি অবশ্য সমগ্র কাহিনীর পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু প্রবাহ-স্তরের জটিলতা বৃদ্ধির পক্ষে একটি অবশ্য পালনীয় সূত্র এই যে, নাট্যকার জটিলতা-বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে যে সমস্ত উপাদান উপস্থাপিত করবেন, সেগুলি যেন উৎকর্ষ বা সংঘাতের চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়ে সৎ বা অসৎ যে কোন একটি দিকে বিশেষ তীব্রতা পায়—যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে কাহিনীর গ্রন্থিমোচন ঘটে। যদি নাটকীয় সংঘাত দুটি ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়, তবে কাহিনীর শেষ অর্ধে যে প্রাধান্য বিস্তার করবে, প্রথম অর্ধে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাস; যদি সংঘাত কোন চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে কাহিনীর শেষ অর্ধে চরিত্রটির মনোজগতের যে প্রবণতাটি প্রাধান্য পাবে, প্রথম অর্ধে প্রবাহস্তরে তার পূর্বাভাস থাকা বাঞ্ছনীয়। কাহিনী-পরিণতির জন্য দর্শক-মনে প্রবাহ-স্তরে কোন প্রস্তুতির আভাস সৃষ্টি না করে পরবর্তী দৃশ্যে হঠাৎ কোন নতুন চরিত্র বা পরিস্থিতির যোজনার মাধ্যমে পরিণতিকে ত্বরান্বিত করা দুর্বল নাট্যকলারই পরিচায়ক।

(ঘ) **উৎকর্ষ** (Crisis)—যেহেতু পরস্পর বিরোধী দুটি সংঘাত অনন্তকাল ধরে চলতে পারেনা, তাই নাটকের কাহিনী এমন একটা স্তরে উপনীত হয় যেখানে কোন একটি শক্তি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে এবং ফলে কাহিনীর পরিণতিতে সেই শক্তিটিরই জয় ঘোষিত হয়। নাটকীয় কাহিনীর ধারায় এই আবর্তন-সন্ধির স্তরটিকেই উৎকর্ষ বা Crisis বা Turing Point বলে। (অবশ্য যেখানে নাটকীয় কাহিনী কতকগুলি সংঘাত-সংকটের ধারায় ক্রমান্বয়ে

প্রাগ্রসর, সেখানে প্রধান সংঘাত-সংকটটিই আবর্তন-সন্ধি বা Turing Pointএর নির্দেশক)। উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত-সংকটের প্রধান সূত্রই হচ্ছে—তা পূর্ববর্তী স্তরগুলির স্বাভাবিক এবং অনিবার্য ফলশ্রুতি, চরিত্র এবং ঘটনা-সংস্থিতির তাৎকালীক পরিণতি। উৎকর্ষ, ঘটনা প্রবাহের এমন একটি অনিবার্য পরিস্থিতি যা ঘটনাপ্রবাহকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি দান করে। স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে এই উৎকর্ষ স্তরটির প্রয়োগ-পদ্ধতি বিভিন্ন-ভাবে হতে পারে। প্রথমতঃ কোন একটি মাত্র ঘটনায় বা ঘটনার ধারার এই উৎকর্ষের স্তরটিকে কেন্দ্রীভূত করে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ ঘটনাধারার ক্রমবিকাশের মধ্যে উৎকর্ষকে উপস্থাপিত করা হয়। যেভাবেই হোক না কেন—ঘটনার ধারায় চূড়ান্ত-সংকটকে এমন সুস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপিত করা বাঞ্ছনীয়, যাতে দর্শকের পক্ষে এর গুরুত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। অতি আধুনিক নাট্যকলায় উৎকর্ষ স্তরটিকে যতদূর সম্ভব বিলম্বে উপস্থাপিত করার প্রবণতা দেখা যায়, কিন্তু প্রাচীন নাট্যকলায় সাধারণতঃ এই স্তরটিকে নাটকের কাহিনীধারার মধ্যস্থলে বা ঈষৎ পরবর্তী স্থানে উপস্থাপিত করা হতো।

(ঙ) **গ্রন্থিমোচন** (Resolution)—উৎকর্ষের পরই নাটকীয় কাহিনী একটি উপসংহারের দিকে পরিণামমুখী হয়। কাহিনীর পরিণতি আনন্দদায়ক হবে না বেদনাদায়ক হবে তার উপরেই এই গ্রন্থিমোচন স্তরটির প্রকৃত স্বরূপ নির্ভর করে। কমেডিতে এই স্তরে সাধারণতঃ নায়ক ও নায়িকার সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তিগুলি অপসৃত হতে থাকে এবং ট্রাজিডিতে সেই বাধাবিপত্তি-গুলির আপাত-অপসৃয়মানতার অন্তরালে থাকে তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া, যা নায়ক-নায়িকাকে বাহ্যতঃ না হলেও মানসিক দিক দিয়ে চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। উৎকর্ষের অনিবার্য পরিণতি এই গ্রন্থিমোচন স্তরে উপনীত হলে আমরা ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারি এবং নাটকের পুর্বার্ধে আমাদের কৌতূহল যে প্রকৃতির ছিল, এখন থেকে তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। এ পর্যন্ত আমরা নাটকের কাহিনী-ধারাকে গভীর অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে আসি এবং গ্রন্থিমোচনের স্তর থেকে আমাদের মনে নাট্যকাহিনীর অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার পরিবর্তে চরিত্রগুলি সম্পর্কে জাগে সহানুভূতি। বস্তুতঃ ঠিক এই কারণেই

গ্রন্থিমোচন-স্তরটিকে নিখুঁতভাবে রূপ দেওয়া নাট্যকারের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। একদিকে দর্শকের মনে নাট্যকাহিনী সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটেছে, অন্যদিকে পরিণতি সম্পর্কে জাগছে একটা সুস্পষ্ট ধারণা—সেক্ষেত্রে দর্শকের মনে কৌতূহল উজ্জীবিত রাখা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। এইজন্য আধুনিক কালের অধিকাংশ নাট্যকার প্রবাহ স্তরটির যতদূর সম্ভব বিলম্বিত এবং গ্রন্থিমোচন স্তরটিকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করার পক্ষপাতী। নাটকের এই দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ গ্রন্থিমোচন স্তরে দর্শকের কৌতূহল উজ্জীবিত রাখার নানা প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়ে থাকে। কোথাও প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সুষ্ঠু বিন্যাসভঙ্গির সাহায্যে দর্শকের কৌতূহলকে উজ্জীবিত রাখা হয়। আবার কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনার সূত্রপাতে সাময়িকভাবে দর্শকের মনে অনিশ্চয়তা বা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করা হয়। এই অবস্থায় কমেডিতে সাধারণতঃ শুভ-পরিণামের পক্ষে বাধাসৃষ্টিকারী নতুন কোন ঘটনার উপস্থাপনা এবং ট্রাজিডিতে নায়ক বা নায়িকার আশু অনিবার্য বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্তি-সম্ভাবনার কোন সাময়িক ইঙ্গিতময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

(চ) **উপসংহার** (Couclusion)—গ্রন্থিমোচনের পরেই আসে নাটকের কাহিনীবৃত্তের শেষ স্তর—উপসংহার। যেখানে সমস্ত নাটকীয় সংঘাত একটা চরম পরিপূর্ণতার আভাস সৃষ্টি করে। অবশ্য অনেক আধুনিক নাটকের উপসংহারে এই জাতীয় পরিপূর্ণতার আভাস থাকেনা, কারণ বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণে নাটকে যেহেতু জীবনের প্রতিফলন ঘটে এবং জীবনে কোথাও যেমন 'ইতি' নেই, নাটকেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোথাও ইতি' থাকা স্তব নয়। প্রতিটি ঘটনার মধ্যে থেকে নতুন ঘটনা প্রবাহের সম্ভাবনা। এক দিক দিয়ে এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যথার্থতা আছে সন্দেহ নেই। তবুও, এই মতবাদের বিপক্ষে যে যুক্তি দেখানো হয়, সেটিও অগ্রাহ্য করা যায় না। জীবনের অভিজ্ঞতা অনন্ত, তবুও তার মধ্য থেকে নাট্যকার আদি-মধ্য-অন্ত-সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী-বৃত্ত তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন। বস্তুত জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের পার্থক্য এইখানেই। দেশ-কাল-পাত্রের ধারায় বাস্তব জীবনযাত্রা অনন্ত, কিন্তু সাহিত্যে খণ্ড দেশ-কাল-পাত্রের পটভূমিকায় পরিপূর্ণতার স্বাদ সঞ্চার করা সম্ভব। 'সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ তাহার ক্ষণিক নিত্যতা, সুদূর নৈকট্য এবং সার্বভৌমিক ব্যক্তিত্ব।'

বস্তুতঃ 'সমাপ্তি'-জ্ঞাপক এই প্রসঙ্গ নিতান্তই তত্ত্বগত, কার্যতঃ আমরা নাটকের উপসংহারে প্রত্যাশা করি এমন একটা সুপরিণাম, যেখানে কাহিনীর বিচিত্র ধারা এসে সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়।

সাধারণতঃ উপসংহারের প্রকৃতি অনুযায়ী নাটকের প্রধান দুটি শ্রেণীর ভাগ পরিকল্পিত হয়ে থাকে—শুভপরিণামদ্যোতক নাটক কমেডি এবং অশুভ-পরিণামদ্যোতক নাটক ট্রাজিডি। প্রাচীন ট্রাজি-কমেডি বা আধুনিক মেলোড্রামা শ্রেণীর নাটকের কাহিনী উপসংহার প্রধানতঃ অশুভ হয়, যদিও সে সমস্ত ক্ষেত্রে সৎ-চরিত্রগুলির ভাগ্য খানিকটা শুভপরিণামদ্যোতক করে সৃষ্টি করা হয়। অধিকন্তু উপসংহারের শুভ বা অশুভ পরিণতির পরিমাণগত গুণের উপরেও নাটকের প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে। ট্রাজিডির বিপর্যয়ের মধ্যে এমন ইঙ্গিতও থাকতে পারে যেখানে সৎ-শক্তির প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয় না বা কমেডির শুভপরিণামের মধ্যেও কিঞ্চিৎ বেদনার আভাস থাকতে পারে। রসানুভূতির দিক দিয়ে এ জাতীয় উপসংহার খানিকটা মিশ্র প্রকৃতির। এ ছাড়া কমেডির শুভপরিণামদ্যোতক উপসংহারে অসৎ-এর পরিণাম দুইভাবে দেখানো যেতে পারে—অসৎ তার অনিবার্য বিনষ্টির মধ্যে আত্মলোপ করতে পারে বা ক্ষমা ও সমন্বয়ের মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সৎ-এর পক্ষ অবলম্বন করতে পারে।

উপসংহারের প্রকৃতি যাই হোক না কেন—তাকে সমগ্র কাহিনীধারার পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্য হতে হবে—যাতে দর্শক সহজেই তাকে স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি বলে বুঝতে পাবে। নাটকের এই অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে আরিস্টটলের অভিমত—'It is therefore evident that the unravelling of the plot, no less than its complication, must arise out of the plot itself ; it must not be brought about by the *deus ex machina.* Within the action there must be nothing irrational.' (Poetics).

নাটকের গঠনকৌশলের উল্লিখিত সূত্রগুলি একটি আদর্শ মানদণ্ড মাত্র, প্রতিটি নাটকের ক্ষেত্রে সর্তগুলির যথাযথ অনুসরণ সম্ভব নয়। লঘু প্রকৃতির চরিত্র নিয়ে রচিত নাটকের কাহিনী গঠনের প্রশ্নে অর্থাৎ কমেডি রচয়িতাকে অনেকক্ষেত্রে তাই অনিবার্য নাট্যপরিণতি অপেক্ষা অন্য কোন সুলভ কৌশলে

উপসংহারে উপনীত হবার প্রবণতা দেখা যায়। এ দিক দিয়ে ট্রাজিডি রচয়িতা অপেক্ষা কমেডি-রচয়িতার সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী।

ফ্রেতাগ-পরিকল্পিত নাটকের গঠনকৌশল প্রসঙ্গে নাটকীয় রেখার স্তরগুলি অনেক নাট্যতত্ত্ববিদ্ মানেন না। ফ্রেতাগের পিরামিড কল্পনায় Climax-এর স্থান মাঝখানে। এগ্রি (Lajos Agri—The Art of Dramatic Writing) Climax-এর পরে Resolution-কে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু লসন (Lawson) Climax-কে নাটকীয় রেখার শেষ পর্যায় বলে মনে করেন। তাঁর মতে প্রত্যেক কার্যের চারটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়—Decision (সঙ্কল্প), Grappling with difficulties (বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম), Test of Strength (শক্তি প্রয়োগ ও পরীক্ষা), Climax (চূড়ান্ত চেষ্টা ও তার পরিণতি)। Climax কে চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে গ্রহণ করার যুক্তি লসনের মতে—'To divide the climax and the denoument is to give the play dual roots and destroy the unity of the design.'—(হাডসনের আলোচনা অবলম্বনে)। —শ্যা. স.

নাটকের গঠন (সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র)—সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ নাটক-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—'নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চ-সন্ধি-সমন্বিতম্।' কোনও প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তের মূল-উপাদানে নাটক গড়ে উঠবে—আর তাতে মুখ, প্রতিমুখ প্রভৃতি সন্ধি-পঞ্চক নাটকের অবয়ব-সমূহের পারম্পরিক সুদৃঢ়-সংযোগ ও ঘনীভূত সমতা রক্ষা করবে। অর্থাৎ পঞ্চসন্ধির যথাযথ সন্নিবেশে নাটকীয় কাহিনীর মূলসূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকবে, নাটকের লক্ষ্য হবে একমুখী, আর ইতিবৃত্তের স্রোতোধারা বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও নাটকীয়-পরিণতির দিকেই বইতে থাকবে। বিশ্বনাথ তাই সন্ধির লক্ষণে বলেছেন—'অন্তরৈকার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিরেকান্বয়ে সতি।' 'একান্বয়' কথার অর্থ নাটকের মুখ্য প্রয়োজন বা মূল পরিণতি।

এদিকে পঞ্চসন্ধির আলোচনা প্রসঙ্গে বীজ, আরম্ভ প্রভৃতি কয়েকটি অপরিচিত আলঙ্কারিক-শব্দ-বিশেষের সম্মুখীন হতে হয়। তাই এগুলির আলোচনাও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মনে রাখতে হবে বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য এই পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি আর আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও

ফলাগম এই নাটকীয় পঞ্চ অবস্থা—এদের সঙ্গে সন্ধিপঞ্চকের এক অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা আছে। উক্ত-পঞ্চকদ্বয়ের মধ্যে যথাক্রমিক-সন্ধি ঘটানই হল সন্ধিপঞ্চকের কাজ। আরম্ভ প্রভৃতি নাটকীয় পঞ্চ-অবস্থা পঞ্চসন্ধির পথ ধরে ক্রমবিকাশের ধারায় এগিয়ে গেছে। পঞ্চসন্ধিব কথা বলতে গিয়ে বিশ্বনাথ তাই প্রথমেই বলেছেন—

যথাসংখ্যম্ অবস্থাভিঃ তাভিঃ যোগাত্তু পঞ্চভিঃ।
পঞ্চধৈবেতিবৃত্তস্য ভাগাঃ স্যুঃ পঞ্চসন্ধায়ঃ॥

এব অর্থ, পঞ্চাবস্থাব সঙ্গে যথাসংখ্য-যোগ থাকায নাটকীয় ইতিবৃত্তটিও সন্ধি-পঞ্চকে বিভক্ত।

সন্ধিপঞ্চকেব প্রথমটি হল **মুখসন্ধি**, লক্ষণে বলা হযেছে—

যত্র বীজ-সমুৎপত্তিঃ নানার্থরসসম্ভবা।
প্রাবম্ভেণ সমাযুক্তা তন্মুখং পবিকীর্ত্তিতম্॥

মুখসন্ধিতেই নাটকের বীজ উপ্ত হযেছে, আব এখানেই **আরম্ভ** নামক নাটকীয় প্রথমাবস্থার জন্ম সূচিত হয়েছে। উক্তবীজই প্রথম অর্থপ্রকৃতি। অর্থপ্রকৃতি কথাব অর্থ নাটকীয মূল-প্রযোজনেব সিদ্ধিব হেতু, অর্থাৎ আখ্যান বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাবশ্যকীয উপাদান বিশেষ। সমগ্র নাটকটিকে একটি মহীরুহরূপে এবং নাটকীয় মূল-প্রযোজনকে একটি ফলরূপে কল্পনা কবা হলে '**বীজ**' নামক প্রথম অর্থপ্রকৃতি সেই ফলেব হবে প্রথম হেতু,—'ফলস্য প্রথমো হেতুঃ বীজং তদভিধীয়তে।' এই বীজকে কেন্দ্র কবে নাটকেব আবম্ভ নামক প্রথম-স্তর গড়ে উঠবে। ফলসিদ্ধির নিমিত্ত প্রথম কার্যাবম্ভই 'আরম্ভ' নামক প্রথম অবস্থা—নাটকীয় পরিণতির অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ, আব তাতে নাযক বা নায়িকার দিক থেকে প্রাথমিক আয়োজনের কোনও ত্রুটি থাকবে না। —'ভবেদারম্ভঃ ঔৎসুক্যং যন্মুখ্য-ফলসিদ্ধযে।' উপ্তবীজ ও উক্ত-আরম্ভাবস্থার সমন্বয় ঘটাবে মুখসন্ধি।

মুখসন্ধির পর আসছে **প্রতিমুখসন্ধি**। 'ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ। লক্ষ্যালক্ষ্যো ইবোদ্‌ভেদো যত্র প্রতিমুখঞ্চ তৎ'। ফলের প্রধান উপায়স্বরূপ বীজ যে অংশে ঈষৎ অঙ্কুরিত অথবা বিষয়ান্তরের সূচনায় বিনষ্টপ্রায় প্রতীয়মান হয় তাকেই প্রতিমুখ-সন্ধি বলে। '**বিন্দু**' নামক দ্বিতীয় অর্থপ্রকৃতির সঙ্গে '**প্রযত্ন**' নামক অবস্থার মিলন ঘটবে প্রতিমুখ-সন্ধিতে

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সূচনা হেতু মূল-প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্নপ্রায় হলে বিন্দু তার সূত্র-সংযোগ করিয়ে দেয়—'অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্।' ওদিকে আশু ফলপ্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা চলতে থাকায় **'প্রযত্ন'** নামক অবস্থাও সুরু হয়। বিন্দু ও প্রযত্নের মিলনসেতু রচনা করবে প্রতিমুখসন্ধি।

এরপর **গর্ভসন্ধি**। 'ফল-প্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্‌ভিন্নস্য কিঞ্চন। গর্ভোযত্র সমুদ্‌ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মুহুঃ॥'
প্রতিমুখসন্ধিতে উদ্‌ভিন্ন-অঙ্কুর ঈষদ্‌বিকশিত হলেও প্রতিকূল-অবস্থার দ্বারা বাধিত ও অলক্ষিত হলে পুনঃ পুনঃ অন্বেষণের বিষয় হয় অর্থাৎ পুনরায় অনুকূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দুষ্কর প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়—প্রতিকূল ও অনুকূল অবস্থার সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আখ্যানবস্তু অনুকূল অবস্থার দিকে ধীর পদক্ষেপে চলতে থাকে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও বলা হয়েছে—

উদ্‌ভেদস্তস্য বীজস্য প্রাপ্তিরপ্রাপ্তিরেব চ।
পুনশ্চান্বেষণং যত্র স গর্ভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥'

দশরূপকেও অনুরূপ-প্রতিধ্বনি রয়েছে—'গর্ভস্তু দৃষ্টনষ্টস্য বীজস্যান্বেষণং পুনঃ।' পূর্বে দৃষ্ট পশ্চাৎ নষ্ট (হ্রাসপ্রাপ্ত) বীজের অন্বেষণই গর্ভ। গর্ভ-সন্ধিতেই **প্রাপ্ত্যাশা** নামক অবস্থাটি অনুসন্ধেয়। মুখ্যফল সাধনের উপায় এবং অপায়ের (নিবর্তক) দ্বন্দ্বে সাফল্যের আশা যেখানে সূচিত হয় তাকেই বলে প্রাপ্ত্যাশা—'উপায়াপায়শঙ্কাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তি-সম্ভবঃ।' **'পতাকা'** নামক প্রাসঙ্গিক বৃত্ত্যন্তরের অবস্থিতি ঘটে গর্ভসন্ধিতে এবং পরবর্তি সন্ধিদ্বয়ে এর সন্ধান মিলবে। সাহিত্যদর্পণে তাই সুস্পষ্টই বলা হয়েছে—'গর্ভে সন্ধৌ বিমর্ষে বা নির্বহস্তস্য জায়তে।'

অঙ্কুরিত বীজ গর্ভসন্ধ্যপেক্ষাও অধিকতর বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছে **বিমর্ষ-সন্ধিতে**। বিমর্ষসন্ধিতে **নিয়তাপ্তি** নামক চতুর্থ অবস্থার অবস্থিতি অপরিহার্য। অপায়ের অভাবে প্রাপ্তি যেখানে সুনিশ্চিত তাকেই 'নিয়তাপ্তি' বলে। 'অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তিঃ নিয়তাপ্তিস্তু নিশ্চিতা।' একে বীজোদ্‌গম ও ফলোৎপত্তির সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে, এবং ফলতঃ ফলোৎপত্তির প্রথমাবস্থাও বলা যায়, **'প্রকরী'** নামে প্রাসঙ্গিক ও অল্পপরিসর বৃত্তাংশের পরিবেষণও এখানে দেখা যেতে পারে।

তারপর ধীরে ধীরে ক্রমবিকশিত সেই বীজ পরিপূর্ণ ফলরূপে পরিণতি

লাভ করে,—অর্থাৎ নাটকের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। একেই বলা হয় নাটকের 'ফলাগম' অবস্থা, বলা হয় **নির্বহণসন্ধি**। দর্পণকার বলেছেন—

"বীজবন্তো মুখাদ্যর্থাঃ বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্
একার্থম্ উপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ।"

অর্থাৎ যে অংশে মুখসন্ধি প্রভৃতিতে ক্রম-বিকশিত বীজ শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে পরিণাম-ফল প্রসব করে তাকেই বলে উপসংহৃতি বা নির্বহণ-সন্ধি। অধ্যাপব কালে স্বসম্পাদিত শকুন্তলা নাটকের ভূমিকায় বলেছেন—'·· the harmonious combinations of all parts in the final catastrophe।' অনুরূপভাবে এতে দেখা যাবে **'কার্য'** নামক নাটকের শেষ-অর্থপ্রকৃতি। বিশ্বনাথের মতে যা আকাঙ্ক্ষিত, সাধ্য, যার জন্য উদ্যোগ, এবং যার সিদ্ধিতে সকল বিষয়ের সমাপ্তি, তাই কার্য।—

'আপেক্ষিতন্তু যৎসাধ্যম্ আরম্ভো যন্নিবন্ধনঃ।
সমাপনন্তু যৎসিদ্ধ্যৈ তৎ কার্য্যমিতি সম্মতম্'॥

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের লক্ষণা বিচারে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকটি নাটকই নয়, যেহেতু কোনও খ্যাতবৃত্তকে অবলম্বন করে এই নাটকটি গড়ে ওঠে নি। কিন্তু তা-সত্ত্বেও এতে নাটকের দ্বিতীয় লক্ষণ সন্ধি-পঞ্চক এবং তৎপ্রাসঙ্গিক কিছু কিছু আলোচনার অবতারণাও একেবারে অসম্ভব নয়।

জালন্ধররাজ বিক্রমদেবের উদ্দাম প্রেম জালন্ধর মহিষী সুমিত্রার আদর্শ-কঠিন উপেক্ষার কাছে বার বার প্রতিহত হয়েছে—পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত-বিশ্বঘাতী হিংস্রতায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুমিত্রার সেই উত্তুঙ্গ-অচল আদর্শানুগ কর্তব্যনিষ্ঠার কাছেই আত্মসমর্পণ করে মরু-নীরস প্রেমিকচিত্তের অন্তিম-সান্ত্বনা খুঁজে মরেছে, আখ্যানবস্তুর পরিণতিমুখী মূলস্রোতরেখার ঐ ধারাকে লক্ষ্য করেই আমাদের এগোতে হবে। মাঝে মাঝে অনেক উপকাহিনীর উপশাখা ঐ ধারার গতিকে প্রতিহত করেছে, কোথাও বা খরতর, দ্রুত লক্ষ্যগামী। এই স্রোতের টানে এসে পড়েছে ইলা ও কুমার—ভেসে গেছে অজানা কোন অপূর্ণ পরিণতির দিকে।

নাটকের আখ্যানবস্তু, তার গতি ও লক্ষ্যকে পদ্মানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করলে 'নাটকীয় বীজ' অনায়াসেই সুলক্ষিত হয়। নারীকে প্রেমের শৃঙ্খলে

বশীভূত করা যায় কিনা এই বিষয়েই প্রথমাঙ্কে প্রথম দৃশ্যে রাজপুরোহিত দেবদত্তের সঙ্গে রাজা বিক্রমদেবের কথোপকথনের মধ্যেই বীজটি উপ্ত আছে। রাজা বিক্রমদেব সুস্পষ্ট বলছেন 'বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী।' দেবদত্তের প্রত্যুত্তরেও রয়েছে তার সঘোষ-প্রতিধ্বনি—'বন্যা আনে সেই নদী, সেই বায়ু ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে।' এখানেই তো নাটকের বীজ। সুমিত্রাও রাজার জীবনে এনেছে এমনি করেই বিশ্বপ্লাবী মত্ততা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার এক ভয়াল-হিংস্রতা। আর সেই মত্তপ্লাবনের অবসানে রাজার জীবনে দেখা দিয়েছে আত্মগ্লানির পঙ্কিলতা। এখন বীজের পর দেখতে হবে 'আরম্ভ' নামক প্রথম নাটকাবস্থা কোথায়। প্রথমাঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যেই তার সূত্রপাত। নায়ক বিক্রমদেব অন্তঃপুরের প্রমোদ কাননে সন্ধ্যার মধুর অন্ধকারে বধূ সুমিত্রার কাছে প্রেমভিক্ষা করে বার বার প্রতিহত ও বঞ্চিত হচ্ছেন আর কর্তব্যে অচল অটল সুমিত্রা রাজ্যের বিপৎকালে মহারাজকে বার বার নিজকর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—'মহারাজা, এখন সময় নয়, আসিয়ো না কাছে, এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজ কাজে।' ক্ষোভ-পুঞ্জিত বঞ্চিত রাজচিত্তের অনুরূপ মর্মন্তুদ্ প্রতিধ্বনি 'হায় নারী কি কঠিন হৃদয় তোমার।' আরম্ভাবস্থায় লক্ষ্য করতে হবে নাটকপরিণতির জন্য নায়ক-নায়িকার প্রাথমিক উদ্যোগ আয়োজন, যেমন এখানে একদিকে রয়েছে নায়কের আকর্ষণ, অপরদিকে নায়িকার বিকর্ষণ। আর তারই পরিণত ফলশ্রুতি উভয়ের চিরবিচ্ছেদ। বীজ ও আরম্ভাবস্থার মিলনে সমগ্র প্রথমাঙ্কের ষষ্ঠদৃশ্য পর্যন্ত মুখসন্ধি আখ্যা নিতে পারে।

রাজ্যের ক্রম বর্ধমান বিদ্রোহ দমন করে দুর্ভিক্ষের হাহাকার দূর করে কিভাবে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় এই চিন্তায় জালন্ধর মহিষী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন কাল ভৈরবের পূজোপলক্ষ্যে বিদ্রোহীদের ডেকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে। ত্রিবেদী নামে এক ব্রাহ্মণকে দূতরূপে পাঠান হল। নাটকের বীজটি এখানে ঈষৎ অঙ্কুরিত হয়েও দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বিস্ময়ান্তর-সূচনায় বিনষ্টপ্রায় প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিতীয় দৃশ্যে সুমিত্রার দর্শনলাভে রাজার তৃষ্ণাকুলহৃদয় রাণীর স্বভাবজাত উপেক্ষায় নিদারুণ মর্মাঘাতে বিস্ফারিত হয়েছে। এখানেই নাটকের বিন্দু নামক অর্থপ্রকৃতি ও প্রযত্ন নামক অবস্থার সন্ধান পাওয়া যাবে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সূচনা-সত্ত্বেও বার বার চেষ্টা হচ্ছে

মূলপ্রসঙ্গকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। আর এ'দুয়ের সন্ধিস্থানরূপে গড়ে উঠেছে প্রতিমুখসন্ধি।

দ্বিতীয়াঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে সত্যই নাটকীয় অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ বেধেছে। রাণী সুমিত্রা রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করেছেন এই সংবাদে রাজা বিক্রমদেব শোকে মর্মাহত, কিন্তু এইবার তিনি ধীরে ধীরে প্রলয়-মত্ততার রূপ নিলেন, সুপ্ত-লুপ্ত-ক্ষাত্রবীর্যকে বৃশ্চিক-হিংস্রতায় ভয়াল-সজীব করে তুললেন। বিদ্রোহীরা একে একে আত্মসমর্পণ করল—জিগীষার প্রচণ্ড-উন্মাদনায় রাজাও হয়ে উঠলেন আরও ভয়ঙ্কর। ওদিকে স্বয়ং রাণীও যুধাজিৎ ও জয়সেন নামে দুই বিদ্রোহীকে বন্দী করে রাজার কাছে এনেছেন। মুহূর্তের মধ্যে রাজার ক্ষাত্রতেজকে নিষ্প্রভ করে দিতে চায়। এখানেই নাটকীয় আখ্যান বস্তুর চরম প্রতিকূলদশা। কিন্তু বিক্রমদেব নিজবিক্রমে সচকিত হয়ে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'রমণীর সাথে সাক্ষাতের এ নহে সময়।' পঞ্চমাঙ্কের পূর্বপর্যন্ত নাটকীয় কথাসূত্রকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে বার বার অনুকূল-অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করা হয়েছে, তার ফলে এখানেই রয়ে গেছে নাটকের গর্ভসন্ধি। মুখ্যফল-সাধনের উপায় এবং অপায়ের দ্বন্দ্বে সাফল্যের আশা সূচিত হওয়ায় প্রাপ্ত্যাশা নামে তৃতীয়ারম্ভ এখানেই পরিদৃষ্ট হবে। সুমিত্রার অনুরোধে কাশ্মীর যুবরাজ সুমিত্রার অনুজ কুমারসেন কাশ্মীরপথে সৈন্য ফিরিয়ে নিলেন। ওদিকে যুধাজিৎ প্রভৃতির কুমন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হয়ে বিক্রমদেব শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন এই পলাতক অপরাধীর সমুচিত শাস্তি দেবেন—কাশ্মীরাভিমুখে সসৈন্য যাত্রা করলেন। 'তাই চলো, বাড়ে চিন্তা যত চিন্তা করো। কার্যস্রোতে আপনারে ভাসাইয়া দিনু, দেখি কোথা গিয়ে পড়ি, কোথা পাই কূল।' মুখ্যফল সাধনের উপায় এবং অপায়ের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত সাফল্যের আশা সূচিত হওয়ায় 'প্রাপ্ত্যাশা' নামক আরম্ভ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে অপায়-নিরসনে পরিণতি প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়ে উঠল। অঙ্কুরিত-বীজ গর্ভসন্ধ্যপেক্ষায় সমধিক বিকসিত হয়ে হয়ে উঠল। কাশ্মীররাজ চন্দ্রসেন বিক্রমদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, কাশ্মীরযুবরাজ কুমারসেন বিক্রমদেবের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য চন্দ্রসেনের কাছে সৈন্যচেয়ে বঞ্চিত হলেন—কাশ্মীর মহিষী রেবতীর পেলেন ধিক্কার। ওদিকে বিক্রমদেব কাশ্মীরের রাজা

ও রাণীর কুমন্ত্রণায় প্ররোচিত হয়ে ঘোষণা করলেন যুবরাজ কুমারসেনকে যে জীবিত বা মৃত ধরে দেবেন তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। কুমারসেন ত্রিচূড়ের রাজার কাছেও আশ্রয় পেলেন না—প্রেয়সী ইলার শেষবারের দর্শনলাভেও বঞ্চিত হলেন। অমরুরাজের চরিত্রটি এখানে 'প্রকরী' নামক অর্থপ্রকৃতি। বিক্রমদেবের অনুচরেরা সমগ্র কাশ্মীরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে —তবুও কিন্তু কুমারসেনের সন্ধান মিলল না। এখানেই নিয়তাপ্তি আরম্ভ ও বিমর্ষ সন্ধি। বীজটি ধীরে ধীরে ফল হতে ফলাকারে রূপ নিতে চলেছে।

বিক্রমদেব সংবাদ পেলেন কুমারসেন স্বয়ং ধরা দিতে আসছেন। শেষাঙ্কের নবমদৃশ্যে দেখা যাবে বিক্রমদেব, চন্দ্রসেন প্রভৃতি ব্যাকুল-প্রতীক্ষায় বসে আছেন। অবশেষে দুয়ারে কুমারসেনের শিবিকা উপস্থিত হল। জালন্ধর মহিষী সুমিত্রা স্বর্ণপাত্রে নিজভ্রাতা কাশ্মীরযুবরাজ কুমারসেনের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে শিবিকা হতে বেরিয়ে এলেন। হিংস্র-ভীষণ বিক্রমদেবের মাথা নত হয়ে এল সুমিত্রার বজ্রকঠিন সুমহান্ আদর্শের কাছে—শ্রেয়'র কাছে প্রেয়'র হল পরাজয়। বিক্রমদেবের পরাজয়। এখানেই নাটকের শেষ পরিণতি। নাটকের 'কার্য' নামক অর্থপ্রকৃতি, 'ফলাগম' অবস্থা আর নির্বহণসন্ধির ঘটেছে ত্রিবেণীসঙ্গম। নাট্যকারের যা আকাঙ্ক্ষিত, উদ্দেশ্য, যার জন্য এত উদ্যোগ, এত আয়োজন আর যার সিদ্ধিতে সকল বিষয়ের সমাপ্তি, নাটকের সেই শেষ পরিণতি ঘটল এখানেই। —দী ঘো.

নাটকের ষড়ঙ্গ (আরিস্টটল)—স্বগত দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং শিল্পগত অনুকরণতত্ত্বের ভিত্তিতে আরিস্টটল শিল্প ও সাহিত্যের পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, শিল্প ও সাহিত্য-কর্মের পারস্পরিক পার্থক্যের তিনটি কারণ: অনুকরণের মাধ্যম-রীতি-উপকরণ। এই বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ট্রাজিডির ছ'টি অঙ্গের উল্লেখ করেছেন: প্রেক্ষা-ভণিতি-সংগীত-চরিত্র-মনন-বস্তু। প্রেক্ষা ও ভণিতি হল অনুকরণের মাধ্যম, সংগীত অনুকরণের রীতি এবং চরিত্র-মনন-বস্তু তার উপকরণ। প্রথম তিনটি ট্রাজিডির বহিরঙ্গ শেষ তিনটি অন্তরঙ্গ।

(ক) **প্রেক্ষা** (Spectacle) : ট্রাজিডি অভিনেয় তথা চক্ষুগোচর, তাই দৃশ্যমূলক উপাদান তার অন্যতম অঙ্গ। মঞ্চ-পোশাক-আসবাব ইত্যাদি এর

অন্তর্গত। অভিনয় ব্যাপারে এদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু এগুলির প্রয়োজনা নিছক্ যান্ত্রিক, সজ্জাকরদের দ্রষ্টব্য, এবং নাট্যব্যাপারের সঙ্গে যোগও ক্ষীণতম—যেহেতু শুধুমাত্র পাঠযোগেই নাট্যরস উপলব্ধ হতে পারে। তাই এদের শিল্প-মূল্য সবচেয়ে কম।

(খ) **ভণিতি** (Diction): অভিনেয় ট্রাজিডি যেমন দৃশ্যমান, তেমনি শ্রাব্যও। সুতরাং শ্রবণীয় উপাদান তথা শব্দ-বাক্য ইত্যাদির সুপ্রয়োগ প্রয়োজন, যার সাহায্যে নাট্যবস্তু প্রকাশিত হয়, ভাব উদ্রিক্ত হয় দর্শক পাঠক চিত্তে। এই শাব্দিক প্রকাশ গদ্য ও পদ্য দুভাবেই হতে পারে, তবে বাক্যগুলিকে হতে হবে ভাবানুসারী, ও স্বাভাবিক সংলাপ। ভাষা হবে স্বচ্ছ, অলংকৃত, কাব্যিক ও সমৃদ্ধ, তার চিত্রকল্পে থাকবে প্রত্যক্ষগোচরতা। এবং সংলাপে চরিত্রগুলির দেহ-মন যুগপৎ উভয়েরই এমন অভিব্যক্তি থাকবে, যাতে তাদের মনোভাব আঙ্গিক-অভিনয়ের মতো বাচিক-অভিনয়েও প্রকাশ পাবে।

(গ) **সংগীত** (Melody): সংগীত অনুকরণ-রীতির অঙ্গ। আনন্দ-উপভোগের যতগুলি মাধ্যম আছে, গান তাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

গানের আর এক রূপান্তর 'কোরাস'। কোরাসও অন্যতম অভিনয়শিল্পী, নাটকের অন্তরঙ্গ এবং নাট্যীয় ক্রমবিকাশ ও পরিণতির ঘনিষ্ঠ অংশীদার। অভিনয়শিল্পী হিসেবে কোরাস নাটকের জনতা, দর্শকদের প্রতিভূ এবং মঞ্চে অনুপস্থাপিত বিষয়ের অন্যতম ঘোষক।

(ঘ) **চরিত্র** (Character): মানবাত্মা পঞ্চবিধ বৃত্তিসমন্বিত: অন্নময়-ইন্দ্রিয়ময়-প্রাণময়-কল্পনাময়-বুদ্ধিজীবিত। প্রথম তিনটি পশুবৃত্তি, শেষ দুটি দেববৃত্তি; এদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কর্ম বৃত্ত (action) আছে। বৃত্ত জটিল হয় উভয় বৃত্তির দ্বন্দ্বে, অবশেষে জয় হয় শেষেরটির। বৃত্তিগত দ্বন্দ্ব ও জয়ের এই বিশেষ কর্মবৃত্তেরই অনুকরণ হল ট্রাজিডি। এই বৃত্তের প্রতিনিধি আচরণ, এবং আচরণের রূপাভিব্যক্তি চরিত্র। সুতরাং নাটকীয় চরিত্র কতকগুলি নৈতিক আচরণের সমষ্টি বা প্রতিনিধি মাত্র।

মানুষ দু'রকম—সৎ ও অসৎ। ট্রাজিডির চরিত্র হবে সৎ। নায়ক হবেন প্রখ্যাতনামা, সমৃদ্ধশালী, বাস্তবানুগ ও যথাযথ, আমাদের চেয়েও ভালো বা আমাদের মতো। সৎ অর্থ—দেব চরিত্র নয়, পাপী তো নয়ই (দুজনের কেউই ট্রাজিডির বোধ জাগায় না); নায়ক হবে পশু ও দেববৃত্তির মধ্যবর্তী স্তরের

উভয় বৃত্তির দ্বন্দ্ব ও শেষেরটির জয় তবেই ফুটে উঠবে তার মধ্যে দিয়ে। চরিত্রের শোচনীয় পরিণতির পথেই এই জয় সূচিত হবে। এই উদ্দেশ্যে নায়ক চরিত্রে সংযোজিত হবে বিচারবিভ্রান্তি, বংশগত পাপ বা ব্যক্তিগত কোন ত্রুটিবিচ্যুতি। এ সবই ঘটবে তার অজ্ঞাতে ; এমনকি স্বজনদের মধ্যে যে হত্যা দেখান হবে, তাও প্রথমে তার অজানা থাকবে। অদৃষ্টের হাতে সে ক্রীড়নক। দুঃখপরিণাম তখনই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং তাই রস-উদ্‌বোধক হয়ে উঠবে।

নাটকের কেন্দ্র কর্মবৃত্ত, বস্তু তার অনুকরণ করে, এবং চরিত্র তার প্রতিনিধিত্ব করে। আচরণ কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণে চরিত্রদের গড়ে তোলে, কিন্তু কর্মবৃত্তকে স্থিতি ও পরিণতি দেয় বস্তু বা ঘটনা বা আখ্যান। বস্তুই প্রধান, চরিত্র তাকে অভিনয়ে দর্শনীয় করে তোলে। ট্রাজিডি তাই কর্ম-বৃত্তের অনুকরণ, চরিত্রের অনুকরণ নয়।

(ঙ) মনন, 'Thought) : কর্মবৃত্তের অন্যতম প্রতিনিধি হল যুক্তিনিষ্ঠ ভাব (সেন্টিমেণ্ট)। এই অঙ্গটি কর্মবৃত্তের অন্যতম উৎসও বটে। এতদ্বারা ঐ বৃত্তের গতি-প্রকৃতি নির্ণীত, পরিকল্পিত ও গঠিত হয়। ভাব তাই 'মনন' নামে আখ্যাত।

ট্রাজিডিতে মননের কাজ—কোন বিশেষ বক্তব্যকে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত করা, অথবা কোন সর্বজনীন সিদ্ধান্তের নিষ্কাষণ। রসের উদ্বোধনেও এই অঙ্গের অবদান স্বীকার্য। মনন অভিব্যক্ত হয় চরিত্র-অভিনয়-সংলাপের মাধ্যমে। ভাব বা মনন অনুযায়ীই সংলাপ উচ্চারিত * । তাই এই অঙ্গের সঙ্গে ভণিতির যোগ নিবিড়।

ট্রাজিডির প্রধানতম অঙ্গ—বস্তু। এবং (চরিত্রের মতো) মননও একটি সাধারণ কারণ-সূত্র, যা থেকে কর্মবৃত্তের উৎপাদন।

(চ) বস্তু (Plot) : কর্মবৃত্তের অনুকরণই বস্তু। বস্তু হল কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি, যারা যুক্তিসংগত কার্য-কারণ-সূত্রে পরস্পর-আবদ্ধ। দৃঢ়পিনদ্ধ ঘটনাপঙ্ক্তি ফুটিয়ে তোলে এক-একটি কর্মবৃত্তকে। এর যে কোন একটিকে পরিত্যাগ বা স্থানচ্যুত করলে সমস্ত গঠনভঙ্গিটাই বিপর্যস্ত হয়ে যেতে বাধ্য।

যেহেতু ট্রাজিডি কর্মবৃত্তের অনুকরণ এবং বৃত্তের অনুকরণেই বস্তু-গঠন, তাই ট্রাজিডিতে বস্তুই প্রধানতম অঙ্গ। সতর্ক চেতনায় এর দেহে আনতে হয় সুগঠিত ছাঁদ, বিবিধ প্রত্যঙ্গের সুবিহিত সামঞ্জস্য।

বস্তু হবে সম্পূর্ণ, সমগ্র ও যথাযথ। এর অন্তর্গত ঘটনাগুলি একত্রে প্রকাশ করবে একটি সংহত কর্মবৃত্তকে। তাহলেই বস্তুটি সুন্দর হবে। সুন্দর নির্ভর করে আকার ও শৃঙ্খলায়। তাই বস্তুর আকার হওয়া চাই যথাবিধ ও সুবিন্যস্ত। সুখ থেকে দুঃখে পৌছোনোব জন্যে যতটুকু দরকার, সময়-সীমা হবে ততটুকুই।

বস্তুর যাথার্থ্য কর্মবৃত্তের সমগ্রতায়, সমগ্রতার জন্যে চাই তিনটি সুবিন্যস্ত স্তর : সূচনা—মধ্যভাগ—সমাপ্তি।

১। **সূচনা :** কর্মবৃত্ত তথা বস্তুর প্রথম স্তর। এর আগে অনেক কিছু ঘটে গেছে, কিন্তু (তাবই ভিত্তিতে) এইখান থেকেই নাটকেব সূচনা এবং পববর্তী ঘটনা এরই প্রসারিত রূপ।

২। **মধ্যভাগ :** সবল নাট্যবস্তুর মধ্যভাগে দুটি প্রত্যঙ্গ থাকে—গ্রন্থিবন্ধন ও গ্রন্থিমোচন। জটিল নাট্যবস্তুর মধ্যভাগে এ ছাডাও থাকে বিপর্যাস ও উদ্ঘাটন।

৩। **গ্রন্থিবন্ধন :** সূচনাব পর থেকে নায়কের ভাগ্য পরিবতনেব বাঁক পর্যন্ত নাট্যবস্তু বাধা বিঘ্নে কণ্টকিত ও জটিল হতে থাকে।

৪। **গ্রন্থিমোচন :** নাযকের ভাগ্য পরিবর্তনের সীমানা থেকে পবিণামী সীমান্ত পর্যন্ত—এখানে থাকে বহস্য-উন্মোচন, ভ্রান্তি-নিরসন ও ফলশ্রুতি।

৫। **বিপর্যাস :** কল্পনা বা কর্মেব অভাবিত বিপরীত প্রতিক্রিযা।

৬। **উদ্ঘাটন :** অজ্ঞাত বিষয জ্ঞাত হয। উদ্ঘাটন হয নানাভাবে, দৈহিক চিহ্ন, স্মৃতিচারণ, বিচার, নাট্যকাবের উক্তি। তবে এটি ঘটনাসঞ্জাত হওয়াই বাঞ্ছনীয, তাতে বিস্ময জাগে। আপাতদৃষ্টিতে উদ্ঘাটনকে গ্রন্থিমোচনের সদৃশ মনে হতে পাবে, কিন্তু তা নয। প্রথমটির পবিধি সীমিত, বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতি-বিশেষের সাময়িক রহস্য উদ্ঘাটিত করে, দ্বিতীযটি সমগ্রভাবে নাট্যবস্তুর রহস্য উন্মোচিত করে, এবং তাকে নিয়ে যায় পরিণতিব পথে।

নাট্যবস্তু সরল বা জটিল হতে পারে, যন্ত্রণা-চরিত্র-প্রেক্ষা এদেব প্রত্যেকটিকে আশ্রয় ক'বেও লেখা হতে পারে। তবে, সার্থক নাট্যকার এদেব সবগুলিকে মিলিয়ে এবং ষডঙ্গের সুবিহিত সন্নিবেশেই উত্তম ট্রাজিডির সৃষ্টি করেন।

নাটগীত—'নাট' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নৃত্য [নট্ (নৃত্যকরা)+অ (ভাবে ঘঞ্)] এবং সম্প্রসারিত অর্থ নৃত্যাভিনয় বা অভিনয়। 'নাটগীত'

কথাটির সাধারণ অর্থ নৃত্য-গীত বা নৃত্যাভিনয় যুক্ত গীত। বাংলা সাহিত্যে কিন্তু কথাটির একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থ আছে। স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে বাংলার জন্মমুহূর্ত থেকে তথা তার বেশ খানিকটা আগে থেকেই, এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের আনন্দোৎসবের, শিল্প-সাহিত্য সম্ভোগের যে বিশেষ পদ্ধতি ছিল তার মধ্যে—পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও সমাজের মতই—প্রাধান্য ছিল নাচ, গান, অভিনয়াদি লোককলার। ইংরেজী প্রভাবিত আধুনিক নাটক ও তদনুকরণে জাত যাত্রা বা গীতাভিনয়ের তো প্রশ্নই উঠে না, সংস্কৃত নাটকও বিদগ্ধ মহলের একান্ত বস্তু হওয়ায় সাধারণ মানুষের শিল্পকলায় কোন ছায়াপাত করতে পারেনি। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন যে বৈদিক যুগের ধর্মোৎসবের অঙ্গরূপে নৃত্যগীতের ধারাই বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলা লোকশিল্পকলায় পরিণতি লাভ বা প্রভাব বিস্তার করেছে। (Sanskrit Drama—Keith ; Encyclopaedia Britanica)। কোন কোন প্রাচ্য পণ্ডিতের অনুমান, সূর্য দেবতার পরিণতরূপ নটরাজ শিবের গানই বীজরূপে ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে নাট্যাকারে রূপায়িত হ'য়েছে (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—মন্মথমোহন বসু)। উৎস ধারা সম্বন্ধে মতান্তর থাকলেও আদি যুগের লোকশিল্পের রূপ সম্বন্ধে মতানৈক্য কম। তখন নৃত্য-গীত-অভিনয় সাধারণত একই সঙ্গে হ'তো এবং এরই নাম ছিল নাটগীত। সেকালে আসর বসত দু'ধরণের। একছিল স্থাবর আসর, দেব মন্দিরের সামনে—নাটমন্দিরে অথবা অন্যত্র ০ ন দেবমূর্তি বা ঘট প্রতীক সামনে স্থাপনা করে। দ্বিতীয় ছিল জঙ্গম আসর—শোভাযাত্রা করে যাতে চলত নৃত্যগীত। যেমন দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, রথযাত্রা ইত্যাদি ধরণের। স্থাবর আসরে পুতুল নাচ হ'তো, সঙ্গে সঙ্গে চলত গান। পঞ্চালিকা কথার মধ্যে এর ইঙ্গিত আছে। পরে পুতুলের স্থানে—নট নৃত্য করত ও গান গাইত। এই নৃত্যাভিনয়েরও দুটি ধারা আছে 'পাত্রনৃত্য' ও 'চিত্রণনৃত্য'। পাত্রনৃত্যে নর্তকদের বা মানব ভূমিকার উপযোগী মুখোশ পরে মূকাভিনয় করত। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ও উড়িষ্যায় 'ছো' বা ছোউ নাচের মধ্যে এই ধারার অবশেষ আজও বিদ্যমান। [ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন এই 'ছোউ' শব্দটি পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উল্লিখিত মূকাভিনয় 'শৌভিক' শব্দ থেকে এসেছে]। পুরানো বাংলা সাহিত্যে এই বেশ গ্রহণ রীতিকে বলা হ'য়েছে

কাচকাচা (কাচ—কৃত্য—বেশবিন্যাসাদি অর্থে)। প্রেরণ নৃত্য বলা হ'তো স্বাভাবিক পাত্রপাত্রী বেশে নৃত্যকে। বর্তমান নাটকের সংলাপ তখন হ'তো গানে গানে। গানের সঙ্গে অবশ্য নৃত্য ও অভিনয় থাকত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্য আসলে নাটগীত। সেখানে মোট ২৪টি গানের মধ্যে দশটি সখীর আটটি রাধার তিনটি কৃষ্ণের, আর বর্ণনাত্মক তিনটি অধিকারীর। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে বৃহদ্ধর্মপুরাণে গঙ্গাধারা সৃষ্টি সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে নাটগীত বর্ণনার ইঙ্গিত আছে। জয়দেবের পরে মৈথিলী ভাষায় রচিত উমাপতি ওঝার 'পারিজাত হরণ' নাটক নাটগীতির অন্যতর উদাহরণ। গীতগোবিন্দে অধিকারী বাদে পাত্রপাত্রী রাধা কৃষ্ণ ও সখী—তিনজন। কিন্তু পারিজাত হরণে পাত্রপাত্রী পাঁচজন ও গীতসংখ্যা ২১। বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' নাটক ও নাটগীত। নাটগীতের তৃতীয় পর্ব বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা তিনটি—কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই। নেপালের রাজসভার আশ্রয়ে পুষ্ট বাংলা বা মৈথিল সাহিত্য এবং অসমীয়া সাহিত্যেও নাটগীতের সন্ধান পাওয়া যায়। [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড পূর্বার্দ্ধ—ডঃ সুকুমার সেন এবং বিচিত্র সাহিত্য ১ম খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন দ্রষ্টব্য]। নাটগীতের নির্গলিতার্থ নৃত্যসম্বলিত গীত সংলাপ বা কথোপকথন। নিবদ্ধ কীর্তনের মধ্যে মূল গায়েন দোহার সহযোগে একাই অভিনয় করতেন। ক্রমে এই প্রথাই আংশিক বা পূর্ণভাবে ঢপ কীর্তনে, পাঁচালীতে ও কৃষ্ণযাত্রায় পরিণতি লাভ করে। মনে হয় কবিগান তর্জায়, চাপান উতোরে এবং ঝুমুরের উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক নৃত্য-গীতাদির মধ্যেও মূলতঃ নাটগীতের প্রথাই কোথাও ঋজুভাবে কোথাও তির্যকভাবে প্রসারিত। পরে যাত্রাগানের উদ্ভবে ও বিকাশে সংলাপ ক্রমশঃ সঙ্গীত ও নৃত্য থেকে আলাদা হ'য়ে পড়ে। অবশ্য দ্বৈত সঙ্গীত নৃত্যের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে এই নাটগীতের ধারাটি যাত্রাগান পেরিয়ে বিভিন্ন গীতিনাট্যের মধ্যেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এমনকি সাগর সঙ্গমে যেমন গঙ্গাধারার বিপুল গর্জন ও গহন গতির মধ্যেও গঙ্গোত্রীর কলধ্বনি ও নৃত্যচ্ছন্দ বিদগ্ধজনের অগোচর থাকে না —তেমনি রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মধ্যেও আদি যুগের নাট-গীতের পরিণতরূপের সুর ও ছবি রসিক জনের কান আর চোখ এড়িয়ে যাবে না বলেই মনে হয়। —ম. চ.

নাট্যশালা (আদিযুগ)—১। **গ্রীক্ নাট্যশালা**—প্রাচীন গ্রীসের সুরা ও উর্বরতার দেবতা ডায়োনিসাস (Dionysus)-কে কেন্দ্র ক'রে বছরে চারটি প্রধান উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত। তারমধ্যে দু'টি উৎসবের সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের সূচনা ও বিকাশের উৎসব জড়িত। এর একটি হ'ল গ্যামেলিয়ন (Gamelion) মাস বা বিবাহমাসে (বর্তমান জানুয়ারী মাসের শেষার্ধ থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাল) অনুষ্ঠিত লেনীয়া (Lanaea) উৎসব এবং অপরটি হল স্ট্যাগ (Stag) মাস বা হরিণ মাসে (বর্তমান মার্চ মাসের শেষার্ধ থেকে এপ্রিলের প্রথমার্ধ, বসন্তকাল) অনুষ্ঠিত Great Dionysia উৎসব।

একেবারে প্রথমদিকে অ্যাগোরা (Agora) এবং তার পরবর্তীকালে অ্যাক্রোপলিস (Acropilis) পাহাড়ের দক্ষিণদিকের উৎরাইতে অবস্থিত ডায়োনিসাস ইলিউথেরাস (Dionysus Elutherus) মন্দির প্রাঙ্গণে নির্মিত অস্থায়ী নাট্যমঞ্চেই নাট্যাভিনয়ের সূচনা।

স্থাপত্য ও মঞ্চসজ্জা—কোরাস (Choros) বা মঞ্চপীঠ—ডায়োনিসাস মন্দির-প্রাঙ্গনে কোরাস দলের নাচ বা গানের জন্যে নির্দিষ্ট বৃত্তাকার স্থানটির নাম কোরাস বা অর্কেষ্ট্রা। প্রাচীন এরেনা (Arena) শব্দটি থেকে অর্কেষ্ট্রা শব্দটিব সৃষ্টি। প্রথম যুগে মঞ্চ বলতে এই স্থানটুকুকেই বোঝাত।

প্যারোডস (Parodos) বা প্রধান প্রবেশ পথ—অর্কেষ্ট্রা বা অভিনয় প্রাঙ্গণ থেকে উত্তর পশ্চিমে সামান্য খাড়াইভাবে অবস্থিত পথ। এই প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে কোরাস দল এবং প্রথম অভিনেতা মঞ্চে প্রবেশ করতেন (ইসকাইলাসের পর থেকে দ্বিতীয় অভিনেতা বা প্রতিনায়কও এই পথে মঞ্চে প্রবেশ করতেন)।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে ডায়োনিসাসের মন্দির প্রাঙ্গনে মঞ্চ বলতে বিরাট অর্কেষ্ট্রা (ব্যাস ৬৫ ফুট) এবং উল্লিখিত প্যারোডস বা প্রধান প্রবেশ পথটিকেই বোঝাত।

স্কীন (Skene) বা অস্থায়ী গৃহ—নাট্যাভিনয়ের প্রকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চসজ্জায় যে পরিবতন দেখা দিল, তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপকরণ স্কীন বা মঞ্চের উপর নির্মিত অস্থায়ী গৃহ। অর্কেষ্ট্রা বা অভিনয় প্রাঙ্গনের মাঝখানে অথবা দক্ষিণদিকে নির্মাণ করা হত। প্রথম দিকে স্কীন ছিল নাট্যক্রিয়ার বাড়তি অংশমাত্র। পরবর্তীকালে সঙ্গীতের পরিবর্তে সংলাপ

সম্বলিত অভিনয়াংশ বাড়তে থাকায় এই স্কীন হ'য়ে দাঁড়াল মঞ্চসজ্জার অপরিহার্য অঙ্গ। সূচনায় স্কীন তৈরী হত তাঁবুর কাপড বা কাঠ দিয়ে। পরবর্তী কালে পাথরের স্থায়ী স্কীন তৈরী হতে থাকে।

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯৮ অব্দে ইস্‌কাইলাসের ওরেষ্টিয়া (Orestia) নাটকের অভিনয় থেকে স্কীন-সম্বলিত মঞ্চ-স্থাপত্যের সূত্রপাত হয়।

প্যারাসকেনিয়া (Paraskenea) বা পার্শ্বপট—খ্রীষ্টপূর্ব ৪২০ থেকে ৪০০ অব্দের মধ্যে প্যারাসকেনিয়া বা পার্শ্বপট (উইংস) গ্রীক্ নাট্যমঞ্চে প্রবর্তিত হয়। এর ফলে অর্কেষ্ট্রা বা অভিনয় প্রাঙ্গণের আয়তন কমে যায়।

একেবারে গোড়ার দিকে সাজঘর মঞ্চ থেকে অনেক দূরে থাকত। কিন্তু প্যারাসকেনিয়া ব্যবহারের কাল থেকে সাজঘর মঞ্চের কাছে চলে আসে। অর্থাৎ এই উইংস বা পার্শ্বপটের পিছনেই সাজঘর স্থাপিত হল।

এপিস্‌কেনিয়ন (Episkenion) বা শীর্ষাবরণ—ক্লাসিক যুগেই মঞ্চসজ্জার বিবর্তনের ফলে মঞ্চের উপরিভাগেও আবরণ ব্যবহৃত হতে সুরু হয়। নাট্যশালার ছাদে চিলেকোঠার মতো এই এপিস্‌কেনিয়ন বা চালাঘরের প্রচলন তারই নিদর্শন।

পেরিয়াকটোই (Periaktoi)—পেরিয়াকটোই বা ঘূর্ণায়মান prism দ্বারা দৃশ্যপট পরিবর্তনের কাজ করা হত। এর গায়ে ট্রাজিডি, কমেডি বা স্যাটির (satyr) অভিনয়ের উপযোগী বিভিন্ন দৃশ্যাবলী আঁকা থাকত। মঞ্চের দুপাশে এই রকম এক একটি ক'রে পেরিয়াকটোই থাকত। শুধু ডান দিকে ঘোরালে একই শহরের অন্য একটি অঞ্চলকে বোঝাত, এবং দুদিকেই ঘোরালে সম্পূর্ণ দৃশ্যান্তর বুঝতে হত। এর প্রচলন হয়তো ক্লাসিক যুগে কিন্তু হেলেনীয় যুগেই এর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

স্ক্যেনা-ডাকৃটিলিস (Scaena-ductillis)—এই রীতি অনুসারে পশ্চাদ্‌পট (backdrop)-গুলি স্তরে স্তরে সাজানো থাকত। সামনের পট উঠলেই পরেরটি দেখা যেত।

এক্কিক্লেমা (Eccyclema)—সঞ্চরমান মঞ্চ। শকট-মঞ্চের (Revolving stage) মতো এটি প্রধান দরজার কাছ দিয়ে ঘুরে যেত এবং স্ক্যেনা-ডাকৃটিলিস প্রথায় সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যান্তর দেখানো হত। ইউরিপিডিসের অনেক নাটকের অভিনয়কালে এর সাহায্য নেওয়া হত।

২। রোমান নাট্যশালা—

ইতালির দক্ষিণপ্রান্তে সিসিলি দ্বীপেই রোমক নাট্যচর্চার প্রাথমিক সূত্রপাত ঘটে। হেলেনীয় যুগের কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রীক্ নাটক সিসিলিতে পাওয়া গেছে। গ্রীক্-নাটকের ধারাকে পুরোপুরি অনুসরণ ক'রেই রোমক নাট্যচর্চার সূচনা হয়েছিল। বিশেষ ক'রে ট্রাজিডি রচনা ও অভিনয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে গ্রীক প্রভাব ছিল সর্বাঙ্গীন। তবে কমেডির ক্ষেত্রে অবশ্য রোমক-নাট্যকলা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় চ'লতে সুরু করে।

নাট্যরচনা ও অভিনয়-কলায় পুরোপুরি গ্রীক্-ধারার অনুবর্তী হ'লেও রোমক-নাট্যশালার স্থাপত্যে ধীরে ধীরে বেশ কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। যতদূর জানা গেছে, রোমে প্রথম নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৩৬৪ অব্দে। এরপর খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৯ অব্দে অ্যাপোলোর (Apollo) মন্দিরের কাছেই যথাথ অভিনয়োপযোগী নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এ মঞ্চটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। উল্লিখিত দু'টি মঞ্চ এবং আরও কয়েকটি মঞ্চ কাঠের পাটাতন দিয়েই তৈরী হয়েছিল, যার ফলে তাদের স্থায়িত্ব খুব বেশী হতে পারেনি। এরপর খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৫ অব্দে একটি পাথরের নাট্যমঞ্চ তৈরী হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণের নৈতিক অবনতির আশঙ্কায় একবছর পরেই (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৪) সিনেট এই মঞ্চটি ভেঙ্গে ফেলার নিদেশ দেন। প্রায় একশো বছর পরে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫-৫৬ অব্দ) রোমে একটি স্থায়ী পাথরের মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির প্রতিষ্ঠাতা পম্পি (Pompey)। পরে খ্রীষ্ট' ' ৩২ অব্দে অগাষ্টাস সীজার এবং আরও কিছুকাল পরে টাইবেরিয়াস ক্যালগুলা কর্তৃক এই মঞ্চটি পুনর্গঠিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে রোমক-নাট্যশালার নিজস্ব রূপ পায়।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৩ অব্দে Pompey-এর অন্যতম এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু (L. Cornelius Balbus) আর একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন।

রোমক নাট্যশালার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মার্সেলাসের (Mercellus) নাট্যশালা। অগাষ্টাসের পালিত পুত্র মার্সেলাসের স্মৃতিরক্ষার জন্যে নাট্যশালাটি স্থাপিত হয়। এটির প্রতিষ্ঠাতা অগাষ্টাস এবং পরিকল্পনা ছিল জুলিয়াস সিজারের। এটিরও প্রতিষ্ঠাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৩ অব্দ (ঐতিহাসিক প্লিনি-র মতে খ্রীষ্টপূর্ব ১১ অব্দ)।

স্থাপত্য ও মঞ্চসজ্জা—রোমক নাট্যশালাগুলি সাধারণত খুব উঁচু এবং প্রশস্ত হত। সূচনাকাল থেকে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত কাঠের মঞ্চই প্রচলিত ছিল। পরে পাথরের মঞ্চ নির্মিত হয়। মঞ্চের সজ্জাকরণে উঁচু উঁচু স্তম্ভ এবং বিভিন্ন মূর্তির ব্যবহার হত। এ ছাড়া মঞ্চ স্থাপত্যের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

কয়েকটি নাট্যশালা আচ্ছাদিত ছিল। অনেকগুলির ওপরে কোনো আবরণ থাকত না। মাঝে মাঝে দৃশ্য-পরিবর্তনের সময় আধুনিক কালের মতো পর্দারও ব্যবহার করা হ'ত। তবে এই পর্দা উপর থেকে নীচে না নেমে নীচে থেকে উপরে উঠে যেত।

অ্যাম্ফি থিয়েটার—সীজারের প্রেরণা ও উৎসাহে তাঁর বন্ধু কিউরিও (Curio) একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন। তাঁর পরিকল্পিত এই মঞ্চ প্রকৃতপক্ষে পরস্পর মুখোমুখি দু'টি মঞ্চের সমষ্টি। এর একটি ঘূর্ণায়মান (Revolving) এবং অপরটি স্থির। এই দুটি মঞ্চের মিলিত রূপই সম্ভবত অ্যাম্ফি থিয়েটারের (Amphi Theatre) প্রথম স্পষ্ট রূপ।

ফ্রন্‌স্ স্কেনা (Frons Scaena)—অভিনয়কালে মঞ্চে ব্যবহৃত দৃশ্যগৃহ। মঞ্চের প্রকৃত অভিনয়-ভূমি থাকত এর সামনে। এতে দরজা এবং ছাদ থাকত। সম্ভবত বেদী এবং সিংহাসনও ব্যবহার করা হত।

স্কেনা (Scaena)—মঞ্চে ব্যবহৃত দৃশ্যগৃহ। প্রকৃতপক্ষে এটি মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভূমির কাজ করত।

হাইপোস্কেনিয়াম (Hyposcenium)—মঞ্চের সম্মুখস্থ সুসজ্জিত প্রাকার। এই প্রাকার থেকে সোপানশ্রেণী নেমে আসত। এই প্রাকারগুলি কখনো কখনো তিন-চার তলা সমান উঁচু হত। এই প্রাকার এবং ফ্রন্‌স্ স্কেনা যুক্ত হয়ে অভিনয়-মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহকে এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত রাখত।

৩। ভারতীয় নাট্যশালা—

ভারতবর্ষে নাট্যাভিনয় এবং নাটমঞ্চের সঠিক উৎপত্তিকাল সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগেই একথা বলে রাখা প্রয়োজন যে এ ব্যাপারে ব্যাপক এবং বিস্তৃত গবেষণার অবকাশ এখনো আছে। ভারতীয় নাট্যকলা সম্পর্কে প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র। কিন্তু, ভরতের জীবৎকাল সম্পর্কে এখনো পণ্ডিত মহলে নানা মতভেদ রয়েছে। তবে

তিনি যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, এই রকম একটা মত মোটামুটিভাবে পণ্ডিতমহলে গৃহীত হয়েছে। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র ছাড়া পূর্ববর্তী আর কয়েকখানি গ্রন্থে নাট্যকলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উল্লেখ পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ অব্দে পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী নামক বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থে নৃত্য-গীত সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যের সঙ্গে মঞ্চাভিনয়েরও উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থে মঞ্চাভিনয় 'নাট্য' নামে অভিহিত (৪. ৩।১২৯)। নাট্যকলা-বিষয়ক শাস্ত্র 'নটসূত্র' এবং নটসূত্রকার শিলালির উল্লেখ ('পারাশার্য শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ'—৪.৩। ১০) থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় অষ্টাধ্যায়ী রচনাকালের অনেক আগে থেকেই নাট্য-বিজ্ঞানের চর্চা ভারতবর্ষে ছিল। উক্ত গ্রন্থে অর্কেষ্ট্রা জাতীয় ঐকতানবাদনেরও উল্লেখ আছে। বিভিন্ন জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের সমষ্টি বোঝাতে তূর্য বা তূর্যাঙ্গ (২।৪।২) শব্দেব প্রয়োগ পাওয়া যায়। এরপর খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ অথবা তৃতীয় অব্দে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং নাট্যের উল্লেখ আছে (২।২৭)। অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে রীতিমতো মতবিরোধ আছে। এমনকি, এর রচনাকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী—এমন মতবাদেরও অস্তিত্ব রয়েছে (বর্তমান আলোচনা-ক্ষেত্রে প্রচলিত কালক্রম অনুসারেই ভরত-নাট্যশাস্ত্র বা তৎসমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থের আগেই অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ করা হল।) দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'কংসবধ' ও 'বলিবন্ধ' নামে দু'খানি নাটকের অভিনয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে 'শৌভিক' (মূকাভিনেতা), 'শৌভনিক' (নাট্য-প্রয়োগকর্তা) 'গ্রন্থিক' (সূত্রধার বা ব্যাখ্যাকার), ' . ত্রকর' এবং পার্শ্বচরিত্রাভিনেতা 'ব্যমিশ্রক'দের কথাও বলা হয়েছে। মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নাটকের প্রয়োগকর্তা 'শৌভনিক' নামে পরিচিত ছিলেন এবং 'শৌভিক' স্বয়ং মূকাভিনেতা। কিন্তু হীনযানী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ 'মহাবস্তু'তে বাজীকর অর্থে শৌভিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 'মহাবস্তু'র রচনাকাল সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়াব্দের প্রথমার্ধ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও ওই একই অর্থে অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক-কে বোঝাতে 'শৌভিক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত মহাভাষ্যের রচনাকালে শব্দটি নাট্যাভিনয়ের প্রসঙ্গেই পরিচিত ছিল। জাতকের গল্পেও 'নাট্য' অর্থাৎ মঞ্চাভিনয়ের উল্লেখ আছে। 'বার্তিক' রচয়িতা কাত্যায়ন সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব

তৃতীয় শতাব্দীতে তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণ 'বার্তিক' রচনা করেন। নাট্যের উল্লেখ তিনিও করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় নাট্যকলা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা সবচেয়ে প্রথমে পাওয়া যাচ্ছে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে। এই গ্রন্থের সম্ভাব্য রচনাকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী। এর পর নাট্য-বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'দশরূপ' এবং 'নাটকরত্নকোষ' (বা 'নাটক-লক্ষণ রত্নকোষ')। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষের দিকে বিখ্যাত 'কারিকা' রচয়িতা ধনঞ্জয় 'দশরূপ' রচনা করেন। ধনঞ্জয়ের প্রায় সমসাময়িক লেখক সাগর নন্দী রচনা করেন 'নাটকরত্নকোষ'। কেউ কেউ মনে করেন ধনঞ্জয়ের কিছু আগেই সাগর নন্দী তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে আর যাঁরা নাট্যকলা সম্পর্কে সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে শারদাতনয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ 'ভাবপ্রকাশনম্'-এর রচনাকাল আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ—এই কালসীমার মধ্যে কোনো এক সময়। ভরত-বর্ণিত নাট্যকলা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের কোনো কোনোটি সম্পর্কে শারদাতনয় ভিন্নতর অভিমত ও সিদ্ধান্ত দিয়েছেন (বৃত্ত শ্রেণীর রঙ্গালয় দ্রষ্টব্য)।

স্থাপত্য ও মঞ্চসজ্জা—ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাট্যগৃহ বা রঙ্গালয়ের স্থাপত্য এবং অলংকরণ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আছে। সেই বিবরণ অনুসারে রঙ্গালয়ের গঠন প্রধানত তিনরকম—বিকৃষ্ট, ত্র্যস্র ও চতুরস্র। এই তিন শ্রেণীর রঙ্গালয় আবার ক্ষেত্রফল অনুসারে তিন মাপের হতে পারত। যথা জ্যেষ্ঠ (বড়), মধ্য (মাঝারি) এবং আবর (ছোট)। এদের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে :—

ক। জ্যেষ্ঠ—২৭ দণ্ড বা ১০৮ হাত (১৬২ ফুট)
খ। মধ্য—১৬ দণ্ড বা ৬৪ হাত (৯৬ ফুট)
গ। আবর—৮ দণ্ড বা ৩২ হাত (৪৮ ফুট)

সাধারণত জ্যেষ্ঠ রঙ্গালয় ছিল দেবতাদের জন্যে, মধ্য রঙ্গালয় রাজা এবং তাঁর সমগোত্রীয়দের জন্যে এবং আবর রঙ্গালয় সাধারণ মানুষের জন্যে।

মাপের বিভিন্নতা, স্থাপত্যরীতি এবং অলংকরণ বৈচিত্র্যের দিক থেকে ভারতীয় রঙ্গালয়ের বিষয় বিশেষভাবে আলেচনার যোগ্য।

ভরতমুনি বর্ণিত রঙ্গালয়ের মূল শ্রেণীগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

বিকৃষ্ট শ্রেণী। ৬৪ হাত×৩২ হাত মাপ বিশিষ্ট আয়তাকার রঙ্গালয়। এই আয়ত ক্ষেত্রটিকে ৩২ বর্গহাতের (৩২×৩২) মাপে সমান দুইভাগ ক'রে নিয়ে তার একটি ভাগে তৈরী করা হত অভিনয়-মঞ্চ এবং সাজঘর। অন্য ভাগটিতে থাকত 'রঙ্গমণ্ডল' বা অডিটোরিয়াম।

ত্র্যস্র শ্রেণী। নাট্যগৃহ এবং মঞ্চ ত্রিকোণাকার। ভরতমুনি এই শ্রেণীর রঙ্গালয় সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেন নি। দশ রূপকের অন্তর্গত 'ভাণ-রূপকের' জন্যেই এই শ্রেণীর রঙ্গালয় ব্যবহৃত হত। এই রঙ্গালয়ে কেবলমাত্র মার্গরীতির প্রযোজনাই হ'ত; তার মধ্যে প্রধান নৃত্যানুষ্ঠান। সম্ভবত, রাজা, পুরোহিত, ঋত্বিক এবং রাজপুরনারীরাই এই জাতীয় রঙ্গালয়ের দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকতেন। সেদিক থেকে বলা যায়, পারিবারিক বা সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর জন্যেই ত্র্যস্র শ্রেণীর রঙ্গালয় নির্মিত হত।

চতুরস্র শ্রেণী। বর্গাকৃতি রঙ্গালয়। এই শ্রেণীর নাট্যগৃহের জ্যেষ্ঠ বা বড আকারের যথার্থ মাপ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় নি। আলংকারিক অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় ৬৪ বর্গহাত বিশিষ্ট চতুরস্র রঙ্গালয়ের কথা বলেছেন। এ ছাড়া 'সংগীত মকরন্দ' গ্রন্থে ৯৬ হাত×৯৬ হাত মাপ বিশিষ্ট চতুরস্র রঙ্গালয়ের উল্লেখ আছে। ভরতমুনির নির্দেশ অনুযায়ী ৩২ হাত×৩২ হাত ভূমির উপরে চতুরস্র রঙ্গালয় স্থাপিত হওয়া বিধেয়। মনে হয় উল্লিখিত মাপ অনুযায়ী সংগীত মকরন্দে বর্ণিত রঙ্গালয় জ্যেষ্ঠ, অভিনব গুপ্তের প্রদত্ত মাপ মধ্য এবং ভরতমুনির প্রদত্ত মাপ আবর বা কনিষ্ঠ শ্রেণীর রঙ্গালয়।

বৃত্তশ্রেণী। গোলাকৃতি রঙ্গালয়। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে এ শ্রেণীর কোনো উল্লেখ নেই। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত শারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশনম্' গ্রন্থে এই জাতীয় রঙ্গশালার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। শারদাতনয়ের মতে নাট্যগৃহ তিনজাতীয়—ত্র্যস্র, চতুরস্র ও বৃত্ত। বিকৃষ্ট শ্রেণী সম্বন্ধে তিনি কোনো উল্লেখই করেননি। শারদাতনয়ের সমসাময়িককালে ভারতবর্ষে অনেক বড় বড মন্দির ছিল যার সংলগ্ন নাট্যশালা বা নাটমণ্ডপগুলির অধিকাংশই বৃত্তাকার। বিশেষত দশম শতাব্দীতে নির্মিত খাজুরাহোর লক্ষ্মণমন্দিরের ভিত্তি এবং নাটমণ্ডপের গোলাকৃতি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে

লক্ষ্য করবার বিষয়। এই জাতীয় রঙ্গালয়ে প্রধানত নৃত্যানুষ্ঠানের প্রযোজনা হত।

রঙ্গশীর্ষ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সমস্ত রঙ্গালয়টিকে কল্পনা করা হয়েছে শায়িত রঙ্গদেবতার দেহরূপে। মঞ্চের যথার্থ অভিনয়-ক্ষেত্র বা রঙ্গপীঠের সংলগ্ন পিছনদিকের অংশটুকু রঙ্গশির বা রঙ্গশীর্ষ। অর্থাৎ শায়িত রঙ্গদেবতার মস্তকের অবস্থান। বিকৃষ্ট মঞ্চে (আয়তাকার মঞ্চ) রঙ্গশীর্ষের উচ্চতা রঙ্গপীঠ থেকে একটু বেশী। চতুরস্র মঞ্চের উভয়ক্ষেত্রই এক উচ্চতাবিশিষ্ট। সম্ভবত, নাট্যারম্ভে পূর্বরঙ্গের জন্যে এই অংশটুকু নির্দিষ্ট ছিল। রঙ্গপীঠ বা অভিনয়ক্ষেত্রে আসার আগে নাটকের কুশীলবেরা প্রথম এখানে এসে দাঁড়াতেন। তাছাড়া এখানে বাদ্যযন্ত্রীদের জন্যেও (বর্তমান কালে নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্য অনুষ্ঠানের মতো) স্থান সঙ্কুলান করা হত। সম্ভবত, পরবর্তীকালে রঙ্গশীর্ষ ও রঙ্গপীঠের মধ্যে পর্দা ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয়।

রঙ্গপীঠ। মঞ্চে রঙ্গশীর্ষের সম্মুখভাগ (দর্শকগণের মুখোমুখি অংশ) ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী রঙ্গপীঠ বা যথার্থ অভিনয়-ক্ষেত্র। হিন্দু নাট্যকলার রীতি অনুসারে রঙ্গালয় নির্মাণের জন্যে নির্বাচিত নির্দিষ্ট মাপ বিশিষ্ট ভূমিকে ঠিক মাঝামাঝি সমানভাবে ভাগ ক'রে একদিকে রাখা হত রঙ্গমণ্ডল বা প্রেক্ষাগার (দর্শকদের স্থান) এবং অন্য দিকটিতে গড়ে উঠত মঞ্চ ও নেপথ্য বা সাজঘর। তাছাড়া মঞ্চের পিছন দিকে রঙ্গশীর্ষ রূপে কিছুটা অংশ পৃথক ক'রে রাখার জন্যে স্বভাবতই রঙ্গপীঠ বা যথার্থ অভিনয় ক্ষেত্রের মাপ ছোট হ'য়ে যেত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি মধ্যমাপের বিকৃষ্ট শ্রেণীর রঙ্গশালাকে (অভিনবগুপ্তের টীকা অনুযায়ী ৬৪ হাত দীর্ঘ এবং ৩২ হাত প্রস্থ আয়তক্ষেত্র) সমান দুইভাগে ভাগ করলে ৩২ বর্গহাতের যে দু'টি সমান অংশ পাওয়া যাবে, তারই একটি ভাগ মঞ্চ ও নেপথ্যের জন্যে নির্দিষ্ট। এই অংশকে আবার প্রস্থের সমান্তরালভাবে দু'ভাগ করলে ৩২ × ১৬ হাত ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট দু'টি অংশ। এর পিছনদিককার অংশটি নেপথ্য গৃহ। সামনের অংশটিকে ওই একই ভাবে সমান দু'ভাগে ভাগ করলে ৩২ × ৮ হাত ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট দু'টি অংশ। এর সম্মুখভাগ রঙ্গপীঠ এবং পশ্চাদ্‌ভাগ রঙ্গশীর্ষ। অর্থাৎ যথার্থ অভিনয় ক্ষেত্রের প্রস্থ খুবই কম (আট হাত বা বারো ফুট)। তাছাড়া মত্তবারণীর জন্যে দু'পাশের জায়গা আরও কমে যাওয়ার জন্যে দৈর্ঘ্যও কমে যেত।

"মত্তবারণী। রঙ্গপীঠের সামনের দিকে দুইপ্রান্তে সাধারণত ৮×৮ হাত মাপের উপর নির্মিত স্তম্ভ বা খিলেন মত্তবারণী নামে পরিচিত। দু'পাশে মত্তবারণীর মোট ক্ষেত্রফল রঙ্গপীঠেব ক্ষেত্রফলের সমান। মত্তবারণীর ব্যবহার সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে বহু জটিল বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছে। কারও কারও মতে অভিনয়কালে 'কক্ষপরিবর্তন'কে বোঝাবার সুবিধার জন্য মত্তবারণীব ব্যবহাব ছিল। মোটামুটিভাবে বলা যায় বর্তমানকালে মঞ্চে উইংস (wings) বলতে যা বোঝায়, মত্তবারণীর অবস্থান সেইরকমই ছিল। মঞ্চের উভযদিকে চারটি কবে মোট আটটি স্তম্ভই মত্তবারণী।

ষডদারুক। রঙ্গপীঠ এবং রঙ্গশীর্ষেব সামগ্রিক অংশটুকুকে নেপথ্যগৃহ বা সাজঘবেব সঙ্গে পৃথক করবার জন্যে প্রাচীব নির্মিত হত। সেই প্রাচীরেব দেওযালে (মঞ্চেব পশ্চাদ্‌ভূমি অর্থাৎ দর্শক-আসন থেকে দৃশ্যমান দিকটি) ৬ খানি কাষ্ঠখণ্ডের সাহাযে রচনা করা হ'ত ষডদারুক। মূলতঃ ষডদারুকেব কাজ হল উপরেব ছাদকে ধ'বে বাখা। এই কাষ্ঠখণ্ডগুলিব অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। সে যাই হোক, এই ষডদারুকই যে হিন্দুনাট্যশালাব মঞ্চে ব্যবহৃত একমাত্র পটভূমি ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

যবনিকা। দামোদব গুপ্ত রত্নাবলীর অভিনয বর্ণনা প্রসঙ্গে 'কুত্তনীমতম্' গ্রন্থে 'যবনিকা' শব্দেব উল্লেখ কবেছেন। অভিনবভারতীতে-ও যবনিকাব উল্লেখ আছে। এছাডা কযেকখানি সংস্কৃত নাটকেও যবনিকা শব্দের উল্লেখ আছে অনেকেবই মতে শব্দটি যবন (গ্রীক্) শব্দ থেকে এসেছে। কিন্তু ড. সুশীলকুমার দে এবং ডঃ ডি, আর, মানকড মনে কবেন শব্দটি আসলে যমনিকা (Yamanika) এবং শব্দটিব মূল হল সংস্কৃত 'যম' (আবরণ বা পদা)। ভরতেরনাট্যশাস্ত্র রচনাকালে যবনিকা বা যমনিকার প্রচলন ছিল না, একথা বলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না। কাবণ অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকের বিভিন্ন গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যের শেষে কুশী-লবেবা নাটকের স্বাভাবিক সংলাপ বা ঘটনাসংস্থানের সাহায্যেই মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারতেন, স্ক্রীন বা পদাব প্রয়োজন সে-সব নাটকের অভিনয়ে অপরিহার্য ছিল না।

দ্বিভূমি মঞ্চ। ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী নাট্যগৃহ দ্বিভূমি সম্পন্ন হওযা বাঞ্ছনীয়। এই 'দ্বিভূমি' শব্দের নানারকম ব্যাখ্যা রয়েছে। কারও মতে দ্বিতল প্রেক্ষাগৃহ, অনেকের মতে প্রেক্ষাগৃহেব ভূমি থেকে মঞ্চের নিজস্ব

উচ্চতা—এই-ই দ্বিভূমির অর্থ। অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় বলেছেন সোপানাকৃতি গঠন। বর্তমানকালে পরিচিত দ্বিস্তর বা ত্রিস্তর জাতীয় গঠনের কোনো ইংগিত 'দ্বিভূমি' শব্দটিতে আছে কিনা বলা কঠিন।

রঙ্গমণ্ডল। প্রেক্ষাগার বা দর্শকদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশের নাম রঙ্গমণ্ডল। রঙ্গালয়ের জন্যে নির্বাচিত ভূমির অর্ধাংশ নিয়ে রঙ্গমণ্ডল নির্মিত হ'ত। ভরতের বর্ণনা অনুসারে রঙ্গমণ্ডলের গঠন সোপানাকৃতি অর্থাৎ বর্তমান কালের গ্যালারি জাতীয়। আসন নির্মাণে ইঁট বা কাঠ ব্যবহার করা হত। আসন থেকে রঙ্গপীঠকে স্পষ্টভাবে যাতে দেখতে পাওয়া যায়, তার জন্যে যথাযথ উচ্চতা বজায় রাখার নির্দেশও ভরত দিয়েছেন।

স্তম্ভ। রঙ্গশালার স্থাপত্য এবং অলংকরণের অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ। রঙ্গশালার নির্মাণকার্য আরম্ভ হবার সময় প্রথমেই প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশ আছে। প্রাচীর নির্মাণের পর রঙ্গশালার চারকোণে চারটি স্তম্ভ নির্মাণ করা আবশ্যিক কাজ ছিল। চতুর্বর্ণের নাম অনুসারে স্তম্ভ চারটির পরিচয় যথাক্রমে ব্রাহ্ম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। স্তম্ভ স্থাপনেরও বিশেষ রীতি ও অনুষ্ঠান ছিল।

ব্রাহ্মণস্তম্ভ। তিনদিন উপবাসের পর ব্রাহ্মমুহূর্তে রোহিণী অথবা শ্রবণা নক্ষত্রে শিল্পগুরু নাট্যশালার অগ্নিকোণে এই স্তম্ভ স্থাপন করতেন। এইটি প্রথম স্থাপিত স্তম্ভ এবং শাদা রং এর বৈশিষ্ট্য। অনুষ্ঠানের সমস্ত উপচার শাদা রঙের (·শ্বেতসরিষা, ঘি, দুধ ইত্যাদি)।

ক্ষত্রিয় স্তম্ভ। নাট্যগৃহের নৈঋত কোণে স্থাপিত দ্বিতীয় স্তম্ভ। এর রং লাল। এই স্তম্ভ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত উপচার সব লাল রঙের (রক্তবস্ত্র, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম ইত্যাদি)।

বৈশ্যস্তম্ভ। নাট্যগৃহের বায়ুকোণে স্থাপিত তৃতীয় স্তম্ভ। অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত উপচার সব হলুদ রঙের (হলুদ কাপড়, প্রলেপন, মাল্য ইত্যাদি)।

শূদ্রস্তম্ভ। ঈশান কোণে স্থাপিত চতুর্থ স্তম্ভ। অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত উপচার নীল রঙের।

নাট্যশালা : (মধ্যযুগ)—

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টানদের কনস্ট্যান্টিনেপ্‌ল-জয় পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছর কাল য়োরোপীয়

নাট্যচর্চার ইতিহাসে অন্ধকার যুগ। রোম-সভ্যতার পতনের আগে রোমান নাট্যশালায় রীতিমতো হীনতা এবং অশ্লীলতা দেখা দিয়েছিল। মধ্যযুগে চার্চের পৃষ্ঠপোষণায় ধর্মীয় ও নীতিবাদী নাটকের অভিনয় দিয়ে নাট্যাভিনয়ের পুনর্জন্ম হল। ক্যাথলিক চার্চে 'লাষ্ট সাপার' (Last Supper) অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মাস (Mass) নামক ধর্মানুষ্ঠানে মধ্যযুগীয় ধর্মমূলক নাটকের সূচনা। বাইবেলের বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই জাতীয় নাটকের নাম **মিস্ট্রি প্লে** (Mystery Play)।

মধ্যযুগের প্রথম দিকে নাট্যাভিনয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল বলে মঞ্চস্থাপত্যের চেয়েও ধর্মীয় বিষয়বস্তুর উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হত। তাই মঞ্চ-ব্যবস্থাও ছিল সরল। কিন্তু পরবর্তী যুগে ঝড, তুফান, বিদ্যুৎচমক, ভূমিকম্প, অলৌকিক আবিভাব ও অন্তর্ধান প্রভৃতি দৃশ্যাবলী নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠায় মঞ্চ-স্থাপত্য এবং প্রয়োগ কৌশল আর আগের মতো রইল না।

এ সময় নাট্যাভিনয়ের ধারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ছিল। রোমের কলোসিয়াম-এ এই ধর্মীয় নাটক বা Sacraē Rεpresenta পরিবেষণ করা হত, স্পেনে পরিবেষণ করা হত কোরালেস-এ (Corrales), ইংল্যাণ্ডে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত কর্ণওয়াল-এর (Cornwal) বৃত্তাকার খোলা-মঞ্চে এবং ফ্রান্স বা নেদারল্যাণ্ডে কখনো বা নির্দিষ্ট মঞ্চে কখনো বা দৃশ্যাবলী সম্বলিত শকট-মঞ্চে (Wagon-Stage)।

ফরাসী নাট্যশালা। ফরাসী দেশে প্রথম ধর্মীয় নাটকখানি অভিনীত হয়েছিল গীর্জা সংলগ্ন স্কোয়ার বা চতুষ্কোণ-চত্বরে। পরবর্তীযুগে গীর্জার ভিতরে বা বাইরে একটি নির্দিষ্ট সরলরেখায় কতকগুলি অট্টালিকা তৈরী করা হত। কুশীলবেরা অভিনয়ের সময় প্রয়োজনানুসারে একটি থেকে আর একটিতে অগ্রসর হয়ে যেতেন। মঞ্চের একপাশে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি থাকত; তার দক্ষিণ দিকে স্বর্গ। স্বর্গের বিপরীত কোণে থাকত নরক। স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্তী স্থানে থাকত লিম্বো (Limbo) নামক রহস্যাচ্ছন্ন স্থান (খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস অনুসারে যে সমস্ত ব্যক্তি জীবিতকালে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সুযোগ পায়নি অথবা যে সমস্ত সাধু ব্যক্তি খ্রীষ্টের আবির্ভাবের আগেই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং যে সমস্ত শিশু খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, তাদের জন্তে

নির্দিষ্ট রহস্যময় লোক)। এ ছাড়া নাটকের প্রয়োজনে স্বর্গদ্বার, জেরুজালেম, বেথেলহেম প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনাস্থলও মঞ্চে দেখানো হত। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও দর্শকদের কাছে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ছিল নরকের মুখ-গহ্বররূপে নির্মিত অংশটি। বিশাল সেই মুখগহ্বরের মধ্যে যখন দুষ্কৃতকারীদের নিক্ষেপ করা হত তখন তার ভেতর থেকে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা বেরোত। এর জন্যে সে যুগের মঞ্চাধ্যক্ষকে সম্ভবপর যান্ত্রিক-কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের নাট্যশালা। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু অন্যান্য য়োরোপীয় দেশের মতো নাটকের জন্যে নির্দিষ্ট মঞ্চ তৈরী করা হত না। অন্যান্য দেশে বাজারের উন্মুক্ত চত্বরটিকে (আমাদের দেশের যাত্রা-আসরের মতো) যেভাবে মঞ্চের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা হত, তার প্রচলন কিছু কিছু থাকলেও '**মিস্ট্রি**' বা '**মিরাকল্**' জাতীয় নাটকের জন্যেও শকট মঞ্চ ব্যবহারের রীতিই ইংল্যাণ্ডে ছিল বেশী। নানা দৃশ্য সম্বলিত এই শকটগুলির দু'টি তলা থাকত। উপরতলা থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া দৃশ্যপট বা পর্দাগুলো নীচের তলাকে ঢেকে দিত। এই নীচের তলাটি ছিল সাজঘর। অভিনয় হতো দোতলার উপরকার ছাদে। এই মঞ্চের নীচে ঠিক টানা-গাড়ীর মতো দু'টি কি আটটি চাকা থাকত। তার ফলে মঞ্চটিকে যে কোন জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ হত।

ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে নাট্যাভিনয় ধীরে ধীরে যখন গীর্জার বন্ধন এবং বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হল, তারপর থেকে ইংল্যাণ্ডেও নাট্যাভিনয়ের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বেড়ে যায়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে য়োরোপের অন্যান্য দেশের মতো ইংল্যাণ্ডেও পেশাদার অভিনেতারা নিয়মিত অভিনয় সুরু করেন।

এলিজাবেথীয়-মঞ্চ। মূলতঃ শেকসপীঅরের নাটকগুলির জন্যেই এলিজাবেথীয় যুগ ইংল্যাণ্ডের নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। অমর কবি এবং নাট্যকার সেক্‌সপীঅরের নাটকগুলি যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হত তখনকার মঞ্চস্থাপত্য কী রকম ছিল এ সম্বন্ধে কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ডাচ শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত সমকালীন 'সোয়ান থিয়েটার'-এর যে চিত্র পাওয়া গেছে, তারই ওপর ভিত্তি করে এলিজাবেথীয় যুগের রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা করা যায়। বর্তমানকালের মতো অপসারণযোগ্য দৃশ্যপটের ব্যবহার তখনো অজ্ঞাত ছিল তাই নাট্যকারও নাটকের দৃশ্য সংস্থানে নির্দিষ্ট দৃশ্যপট সম্পর্কে কোনো নির্দেশ দিতেন না। মঞ্চটি

ছিল অনতিপ্রশস্ত একফালি পাটাতনের মতো। মঞ্চের তিনটি ভাগ,—সম্মুখ, মধ্য ও পশ্চাৎ। সম্মুখভাগ (দর্শক আসনের নিকটতম অংশ) সাধারণত মাঠ, প্রাঙ্গণ বা রাজপথরূপে ব্যবহৃত হত, মধ্যভাগে সম্ভবত দুই প্রান্তে দুটি স্তম্ভ এবং অল্পসংখ্যক সাধারণ আসবাবপত্র রেখে দেওয়া হত। প্রাসাদের নিভৃত কক্ষ, মন্ত্রণালয় বা ওই জাতীয় কোনো আভ্যন্তরীণ কক্ষ হিসাবে এই অংশের ব্যবহার ছিল। তৃতীয় বা সবচেয়ে পিছনের অংশে একটু উঁচুতে থাকত গ্যালারি। দুর্গপ্রাকার, অলিন্দ বা ওই জাতীয় কোনো উঁচু জায়গার প্রতীক হিসাবে সম্ভবত এই অংশের ব্যবহার হত। আধুনিককালের মতো ড্রপ্‌সিন জাতীয় আবরণের প্রয়োগ এলিজাবেথীয় মঞ্চে ছিল না। তার ফলে নাট্যকারকেও নাটক রচনার সময় প্রত্যেকটি দৃশ্যকেই নাট্যক্রিয়া বা অ্যাকশন-এর ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার কথা খেয়াল রাখতে হত। প্রকৃতপক্ষে একদল কুশীলব প্রস্থান করবার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী দৃশ্যের কুশীলবেরা মঞ্চে এসে পড়তে পারত। দর্শকও সেই সঙ্গে নিজ নিজ কল্পনার সাহায্যে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চলে যেতে পারত। আমাদের দেশে যাত্রাভিনয়ের রীতির সঙ্গে এই রীতির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এর প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিশেষ প্রয়োজনবোধে ব্যবহারের জন্য মঞ্চের মধ্যভাগের সামনে একটি পর্দার (Traverse) ব্যবস্থা থাকত। প্রয়োজনের সময় এই পর্দাটি ফেলে দিলে দর্শকের চোখের সামনে থেকে মঞ্চের মধ্য ও পশ্চাদ্‌ভাগ (প্রাসাদ কক্ষ, মন্ত্রণাগার বা প্রাকার অলিন্দ ইত্যাদি অংশ) সম্পূর্ণ আড়াল হয়ে যেত। কিন্তু সম্মুখভাগে কোনো পর্দা বা ড্রপ্‌সিন না থাকায় সে অংশ সব সময়ই দর্শকের চোখের সামনে উন্মুক্ত থাকত। —অ কু সে.

নাট্যশালা, বঙ্গীয়—মধ্যযুগে বাংলাদেশে **নাটগীতের** অভিনয় হয়েছে। স্বয়ং চৈতন্যদেব অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সে যুগের কোনো নাটক আমরা পাইনি, এবং আধুনিক অর্থে 'নাট্যমঞ্চ'ও সে সময়ে ব্যবহৃত হোতো না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ দেশীয় হেরাসিম লেবেডেফ বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর দীর্ঘকাল আর কোনো নাট্যমঞ্চের খবর পাওয়া যায় না। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রথম বাঙালী পরিচালিত নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করলেন। পরে নবীনচন্দ্র বসুও নিজ গৃহে মঞ্চ নির্মাণ করেন ও বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর নাট্যরূপ প্রদান করেন। বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রেরাও এই সময় শেকসপীঅরের নাটক কখনো

ইংরেজীতে, কখনো বাংলায় ভাবান্তরিত করে অভিনয় করা সুরু করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, পাইকপাড়ার সিংহদের বেলগাছিয়া নাট্যশালা এবং জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চ এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকো অঞ্চলে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রথম পাবলিক থিয়েটার। নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই পর্বের নাট্যমঞ্চের উন্নয়ন-কর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে স্টার থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যমঞ্চ বাংলাদেশে নাট্যান্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। (দ্র. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪০)

বাংলাদেশে পাবলিক থিয়েটারের গঠনে পশ্চিমী পাবলিক থিয়েটারের প্রভাব আছে। প্রধানতঃ অপেরাধর্মী নাটক অভিনয়ের অনুকূলে বাংলাদেশে নাট্যমঞ্চ নির্মাণ করা হয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে নাট্যমঞ্চে চিত্রিত দৃশ্যপট ব্যবহারের রীতি ছিল,—আমাদের দেশে কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই রীতি অনুসৃত হয়ে এসেছে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চও য়োরোপীয় মঞ্চের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। তবে য়োরোপীয় নাট্যমঞ্চের দ্রুত পরিবর্তন, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের দেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আমাদের দেশে আজকেও মঞ্চসজ্জাকে চিত্তচমৎকারী করার প্রবণতা আছে, যান্ত্রিক কলা কৌশলের উপর নির্ভরতা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। য়োরোপে সাহিত্য-শিল্প ক্রমেই ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠ্‌ছে, বাস্তবতা-বিরুদ্ধ ভাব-আন্দোলন ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে মঞ্চকেও নূতন রূপ দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। নাট্যাভিনয় যে একটি ভ্রান্তিমাত্র, একেই যেন প্রকাশ করা হচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের দেশে নাট্যাভিনয়কে জীবনের স্বাভাবিকতা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে; অথচ তা সহজ নয়। এ অবস্থায় কৃত্রিম যান্ত্রিকতার দ্বারা এই স্বাভাবিকতা আনার একটা অস্বাভাবিক চেষ্টা করা হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক ধারণা পোষণ করতেন, এবং যদিও আজ পর্যন্ত তাঁর পরিকল্পনা মতো নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবু অতি আধুনিককালে কোনো কোনো দুঃসাহসী অভিনেতা-দল সেই পথকেই গ্রহণ করার চেষ্টা করছেন। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রকাশ করেছেন—'আধুনিক য়োরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রব রূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি।

লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে গেছেন, ঐ কাব্যটি ছন্দোময় বাক্যের চিত্রশালা। রেখাচিত্রকর তুলি হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাঙ্ক ব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তাহলে কবির প্রতিও যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত, এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা। শকুন্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সে'ই পর্যাপ্ত। আঁকা ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পাবে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপর দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান গতিশীল। দৃশ্যটা তার বিপরীত: অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু, দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলে-মানুষিতে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ, বাস্তব সত্যকেও এ [illegible] রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।'
—অ. রা.

নাট্য-শ্লেষ—দ্রঃ ড্রামাটিক আয়রনি।

নান্দী—সংস্কৃতে নাটকাদির প্রারম্ভে কর্তব্য মঙ্গলাচরণকে 'নান্দী' বলা হয়। 'আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতিযস্মাৎ প্রযুজ্যতে, দেব-দ্বিজ নৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা।' আদি যুগের বাংলা নাটকে 'নান্দী'র ব্যবহার দেখা যায়। (দ্রঃ সংস্কৃত নাটক)।

নামকরণ—নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টিই বিশেষ বিশেষ নাম দ্বারা চিহ্নিত। কবিতার ক্ষেত্রে অবশ্য কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু সকল কাব্য গ্রন্থই নামের পরিচয়

বহন করে। সুতরাং গ্রন্থের নামকরণ গ্রন্থকারের অন্যতম দায়িত্ব। আগে রচনা পরে নামকরণ, না আগে নামকরণ পরে রচনা—এ সম্পর্কে মতৈক্য না থাকতে পারে ; কিন্তু পাঠকের কাছে কোন সাহিত্যকর্ম উপস্থাপিত করতে গেলেই, তার গায়ে নামের লেবেল এঁটে দিতে হবে। এ সম্বন্ধে সবাই একমত।

নাটকের নামকরণ এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। নামকরণের গৌণ উদ্দেশ্য কান সাহিত্যকর্মকে অন্যান্য সাহিত্যকর্ম থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা। কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য নিগূঢ় ও অর্থবাহী। ব্যক্তি বিশেষের নামকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বাহ্য বা অন্তর্নিহিত গুণধর্মের বিচার নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণবর্ণ লোকের নাম গৌরাঙ্গ হতে কোন বাধা নেই ; দুঃশীল বালক সুশীল নামের অধিকারী হতে পারে। কোন নাটকের নাম ওরকম নিবর্থক ও যথেচ্ছ হতে পারে না। যে কোন আদর্শের অনুসরণ করেই নাটকের নামকরণ হোক না কেন, তা নাটকের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কান্বিত হওয়া প্রয়োজন।

নাটকের নামকরণের সুনির্দিষ্ট কোন আদর্শ নেই। নামকরণ অনেকাংশে নিভরশীল নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র ও ভাববস্তুর উপরে, বাকিটা গ্রন্থকারের বিশেষ ভাবাদর্শ ও রুচি প্রবণতার 'পরে। সুতবাং নামকরণের বস্তুনিষ্ঠ ও ভাবনিষ্ঠ—দুটি দিকই আছে। নাটক যেহেতু বস্তুনিষ্ঠ শিল্পকর্ম সেহেতু নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষতা, সংক্ষিপ্ততা ও স্পষ্টতার দাবী সঙ্গত বলে মনে হয়। কারো কারো মতে নাটকেব নাম—কিংবা যে কোন সাহিত্যকর্মের নাম—ব্যঞ্জনাধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ মত সর্বজনগ্রাহ্য নয়। নাটকের নামকরণ স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও সংক্ষিপ্ত হলে পাঠক বা দর্শকের পক্ষে নাট্যোল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে ধারণা যত সহজে হয়, ব্যঞ্জনাধর্মী হলে তত সহজে তা হয় না। নাটকের প্রকৃতির উপরেও কখনও কখনও নামকরণ নির্ভর করে। ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক নাটকে নামকরণ ব্যঞ্জনাধর্মী না হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু সাংকেতিক নাটকের নামকরণ সংকেতধর্মী ও ব্যঞ্জনাবাহী।

নামকরণের নির্দিষ্ট কোন নীতি না থাকলেও, বিচারের সুবিধার জন্যে অবশ্যই আমাদের একটা নীতি মেনে চলতে হয় ; অন্যথায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নাটকের নামকরণের ভিত্তি প্রধানত তিনটি—কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক চরিত্র, প্রধান ঘটনা বা পরিণামী ঘটনা, ও ভাব বা

ব্যঞ্জনা। বেশি সংখ্যক নাটকই কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়কের নামে চিহ্নিত। কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভিত্তিতে নামকরণের পিছনে নাট্যকারের ঐ চরিত্রটির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ঘুরিয়ে বলা যায়, যে নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রাধান্ত সর্বাধিক সে নাটক নামিত হয় ঐ চরিত্র-নামে। কৃষ্ণকুমারী, সিরাজদ্দৌলা, চন্দ্রগুপ্ত, জনা, মালিনী প্রভৃতি এর উদাহরণ স্থল। যে নাটকের নামকরণ করা হয় প্রধান ঘটনা বা পরিণামী ঘটনার ভিত্তিতে সে নাটকে ঘটনার প্রতিই নাট্যকারের মনোযোগ সবচেয়ে বেশি আপতিত। যথা মেবার পতন, বলিদান, বিসর্জন প্রভৃতি নাটক। রক্তকরবী, ডাকঘর, অচলায়তন প্রভৃতি নাটকের নাম ভাবভিত্তিক। এই শ্রেণীর নাটকে চরিত্র বা ঘটনা ভাবের বাহক বা দ্যোতনাকারী, ভাবের প্রাধান্তই বেশি।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকের নামকরণই ব্যঞ্জনাধর্মী। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নরনারায়ণ নাটকের নামকরণে ভাববস্তু (ভক্তিভাব) তথা নাটকীয় দ্বন্দ্বরেখার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। নাটকের নামকরণে নাট্যকারের ব্যক্তিগত রুচি-প্রবণতা ও ভাবাদর্শ যে ক্রিয়াশীল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নর-নারায়ণ ও রক্তকরবী নাটক দুটি। নরনারায়ণ নাটকের নাম প্রথমে ছিল কর্ণ। রক্তকরবী নাটকের নাম সর্বপ্রথমে ছিল যক্ষপুরী, তারপরে, নন্দিনী, সবশেষে রক্তকরবী। নরনারায়ণ চরিত্রমুখ্য নাটক, সুতরাং কর্ণ নামই সার্থকতর মনে হয়। যদি ভক্তিভাবের কথাই মনে রাখি এবং কৃষ্ণের ঐশ্বরিক মহিমার স্বীকৃতিই নাটকটির প্রধান বিষয় বলে মনে করি তবে নরনারায়ণ নামকরণ অসার্থক বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকে নামকরণে সাংকেতিকতার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। আসল কথা নাটকে চরিত্র চিত্রণ, ঘটনাবিন্যাস, নাটকীয় দ্বন্দ্ব, সংলাপ প্রভৃতি যেমন যথার্থ হওয়া উচিত, তেমনি নাটকের নামকরণও যথোপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। —অ. স.

নায়ক বিচার—নাটকে সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়ক চরিত্র অভিন্ন। সকল ঘটনাবর্তের কেন্দ্রে অবস্থিত, নাট্যকার ও দর্শকের সহানুভূতি প্রেরিত, কাহিনী ও বিভিন্ন চরিত্রের নিয়ন্ত্‌ শক্তি বা পরিচালককে নায়ক বলা হয়। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নায়কের অভিধা আরও স্পষ্ট : 'আলম্বনং নায়কাদি স্তমালম্ব্যরসোদগমাৎ...তত্র নায়কঃ।' (বিশ্বনাথ)। নায়ক হলেন অঙ্গীরসের আলম্বন বিভাব ; সহজ ভাষায় কাহিনীর মূল ভাব বা ফলশ্রুতির কারণ এবং

অবলম্বন। যাকে লক্ষ্য করে নাট্যকার সকল কার্য নির্দেশ করেছেন, অর্থাৎ যিনি অধিকাংশ ঘটনার ফলভোগী, তিনি নায়ক। কাহিনীর কেন্দ্রে অবস্থান, পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং নাট্যকারের ও দর্শকের সহানুভূতি যেখানে বিশেষ একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে প্রকাশিত, সেখানে কাহিনীর নায়ককে চিহ্নিত করা কঠিন নয়। কিন্তু সেখানেই নাযক বিচাব সমস্যায় পরিণত হয়, যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং নায়ক চবিত্র ভিন্ন। যেমন 'জুলিআস সীজার' নাটকে সীজার কেন্দ্রীয চরিত্র, কিন্তু নায়কের গৌরব সেখানে ব্রুটাসের। শেক্‌সপীঅবের 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস', ববীন্দ্রনাথেব 'মালিনী' ও 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটকে এইরূপ নায়ক নির্ণয এক সমস্যাব সৃষ্টি কবে। আবার কোনো কোনো কাহিনীতে যৌথ নায়কত্ব স্বীকৃত হয,—যদিও সমালোচকেরা বেশীরভাগ সময়েই তাকে নায়ক-শূন্য উপন্যাস বা নাটক নামে অভিহিত কবেন। আবার জড প্রকৃতিও অনেক সময জীবন্ত সত্তা রূপে সমগ্র কাহিনী পরিব্যাপ্ত করে থাকে। কাহিনীর নায়ক রূপে তার দাবীও অস্বীকাব কবা যায না, যেমন হেমিংওযের 'দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী'-তে সমুদ্র বা বিভূতিভূষণেব 'আরণ্যক' উপন্যাসে অরণ্য-প্রকৃতি। দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' নাটকেব 'মেবাব পাহাড' মেবারের প্রতীক রূপে নাযকত্ব দাবী কবতে পাবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, কোনো কাহিনীব নায়ক নির্ণয কবতে হলে প্রথমে কাহিনীর মূল ভাববস্তু, অঙ্গীবস এবং ফলশ্রুতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন, —কারণ তাকে অনুসরণ কবে নায়ক চরিত্রেব উদ্ভাস। যে চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনীর সকল ঘটনা ও চরিত্র আবর্তিত হচ্ছে তাকে বলবো কেন্দ্রীয় চরিত্র। আর যে চবিত্র কাহিনীর সকল ঘটনা ও চবিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে একটি স্থির-লক্ষ্য রূপ ফলশ্রুতিব দিকে নিয়ে চলেছে তাকে বলবো নায়ক চরিত্র। ফলতঃ, কাহিনীতে দুটি শক্তিব সমান প্রাধান্য আছে কিনা লক্ষ্য করতে হবে। এবং অতঃপর নায়ক, চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ, অখণ্ড ব্যক্তিত্ব, জীবন-সংরাগ প্রভৃতি গুণগুলির প্রকাশ কতদূর সার্থক হযেছে তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। —অ. বা.

নির্বহণ সন্ধি—দ্রঃ নাটকের গঠন (সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র)।

নৃত্যনাট্য—যে সব নাটককে আমরা নৃত্যনাট্য বলিতেছি সেগুলি রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে লিখিত। আবার ঋতুনাট্যগুলিও শেষ জীবনের

রচনা। স্থূল বিচারে দুই শ্রেণীর নাটককে একজাতীয় মনে হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ধরা পড়ে। এই দুই শ্রেণীর নাটকই সঙ্গীত ও নৃত্যপ্রধান হইলেও, নৃত্যনাট্যে নৃত্যই ভাবের একমাত্র বাহন, অর্থাৎ যে কথাটি কবি যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন নৃত্যের সাহায্য ছাড়া তাহা কখনোই সেভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না।

দ্বিতীয়ত, ঋতুনাট্যের নৃত্যকে সম্বহুলের আনন্দ বলা যাইতে পারে। এই নৃত্য বহুলের আনন্দকে প্রকাশ করিতেছে। রাজপুরীতে উৎসব, সেই সাধারণ উৎসবের আনন্দকে পুরবাসীরা নাচের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছে। রাজসভায় উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, সেই উৎসবের সমষ্টির উল্লাসকে নর্তকীর দল রূপ দিতেছে।

কিন্তু নৃত্যনাট্যগুলির নৃত্যের সঙ্গে বহুলের মনোভাবের কোনো যোগ নাই, তাহা এককের সুখদুঃখকে, এককের আশা-আনন্দকে প্রকাশ করিয়া চলিতেছে।

ঋতুনাট্যে ও নৃত্যনাট্যে চারিটি বস্তুর সম্মেলন ঘটিয়াছে—কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও চরিত্র। ইহাকে কবির নাটকীয় টেকনিকের চতুরঙ্গ রীতি বলা যাইতে পারে। এই চারিটির মধ্যে কাব্যের স্বাদ যে কোনো পাঠক গ্রন্থ পড়িলেই পাইতে পারেন। সুরের স্বাদ পাওয়াও দুরূহ নয়, স্বরলিপি আছে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, কিন্তু অপর দুটির স্বাদ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। যাঁহাদের এই সব অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা সেই নৃত্যের ছন্দঃসৌন্দর্য জানেন, রঙ্গমঞ্চ-সজ্জায়, আলোক ও বেশভূষায়, অভিনেত্রীদের অঙ্গাভরণে যে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিত তাহা দর্শকের স্মৃতিতে থাকিলেও লুপ্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সে সব হয়তো আর পুনরুদ্ধার করা যাইবে না, কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই হয়তো তাহারা প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে তাঁহার শেষ জীবনের এই শ্রেণীর নাটকের প্রকৃত মহিমা নির্ভর করিতেছে কাব্য সুর, নৃত্য ও চিত্রের চতুরঙ্গ রীতির সম্মিলিত সমাবেশের উপরে। কেবল গ্রন্থের দ্বারা বিচার করিলে ইহার কাব্যাংশই প্রকটিত হইবে অথচ প্রচ্ছন্ন অন্য তিনটি অঙ্গ অন্ততঃ কল্পনাতেও না দেখিতে পারিলে ইহাদের প্রতি অবিচার করিবার আশঙ্কাই সমধিক।

জীবন পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি ভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করিতে হইতেছিল সঙ্গীত ছাড়া যাহা প্রকাশ যোগ্য নয়। সেইজন্য শেষজীবনে

সঙ্গীত তাঁহার ভাবের প্রধান বাহন। নাটকের মধ্য দিয়াও কবি ক্রমে কতকগুলি সূক্ষ্মশরীরী, ছায়ারূপী বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিলেন। ভাব যতই সূক্ষ্ম হইতে লাগিল তাহার সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য ততই সুরের সারথ্য অধিকতর আবশ্যক হইতে লাগিল। ভাব সূক্ষ্মতর হইয়া পড়িল, সুরও যেন আর তাহাকে সম্যক্ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তখন সুরের সঙ্গে নৃত্যের যোগের প্রয়োজন হইল। যে-ভাবের সংজ্ঞা নাই, যে আকুলতার ভাষা নাই, ছন্দ যাহার আভাস মাত্র দিতে পারে, সুর যাহার ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু জানে না, শিক্ষিত অঙ্গের ছন্দোময় ব্যঞ্জনা সেই অনঙ্গ আকৃতিকে আভাসিত করিয়া তুলিতে প্রাণপণ করে—ইহাই নৃত্য। ভাবের পরিবর্তন ও পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নূতন নূতন বাহনের সন্ধান করিতে হইয়াছে। এইরূপ সন্ধানের ফলে তিনি ক্রমে কথা হইতে সুরে, সুর হইতে নৃত্যে, এবং শেষে নৃত্য হইতে চিত্রের চতুরঙ্গ রীতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে শাপমোচন, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ও শ্যামা যথার্থ নৃত্যনাট্য। নটীর পূজা নৃত্যনাট্য পর্যায়ের নয়, কিন্তু নটীর পূজাতেই যেন নৃত্যনাট্যের সূচনা।

জীবন পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিল্পগীত ও নৃত্যরসের দিকে অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে মোড় ঘুরিতেছিল একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কেবলমাত্র এই ভিতরের তাগিদেই নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে এমন মনে করিবার কারণ নাই। ভিতরের তাগিদ যতই প্রবল হোক ভারতীয় সাহিত্যে নৃত্যনাট্যের কোন সজীব আদর্শ নাই, যে নৃত্য আছে তাহা রবীন্দ্রনাথের রুচিকর নয়, আর কতকতো তাঁহার নিজেরই সৃষ্টি। কিন্তু ইহাতো কেবল নৃত্যমাত্র নয়, ইহা নৃত্যনাট্য, অর্থাৎ একটি জটিল কাহিনীর আদ্যন্ত দেহের ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রকাশ। চোখের সম্মুখে এই সজীব আদর্শের অভাবই তাঁহার প্রতিভাকে যেন নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এমন সময়ে ১৯২৭-এ তিনি জাভা ও বালি দ্বীপ ভ্রমণে যান। সেখানে নৃত্যনাট্য এখনো সজীব। সেই সজীব আদর্শই তাঁহার প্রতিভার শেষ বাধাকে দূর করিয়া ছিল। নৃত্য-নাট্যের একটা আদর্শ লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন, এবং স্বকীয় প্রতিভার দ্বারা পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিয়া নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি করিলেন।

—প্র. না. বি

পতাকা—দ্রঃ নাটকের গঠন (সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র)।

পৌরাণিক নাটক—(১) পৌরাণিক নাটকে, নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্র পুরাণ এবং রামায়ণ-মহাভারত থেকে গৃহীত হয়ে থাকে, এই জন্যই এই জাতীয় নাটককে পৌরাণিক নাটক বলা হয়। (২) পৌরাণিক নাটকে দেবতা এবং দেব-অনুগৃহীত মানব চরিত্রের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। (৩) দেবমহিমা প্রদর্শন, ধর্মভাবের উদ্বোধন ও ভক্তিরস পরিবেষণের আকাঙ্ক্ষাই পৌরাণিক নাটক রচনার প্রেরণা। (৪) দেবচরিত্র গৃহীত হওয়ায় নাটকীয় ঘটনার মধ্যে অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে; ফলে ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে নাটকের মানবরস (human element) পুষ্টিতে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, এবং নাটকের জনচিত্ত আকর্ষণ করে রাখবার শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। (৫) পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরস পরিবেষণের ব্যাপারে যাত্রার মত গীতের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, এই জন্য এই জাতীয় নাটকে গীতের আধিক্য লক্ষিত হয়। অধিকাংশ স্থলে এই গীতাধিক্য নাটকীয় ক্রিয়ার অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করে। (৬) নাটকীয় কাহিনী দ্বন্দ্ব সংঘাতে পুষ্ট হয়ে পরিণতির পথে অগ্রসর হয়ে থাকে। পৌরাণিক নাটকে এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের স্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি গৌণ; দ্বন্দ্ব সংঘাত থাকলেও তা অপেক্ষাকৃত স্থূলরূপ গ্রহণ করে বা অস্ফুট আকারে বর্তমান থাকে। পৌরাণিক নাটকে যাত্রার মত ভাড় বা সঙ্-যের ভূমিকার সাহায্যে নিকৃষ্টগুণের হাস্যরস পরিবেষিত হয়ে থাকে। (৮) পৌরাণিক নাটক রচনায় সাধারণত পদ্যছন্দ ব্যবহৃত হয়: পৌরাণিক বিষয়ের গাম্ভীর্য বা সমুন্নতি উচ্চস্তরের চরিত্রসমূহের চিন্তা ও ভাবের সমুন্নতি এবং সেই সমস্ত চরিত্রের আবেগ প্রবণতার প্রকৃতি, পদ্যছন্দে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হতে পারে। সেইজন্য পৌরাণিক নাটকে সাধারণতঃ পদ্যছন্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। —ভূ. না. দা.

পৌরাণিক নাটক স্বর্গ ও মর্ত্যের সেতু রচনা করে। নাটকের বিষয়বস্তু আহৃত হয় অষ্টাদশ পুরাণ বা রামায়ণ-মহাভারত থেকে। কাহিনী বস্তু থাকে হাতের মুঠোয়; কিন্তু নাট্যরস প্রায়ই থাকে অনায়ত্ত। পৌরাণিক নাটক কথাটির মধ্যেই স্ব-বিরোধের ইঙ্গিত আছে,—পুরাণ এবং নাটকের সমন্বয় দুরূহ-সাধ্য। পুরাণের জগৎ অপার্থিব ঊর্ধ্বচারী, নাটকের জগৎ ধূলিধূসর মর্ত্যপৃথিবী। দেব বা দেবানুগৃহীত চরিত্র পুরাণের অবলম্বন—নাটকে রিক্ত,

অসম্পূর্ণ মানুষের পরিচয়। দেবতার মনে দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব নেই, জীবন সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণার সে পরিচয় দেয়। তার জীবনে দুঃখ আছে বটে, কিন্তু দুঃখেই জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, স্বর্গীয় বিভব তাকে দেয় পরম আনন্দ, চিরন্তন আশা। অন্যদিকে নাটকের চরিত্রে প্রবৃত্তিনিচয়ের অসামঞ্জস্য জনিত দ্বন্দ্বের প্রকাশ ; জীবনের অজস্র অসম্পূর্ণতা, ব্যর্থতা, গ্লানি তাকে নিত্য মথিত করে। নাটকে তাই ট্রাজিডির সম্ভাবনা আছে, নিঃসীম হাহাকার এবং শূন্যতাবোধের মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। পুরাণের জগতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজন অকৃত্রিম ভক্তি ও আত্যন্তিক বিশ্বাস। কিন্তু নাটকের জগতে বিশ্লেষণাত্মক অনুভূতির সঞ্চার, কার্যকারণপরম্পরা সেখানে সর্বদা রক্ষিত।

পুরাণ এবং নাটক প্রকৃতপক্ষে দুই বিপরীত কোটিতে অবস্থিত, এদের মিলন সাধন যদিও সম্ভব নয়, তবু ভারসাম্য বজায় রেখে একত্র পরিবেষণ বোধ হয় অসম্ভাবিত নয়। গিরিশচন্দ্র পারেননি, তাঁর নাটকে ভক্তির প্রাবল্য পুরাণের স্বাদ দেয়, কিন্তু নাট্যগুণান্বিত হয়ে ওঠে না। অপরপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যধর্মের প্রতি সচেতন থাকার জন্যই বোধহয়, পুরাণের রস পরিবেষণে ব্যর্থ হয়েছেন। বাংলায় সার্থক পৌরাণিক নাটকের নিদর্শন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ'।

পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে লেখা সব নাটককেই 'পৌরাণিক নাটক' বলা যায় না ; কারণ বর্তমানে 'পৌরাণিক নাটক' অভিধার সঙ্গে ভক্তিভাব ও দেবমাহাত্ম্য-প্রদর্শনের একান্ত যোগ ঘটেছে। ফলে পুরাণের অনেক গল্পই, যার মধ্যে ভক্তিভাব মুখ্য নয়, তাকে 'পৌরাণিক নাটক' অভিহিত করা সঙ্গত নয়। যেমন শকুন্তলা, শর্মিষ্ঠা, কচ-দেবযানী প্রভৃতির উপাখ্যান। এগুলিকে 'পৌরাণিক নাটকে'র থেকে পৃথক করার জন্য, আমরা 'পুরাণাশ্রয়ী নাটক' বলতে পারি। —অ. রা.

প্রকরী—দ্রঃ নাটকের গঠন (সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র)

প্রতিমুখ সন্ধি—দ্রঃ নাটকের গঠন (সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র)।

প্রতীক নাট্য—রূপক নাট্য বলতে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' পর্যায়ের নাটককে গণ্য করা চলে, কিন্তু তাকে প্রতীক নাট্য বলা যায় না। রূপক-কাব্য হিসাবে স্পেনসার-রচিত 'ফেয়ারি কুইন' বা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য

উল্লেখযোগ্য। বানিয়ানের 'দি পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস্' রূপক-উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অনেকটা স্বাধীনভাবে করেন, 'বোধেন্দু বিকাশ' নামে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ মূলানুগত। এই পথে অনুরূপ রীতিতে কয়েকটি তত্ত্ব প্রধান **'রূপক নাট্য'** রচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা সাহিত্যে প্রতীক্ নাট্য গড়ে উঠেছে। কোনো প্রতীকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার যখন তার গূঢ়-বক্তব্যকে ব্যাখ্যা নয়, ব্যঞ্জিত করেন—সেখানে 'explanation'-এর চেয়ে 'suggestion' বড়ো হয়ে ওঠে, আমরা তাকে প্রতীক নাট্য বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে প্রতীক 'অন্ধকার ঘর'; তাই তাকে নাটকের প্রথমে ও শেষে বিন্যাস করা হয়েছে।

অন্ধকার ঘরের সাধনা বড় কঠিন; রূপ, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য সকলের অহংকার ঘুচলে তবেই আলোকের, পরমসুন্দরের দেখা মেলে। 'রাজা' মূলতঃ অধ্যাত্মরসনাট্য, তাকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য 'অন্ধকার ঘর'কে প্রতীক্ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। 'মুক্তধারা' ও 'রাজা' ভিন্ন বক্তব্যের নাটক। 'মুক্তধারা'র ভিত্তিতে আছে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগের বিজ্ঞানের দানবরূপ, জাতিবৈরী, সংস্কৃতির রাষ্ট্রায়ত্ত রূপ প্রভৃতির সংকট। যন্ত্রের দানবতার উপর আত্মার শক্তি, কল্যাণের শক্তির জয় এই নাটকের গূঢ় তাৎপর্য। সে'জন্য রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা'র যান্ত্রিক বাঁধ ও শিবমন্দিরের ত্রিশূলচূড়াকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করেছেন। 'রক্তকরবী' নাটকে জালের বেষ্টনী ও রক্তকরবীর গুচ্ছ প্রতীকের স্থান গ্রহণ করেছে। যন্ত্রের স্রষ্টা মানুষ ক্রমে যন্ত্রদাস পরিণত হয়েছে, হারিয়ে ফেলেছে আকাশের আলো, পাকা ধান, জীবনের সোনারঙা আনন্দকে। নিজেকে ঘিরেছে যন্ত্রের জালে অথচ তৃষ্ণার্ত হয়েছে যৌবনের, প্রেমের, অমৃতের জন্য। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগের যন্ত্রশাসিত পৃথিবীর গূঢ় বাস্তব-সত্য এই নাটকে ব্যঞ্জিত হয়েছে। যক্ষপুরী থেকে নন্দিনী এবং নন্দিনী থেকে 'রক্তকরবী' নামকরণের পশ্চাতে রয়েছে প্রাণ ও প্রেমের শক্তির অপরাজেয়তার দ্যোতনা।

'ডাকঘর' নাটকটিতেও এই প্রাণের যাত্রা রূপ থেকে অরূপে, রূপকে বর্জন করে নয়, দৃশ্যগন্ধগানের সবটুকু মধুকে গ্রহণ করে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহাজীবনের পথযাত্রা। অমলের ঘর ও বাতায়নই প্রতীক্‌রূপে গৃহীত।

'ফাল্গুনী' ঈষৎ পৃথক ভাবের নাটক। এই নাটকটির সঙ্গে মেটারলিঙ্কের 'ব্লু বার্ডে' সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

'ফাল্গুনী' নাটকে পাই মানবপ্রাণের বসন্ত সন্ধান, 'ব্লু বার্ডে' দেখি মানববুদ্ধির সাহায্যে আনন্দের সন্ধান। ফাল্গুনীর চরিত্রগুলি ধরণীর বিশেষ বিশেষ সত্তার প্রতীক, ব্লু বার্ডের কুশীলব এক-একটি জাতিগত সত্তার প্রতীক। 'রাজা', 'ডাকঘর' বা 'রক্তকরবী'র মত উচ্চাঙ্গের ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ নাটক নয় 'ফাল্গুনী'। 'অচলায়তন' নাটকও ব্যাখ্যাগম্য, উপলব্ধিগম্য স্তরে বিশেষ ওঠেনি। 'অচলায়তনে' প্রতীকধর্ম অপেক্ষা রূপক ধর্ম বা Allegorical দিকটি প্রধান হয়ে উঠেছে। তাসের দেশ সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য।

প্রতীক্ নাট্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে 'Suggestion is the indispensable and most efficient instrument of such an art'—এই জন্যই প্রতীক্ নাট্যের সংলাপ, পরিবেশ পরিকল্পনা অন্যবর্গের নাটক থেকে পৃথক হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাট্যের বৈশিষ্ট্য সংগীতের সাহায্যে গূঢ়সত্যটিকে ফুটিয়ে তোলা 'গান দিয়ে দ্বার খোলাব'—কবির এই উক্তি তাঁর 'শারদোৎসব' (১৩১৫) থেকে 'তাসের দেশ' (১৩৪০) পর্যন্ত সমভাবে সত্য।

—দে. ভ.

প্রবলেম্ নাটক (সমস্যা-নাটক বা সমস্যামূলক নাটক)—শেক্‌স্‌পীঅরের 'ট্রয়লাস-এণ্ড ক্রেসিডা', 'অলস্ ওয়েল্স্ দ্যাট্ এণ্ড্স্ ওয়েল' এবং 'মেজার ফর মেজার'-কে অনেক সময় 'ডার্ক কমেডি' এবং 'প্রবলেম্ কমেডি' বলা হয়। টিলিয়ার্ড এই শ্রেণীটিকে আরও একটু বিস্তৃত করেছেন এবং এই কমেডি তিনটি ছাড়াও একটি ট্রাজিডিকে হ্যামলেট্‌কে—তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেই সূত্রে তিনি শ্রেণীটির নাম বদলে রেখেছেন—'প্রবলেম প্লে।'

ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-নিরপেক্ষ সাধারণ নৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যা এবং তৎ-উদ্ভূত সমাজ-পরিস্থিতিই 'প্রবলেম প্লে' বা সমস্যা-নাটকের উপজীব্য। এল্. জে. পট্‌স্ সংজ্ঞাটিকে চমৎকার গুছিয়ে বলেছেন। তাঁর মতে প্রবলেম প্লে 'treat the situations that arise in society simply as moral or political problems, in the abstract and without reference to the idosyncrasies of human nature'. পট্‌স্-এর উদাহরণ—'প্রাক্তরীম্যান্', 'ট্রয়লাস এণ্ড ক্রেসিডা' এবং গলস্‌ওয়ার্দির নাটকগুলি।

টিলিয়ার্ড পট্স্‌-এর এই সংজ্ঞা মোটামুটি মানেন। কিন্তু তাঁর মতে এই সংজ্ঞা অতিরিক্ত যথাযথ। এই সংজ্ঞাকে একটু ঢিলেঢালা করে নেওয়ার পক্ষপাতী তিনি, যাতে অন্য আরো দু'একটি নাটক সমস্যা-নাটক বলে গৃহীত হতে পারে। টিলিয়ার্ড হ্যামলেটকেও সমস্যা-নাটক বলেন। দ্রষ্টব্য : W. W. Lawrence, Shakespeare's Problem Comedies (New York, 1931) E. M. W. Tillyard, Shakespeare's Problem Plays (London, 1950). —চি. ঘো.

প্রহসন (ফার্স)—ফার্স বা প্রহসনের সঙ্গে কমেডির আপেক্ষিক সাদৃশ্য কল্পনা করা চলে ; কারণ এই দুই শ্রেণীর নাটককেই হাস্যরসোদ্দীপক লঘু রচনা বলা হয়। প্রাণচঞ্চল প্রসন্ন বিষয় ও মানবজীবনের অসংগতি নিয়ে এদের কাহিনী গড়ে ওঠে। উভয় ক্ষেত্রেই সামগ্রিক কাহিনী ও কোন কোন চরিত্রের মধ্য দিয়ে কখনও ব'ন'ন'ন বিশিষ্ট কোন ভাব-সত্য বা আদর্শ উন্মোচিত হয়ে উঠলেও তা গভীর ও গাম্ভীযবোধক হয না। যে কারণে ফার্স বা কমেডির কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ও দৃশ্য অঙ্কনের নৈপুণ্য এমন হওয়া উচিত যা হাস্য, ব্যঙ্গ, রঙ্গ ও কৌতুক রস-ব্যঞ্জনায় পাঠক বা দর্শক সাধারণকে উদ্দীপিত কবে তোলে। আবার মানবজীবন ও ঘটনার উপরিতলচারী ভাব-ভাবনা, অনুভব-অনুভূতি ফার্স বা কমেডিব পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কোথাও ছায়া ফেললেও কখনও তা নিরবয়ব ও সূক্ষ্ম হয়ে দেখা দেয় না।

এই কারণে কমেডির সঙ্গে ফার্সের মূলগত পার্থক্য অনেকটাই ম াগত ও পরিণামগত। মাত্রাব বিচারে ফার্স যতখানি স্থূলত্বধর্মী রচনা, কমেডি ততখানি নয়। আর পরিণামগত বিচারে কমেডি যতখানি সাহিত্য হিসাবে মূল্যবান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত, ফার্স বা প্রহসন ততখানি নয়। তাহলেও ফার্স বা প্রহসনেরও যে একটা মূল্য আছে, তার সাক্ষ্য ইতিহাস। সপ্তদশ শতকে এবং তারও পরে ইংরেজী কোন কোন কমেডিতে ফার্সের বৈশিষ্ট্য স্বল্পাধিক পরিমাণে প্রতিবিম্বিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত আকারের অপূর্ণাংগ ফার্স লেখা শুরু হয়ে যায়। আধুনিক যুগে সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ ফার্স বা প্রহসন—নাটিকার আবির্ভাব হতে থাকে স্বীয় মর্যাদায়। 'I rce during the 19th and 20th C. has thus, in effect, resumed its original status as elemental comedy of physical action'.

ফার্স বা প্রহসনে বাহ্য ঘটনার উদ্ভট অতিচার, নাটকীয় অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টিতে অদ্ভুতত্ব, ঘটনার উপর রঙ্ চড়ানোর অতিরঞ্জন, পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়া ও কার্যকলাপে অস্বাভাবিকতা এবং তাদের সংলাপে 'পান' (Pun)-এর আতিশয্য, তাদের কথা-বলার অদ্ভুত ভঙ্গিমায় পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের সংকেত-করণ (allusion), ও ভাঁড়ামিও লক্ষ্য করা যায়। 'Farce generally means low comedy, intended solely to provoke laughter through gestures, buffoonery action, or situation, as opposed to comedy of character or manners.' সার্কাসেব ভাঁড় (ক্লাউন) তার আচার-আচরণ, কথা-বলা, চলা-ফেরা ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে অদ্ভুত-উদ্ভট সব ভঙ্গি ও ভঙ্গিমার প্রদর্শন করে দর্শকদেব একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মধ্যে হাসির তুফান তোলে এবং হৈ-হুল্লোড ও হাসি-ঠাট্টার মধ্যে সকলকে হাসির উদ্ভাসে উদ্ভাসিত ও উদ্দীপ্ত রাখে। ফার্স বা প্রহসনেব প্রাথমিক উদ্দেশ্য অনেকাংশে এই প্রকৃতির হলেও, ফার্স নিছক ভাঁড়ামি বা নিছক 'ক্যারিকেচার' নয়। ফার্সের আংশিক সাদৃশ্য কল্পনা একমাত্র কমেডির সঙ্গেই করা যেতে পাবে। অতএব হাস্যরসবিহীন কেবল অশ্লীল প্রলাপ ও ভাঁড়ামোই প্রহসন নয়। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা যুক্ত প্রহসনেব দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করা হযত দুরূহ নয়। কিন্তু অল্পবিস্তর বাংলা প্রহসনের অনেকগুলিকেই ঐ দোষে দুষ্ট করা গেলেও যেখানে প্রহসনের প্রসারিত হাসি, কৌতুক ও রঙ্গ-ব্যঙ্গ সকল গৌণ অশ্লীলতা কদর্যতার উর্ধ্বে আপন দ্যুতি ও দীপ্তি বিকীরণ করে পাঠক ও দর্শকের হৃদয় এবং বুদ্ধি উজ্জীবিত করে তোলে, সেখানে প্রহসন তার নিজস্ব সংজ্ঞায় সুচিহ্নিত হয়ে ওঠে। মনে হয়, এমন সাধ্য সাধন কবা অল্প আয়াস সাপেক্ষ। মনে হতে পারে, 'কয়েকটা হাস্যজনক কথা একত্র করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু বস্তুত সে জ্ঞান প্রকৃত সিদ্ধ নহে। ঐশী শক্তি না থাকিলে যে প্রকার প্রকৃত কবি হওয়া অসাধ্য, বিশেষ ও অসাধারণ কল্পনা—শক্তি ও রসবোধ, ও প্রত্যুতপন্নমতিতা না থাকিলে সেইরূপ উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করাও দুষ্কর'—'রহস্য সন্দর্ভে' লিখিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রহসন সম্পর্কে উদ্ধৃত বক্তব্য স্মরণীয়।

বাংলায় উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনার প্রাথমিক পরিচয় ও নজির হিসাবে গণ্য করা চলে, মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে

রোঁ'। প্রথমটির মধ্যে তৎকালীন নব্যযুব-সম্প্রদায়ের নৈতিক অনাচার ও বাহ্যিক উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র যেমন নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি দ্বিতীয়টির ভিতর তৎকালীন ধনী-বৃদ্ধ ও কপটাচারী জমিদারদের ধনলিপ্সা ও কাম-পিপাসার নিপুণ চিত্র স্থান পেয়েছে। এই দুটি নাটিকা এক অর্থে সমাজ-সমালোচনার ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন। এছাড়া দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'চিরকুমার সভা' উৎকৃষ্ট প্রহসনের উদাহরণ হিসাবে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা চলে। —দি কু গু.

প্রোলোগ—আরিষ্টটল ট্রাজিডির গঠন আলোচনা করতে গিয়ে প্রোলোগ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কোরাসের প্রথম উক্তি, আরিষ্টটল যাকে Parode বলেছেন, তা সুরু হওয়ার আগে প্রোলোগের অবস্থান। প্রোলোগ বলতে এখন নাটকের 'প্রস্তাবনা' অংশ বোঝানো হয়। প্রথম অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য অভিনয় আরম্ভ হওয়ার আগে দর্শকদের উদ্দেশ করে, নাটকীয় কাহিনীর আভাস দান। শেক্‌সপীয়রের খুব কম নাটকেই প্রোলোগের ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর মাত্র তিনটি নাটকে প্রোলোগ আছে, 'কিং হেনরী দি এইটথ্' ('I come no more to make you laugh :⋯'), 'ট্রয়লাস এ্যাণ্ড ক্রেসিডা' ('In Troy there lies the scene⋯') এবং 'রোমিও জুলিয়েট' (কোরাসের মুখে 'Two households, both alike in dignity⋯')। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' নাটকের 'প্রস্তাবনা' অংশটুকু প্রোলোগরূপে গ্রহণ করতে পারি: 'ওই যে বিরাট আকাশ পুলক/ওই যে তারার স্ফুরণ—/কোথায় তাদের কণক কিরণ/কাহারে করিছে অন্বেষণ?/ওই যে ব্যাকুল সিন্ধু—/সঞ্চিত ওই, সঞ্চিত ওই, সঞ্চিত নাদ-বিন্দু—/কাহার সূচনা, কাহার রচনা, কাহার অনাদি সম্বোধন?/দৈব কিংবা পুরুষকার—/বিশ্বরাজ্য কোন রাজার?/কাহার বিরাট্, কাহার স্বরাট্।/কাহার প্রকাশ—সঙ্গোপন?/দৈব কিংবা পুরুষকার—/নিদান, বিধান কোন্ রাজার,/কর্মসাক্ষী বিজয়লক্ষ্মী/কোন্ মহানে করে বরণ?' —অ. বা.

প্লট—দ্রঃ নাটকের ষড়ঙ্গ।

প্যাশন প্লে—দ্রঃ মিষ্ট্রি, মিরাক্‌ল, ইণ্টারলুড।

ফলিং অ্যাক্‌সন—দ্রঃ নাটকের গঠন (পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্র)।

ফার্স—দ্রঃ প্রহসন।

বাংলা নাটকের গতিপ্রকৃতি—বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নিজস্ব একটা সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। বাঙ্গালীর নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে, তার বলিষ্ঠ একটি জাতীয় ধর্ম আছে। তার রসবোধ তার জাতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার সামাজিক জীবন দ্বারাই তা গঠিত। পাশ্চাত্ত্য আদর্শ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার পক্ষে এইখানেই তার বাধা। যে সামাজিক পরিবেশ ও জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে নাটক রচিত হয়ে থাকে, তা দেশ ও কাল সাপেক্ষ বলেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে নীত হয়ে নূতন পরিবেশের মধ্যে তা নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারে না।

বিশেষতঃ বাঙ্গালী নাট্যকারদের সামনে এই বিষয়ে পূর্ববর্তী কোনই আদর্শ বর্তমান ছিল না, তাও নয়। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে এ বিষয়ে দুটি ধারাই প্রচলিত—একটি সংস্কৃত নাটকের ধারা, আর একটি দেশীয় যাত্রার ধারা। উনবিংশ শতাব্দীতে নব্য ইংবেজি শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের পরিচয় লাভ করলো, তখন নিজের দেশের বিশিষ্ট এই দুইটি নাট্যধারার প্রতিও তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বিশেষতঃ দেখতে পাওয়া যায়, বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম যুগে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক দুইই সমানভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে এবং সেই যুগের বাংলা নাটকে অঙ্গিকের দিক দিয়ে সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটক উভয়ই সমান প্রভাব বিস্তার কবে। ক্রমে সেই যুগের বাংলা নাট্যরচনার দুইটি ধারা কিছুকালের জন্য স্বতন্ত্র হয়ে যায়— তারপর বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের শেষভাগে গিয়ে এই দুইটি ধারা পুনরায় একাকার হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজি প্রভাবের প্রথম যুগ থেকেই বাংলা নাট্যরচনায় দেশীয় প্রভাবটি অত্যন্ত সক্রিয় ছিল এবং তার প্রভাব ইংরেজি ধারার মধ্যে কোনদিনই একেবারে নিশ্চিহ্ন হযে যায়নি। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আদিযুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কোন নাট্যকারই এই সংস্কারের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করতে পারেন নি।

নাটক মাত্রেরই উপজীব্য বাস্তব জীবন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শনে যে মৌলিক পার্থক্য আছে, তার ফলে স্বভাবতঃই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নাটকে প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শনের আদর্শে ব্যবহারিক

জীবনকে অতিক্রম করে জীবনের আর কোনও মূল্য নেই—মৃত্যুতেই জীবনের চরম সমাপ্তি ; সেইজন্য তা'তে মৃত্যুদ্বারা ট্রাজিডি এবং মিলন দ্বারা কমেডি সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রাচ্যের জীবনাদর্শ স্বতন্ত্র। তার মতে মৃত্যুতে প্রত্যক্ষ জীবনের বিচ্ছেদ পড়লেও, পরোক্ষ বলেও একটা জীবন সে স্বীকার করে এবং সেই পরোক্ষ জীবনের উপর লক্ষ্য রেখে, তার প্রত্যক্ষ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পরলোক ও পরজন্ম এদেশের লোকের কেবলমাত্র মুখের কথা নয়, ইহা তার আচরিত ধর্ম ও ব্যবহারিক সংস্কারের মধ্যেও সুদৃঢ় শিকড় গেড়ে তার প্রত্যক্ষ জীবন নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে। পারলৌকিক জীবন ঐহিক জীবনেরই অনুবৃত্তি মাত্র—সেখানেও মিলন আছে, ভোগ আছে, সৎকর্মেব পুরস্কার আছে। এই বোধ যেখানে একান্ত সত্য, সেখানে মৃত্যু কখনও জীবনের সমাপ্তি এনে দেয় বলে মনে হতে পারে না ; তাতে মৃত্যুর মধ্যেও একটা পরম সান্ত্বনার অবকাশ থেকে যায়। সেইজন্য সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ট্রাজিডির স্থান নেই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জীবন-দর্শনে মৃত্যুর আর কোনও সান্ত্বনা নেই—মৃত্যু চরম বিচ্ছেদ, সেইজন্য এর প্রতিক্রিয়াও তীব্রতম। বিচ্ছেদের মধ্যে তীব্রতা যত বেশী, ট্রাজিডিও তত গভীর হয়। অতএব, ক্রমাগত পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে প্রাচ্যের জীবন ধারার যত দিন পবিবর্তন না হয়, ততদিন পর্যন্ত পরিপূর্ণ পাশ্চাত্ত্য আদর্শে বাংলা ট্রাজিডি রচিত হওয়া সম্ভব নয়।

বাঙ্গালীব জীবন প্রধানতঃ অন্তর্মুখী , তার সমাজ স্ত্রী-চরিত্র-প্রধান বলে বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হতে পারেনি, কেউ কেউ এমন অনুমান করেছেন। কিন্তু নাটকের মধ্যে পুরুষোচিত নাট্যিক ক্রিয়ার (dramatic action) বাহুল্য এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজ দর্শকদের মধ্যে রুচিকর বলে বোধ হলেও, পরবর্তী যুগ থেকেই তাঁদের মধ্যে এই বিষয়ে রুচির পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চের উপর ঢাল-তলোয়ার নিয়ে লম্ফঝম্প, কামান-বন্দুকের গর্জন ও অন্যান্য লোমহর্ষক এবং অতি-নাট্যিক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ উত্থানপতন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাটকের উপজীব্য নয় , ক্রিয়াবাহুল্যহীনতা সত্ত্বেও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাটক শ্রেষ্ঠতা লাভ করতে পেরেছে। অতএব বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের তথাকথিত অন্তর্মুখিনতার জন্য বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হতে পারেনি, এ কথা বলা যেতে পারে না। ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যযুগে যখন

'ক্রুসেড' ও 'শিভ্যালরি' পৌরুষের আদর্শ ছিল, তখন স্বভাবতই এদের প্রভাব তার নাট্য সাহিত্যে গিয়ে পড়েছিল; কিন্তু আধুনিক যুগে য়োরোপের সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যসাহিত্যেও তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছে। এখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত মন নাট্যাভিনয়ের মধ্যে নাট্যিক ক্রিয়ার বাহুল্যকে গ্রাম্যতা (vulgarity) বা বর্বরতা বলে মনে করে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাট্যসাহিত্য সমসাময়িক কালের ইংরেজি নাট্যসাহিত্য কর্তৃক প্রভাবান্বিত না হয়ে বরং এলিজাবেথীয় যুগের বিশেষতঃ শেক্‌সপীঅরের ক্রিয়াবহুল নাটকগুলি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল বলে, তদানীন্তন বাংলা নাটকেও ক্রিয়া-বাহুল্যের দিকটিই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তারই ফলে এই ক্রিয়া-বাহুল্যকেই কেউ কেউ নাটকের অপরিহার্য আদর্শ বলে ভুল করেছেন।

সাম্প্রতিক বাংলা নাটক বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে নেবার প্রয়াস পাচ্ছে। যে কল্পনা এবং ভাববিলাসিতা এতকাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের অগ্রগতির পথে বাধা দিয়ে এসেছে, তা দূর হয়ে গিয়ে আজ এক সুকঠিন বাস্তব-জীবনবোধ বাংলা নাটকের উপজীব্য হয়েছে। প্রায় একশত বৎসর পর বাংলা নাটক আজ তার নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং বাংলা নাট্য-সাহিত্যের নবযুগের অরুণোদয় আসন্ন হয়ে এসেছে বলে মনে করা যেতে পারে। —আ তো. ভ

বিদূষক—সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কতকগুলি বিশেষ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়। এই চরিত্রগুলি সাধারণতঃ বিদূষক, শকার, বিট, চেট প্রভৃতি নামে অভিহিত। তন্মধ্যে বিদূষক চরিত্রটি সর্বত্রই ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃত। অন্যান্য চরিত্রগুলি নীচকুলোদ্ভব বা চারিত্রিক দোষদুষ্ট। বিদূষক চরিত্রটি সর্বত্রই আরামপ্রিয়, ভোজনপটু, লোভী, বামন, বিকৃতদেহ এবং নায়কের একান্ত বিশ্বস্ত সহচর ও নর্মসচিব বলে চিত্রিত। নাট্যশাস্ত্রকৃৎ ভরতমুনি-প্রদত্ত লক্ষণ থেকে বিদূষকের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়—

বামনো দন্তরঃ কুব্জো দ্বিজন্মা বিকৃতাননঃ।
অন্তঃ পুরচরো রাজ্ঞাং নর্মামাত্যঃ প্রকীর্তিতঃ॥

উপর্যুক্ত লক্ষণ থেকে অনুমান করা যায়, যে এই ব্রাহ্মণ হাস্যকর বেশভূষা, বিকৃতস্বর এবং অঙ্গভঙ্গী দ্বারা এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেন যা দর্শক মনে হাস্যরসের উদ্রেক করে। নাটকে বিরহের সুরকে বিদূষক অনেকখানি হাল্‌কা

করে নায়ক নায়িকার জীবনে মিলনের দূত হিসাবে আবির্ভূত হন। বিদূষক যেমন একদিকে রসিক এবং বিচক্ষণ অন্যদিকে তেমনি সমব্যথী ও কর্তব্যপরায়ণ। তাই সংস্কৃত প্রেমমধুর মিলনান্তক নাটকগুলিতে এই সহৃদয় ব্রাহ্মণের একটি বিশিষ্ট স্থান পরিলক্ষিত হয়। যেমন কালিদাসের শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকত্রয়ে, শ্রীহর্ষের প্রিয়দর্শিকা, রত্নাবলী, নাগানন্দ নাটকে, ভাসের উদয়ন রাজ কাহিনী ভিত্তিক নাটকে, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক ও অশ্বঘোষের নাটকে এবং রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতি নাটকে বিদূষকের চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ থাকতে দেখা যায়। কিন্তু বীররস প্রধান নাটকে—যেমন ভাসেব রামায়ণ ও মহাভারতসম্ভূত নাটকচক্রে, ভবভূতির রামায়ণ-ভিত্তিক উত্তর রামচরিত নাটকে, ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকে, বিশাখ দত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকে বিদূষক একান্তই অনাদৃত। মিলনান্ত নাটকে বিদূষক চরিত্র সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করলেও ভবভূতির মালতীমাধব নাটকে অপাংক্তেয়। একটি ব্রাহ্মণ চরিত্রকে হাস্যাস্পদ, বাচাল, মাণবক প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করতে তিনি অসম্মত। এইভাবে স্বীয় ব্রাহ্মণত্বকে হীন প্রতিপন্ন করা ভবভূতির রুচি বিরুদ্ধ। তাই স্থূলহস্তাবলেপে তিনি কবি-পরম্পরা প্রাপ্ত চরিত্রটিকে মুছে ফেলেছেন।

বিদূষকের সাধারণতঃ বসন্তকাল বা কোন ফুলেব নামানুসাবে নামকরণ হযে থাকে। বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণে' বলা হয়েছে—

কুসুম বসন্তাদ্যভিধঃ কর্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎ স্ব কর্মজ্ঞঃ॥

ভাসের উদয়ন কাহিনী লব্ধ নাটকে ও শ্রীহর্ষের রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা-তে বিদূষকের বিশেষ নাম বসন্তক; অশ্বঘোষের নাটকে কৌমুদগন্ধ। এই নাটকগুলি বিদূষকেব নামকরণ ব্যাপারে নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ মেনেছে। কিন্তু কালিদাস, শূদ্রক ও রাজশেখরের রচনায় নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ অস্বীকৃত। যেমন কালিদাসের শকুন্তলা—বিক্রমোর্বশী—মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকত্রয়ে যথাক্রমে মাধব্য—মাণবক ও গৌতম, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে মৈত্রেয়, শ্রীহর্ষের নাগানন্দে আত্রেয় এবং রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরীতে কপিঞ্জল নামে বিদূষক পরিচিত।

এই সমস্ত নাটকে বিদূষক চরিত্র নামের দিক দিয়ে পৃথক হলেও, ভাবের দিক দিয়ে ঐক্য রক্ষা করেছে। চটুলতা, চপলতা ও খর্বাকৃতির জন্য কোথায়

পিঙ্গল বানর, দুষ্ট বানর, কপিলমর্কটক নামে উপস্থাপিত চরিত্রটি জীবনের লাভক্ষতির ঊর্ধ্বচারী নিরঙ্কুশ পরহিতৈষণার জগতে আপনাকে বিলীন করে ব্রহ্মস্বাদসহোদর আনন্দসাগরে দর্শককে নিমজ্জিত করে।

বাংলা পৌরাণিক নাটকেও বিদূষক চরিত্রের ব্যবহার দেখা যায়। (দ্রঃ গিরিশচন্দ্রের 'জনা')। তবে অধিকাংশ বাংলা নাটকে একধরণের চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে যা সংস্কৃত নাটকের 'বিদূষক' ও ইংরেজী নাটকের 'ফুলে'র (Fool) সংমিশ্রণ। —ভ. ভ.

বিন্দু—দ্রঃ নাটকের গঠন (সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র)।

বিমর্ষ সন্ধি— ঐ

বীজ— ঐ

মনন—দ্রঃ নাটকের ষড়ঙ্গ।

মর‍্যালিটি—দ্রঃ মিষ্ট্রি।

মিরাকল্‌—দ্রঃ মিষ্ট্রি।

মিস্ট্রি, মিরাকল, মর‍্যালিটি এবং ইণ্টারলুড নাটক—য়োরোপে আধুনিক নাট্যকলার ইতিহাসে মধ্যযুগের মিস্ট্রি, মিরাকল, মর‍্যালিটি এবং ইণ্টারলুড নাটকের স্থান অতিশয় গুরুত্বপুর্ণ। এগুলির উদ্ভবের প্রেরণা হিসাবে মধ্যযুগের গীর্জাগুলির ধর্মীয় অনুষ্ঠান মূলতঃ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে, য়োরোপ প্রাচীন ক্লাসিকাল নাট্যকলার ধারা এই গীর্জার অনুশাসনে অস্তংগমিত হয়ে যায়। গ্রীক্‌ নাট্যকলার ধারাকে অনুসরণ করে রোমক সভ্যতার অভ্যুদয়ের যুগে রোমে প্রাচীন ক্লাসিকাল নাট্যকলার আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এই নাটকের ধারা ইটালীতে খুব বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। বরং ভাট, ভাঁড, বা চারণ বা বিচিত্র বেশ ও মুখোসধারী 'মাইম্‌স্‌' (Mimes)-গণ ধনীদের প্রাসাদে, পণ্যবিক্রয়কেন্দ্রে বা মেলায় বিচিত্র রঙীণ পোষাকে সজ্জিত হয়ে নৃত্যগীতের ভঙ্গীতে 'ত্রোবাদুর' (troubadours) প্রেমকাহিনী বা অন্যান্য গল্প বলে গণ-মানসে আনন্দের সঞ্চার করতো। এই কৌতুক-নক্সা জাতীয় গল্প কাহিনীগুলি বা এগুলির প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে কিছুটা শালীনতা বা নীতিবোধের অভাব ছিল—ফলে জনসাধারণ ক্লাসিকধর্মী রোমান ট্রাজিডি কমেডির চেয়ে এগুলির

(mimic) প্রতি আকৃষ্ট হত বেশী। রোমক সভ্যতার পতনের সঙ্গে প্রাচীন ক্লাসিকাল নাট্যকলার ধারা বা লোকায়ত স্থূল কাহিনী পরিবেষণের নাটকীয় কৌশলগুলি স্তব্ধ হয়ে যায় প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের উপর বর্বর বা টিউটনিক অভিযান। নতুন বিজেতাশ্রেণী এই সমস্ত অভিনয়কলাকে কোন দিনই সুনজরে দেখেন নি। এছাড়া রাজনৈতিক উত্থান পতন, দেশান্তরীকরণ সমস্যা (migration of people), গীর্জার কোন্দল—এই ঝড়ঝঞ্ঝার পরিবেশে কোন নাট্যআন্দোলনের ধারার সুষ্ঠু বিকাশলাভ সম্ভবপর ছিল না। দ্বিতীয়তঃ নবোদিত খ্রীষ্টানধর্ম একদিকে প্রাচীন ক্লাসিকাল নাট্যকলার অনুবর্তনের বিরোধী ছিল, কারণ গ্রীক্ প্রাকৃত-জীবনচেতনা (Paganism) ও খ্রীষ্টানধর্মের ঈশ্বরবাদী জীবনবোধ তত্ত্বগত ও আচরণগত এই উভয় দিক দিয়েই বিপরীত কোটিতে অবস্থিত ; অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রচলিত সস্তা ভাঁড়ামির অশালীনতা ও অমার্জিত অভিনয় কলা খ্রীষ্টান নীতিবোধের পক্ষে পীড়াদায়ক ছিল। ফলে রাজনৈতিক এবং গীর্জার অনুশাসনে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের মধ্যেই য়োরোপে সর্বপ্রকার নাট্য আন্দোলনের ধারা, অভিনয়শিল্প, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি একরকম বন্ধ হয়ে যায়। এর পর প্রায় দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী ধরে চলে য়োরোপের ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগ, নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসেও বটে। অবশ্য একথা ঠিক যে, যদিও এই অন্ধকারময় যুগে কোন সুষ্ঠু নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি—তবুও রাজকীয় এবং গীর্জার অনুশাসনকে উপেক্ষা করে একটা ক্ষীণ অভিনয়কলার ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো য়োরোপের জনজীবনের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল ভ্রাম্যমান বিচিত্র বেশভূষা ও মুখোসধারী অভিনেতাদের (Mimes) মাধ্যমে।

(ক) **মিস্ট্রি নাটক** ঃ—মধ্যযুগে য়োরোপে রোমান নাট্য আন্দোলনের ধারা অস্তমিত হবার প্রায় পাঁচ শতাব্দী পর, অর্থাৎ একাদশ শতাব্দী থেকে মিষ্ট্রি, মিরাক্‌ল ইত্যাদি যে নতুন নাট্য ধারার উদ্ভব হলো তা রোমান নাট্যকলা থেকে অনুসৃত হয়নি। বিস্ময়ের কথা এই যে, যে গীর্জার অনুশাসনে রোমান নাটককের ধারার অকালমৃত্যু ঘটেছে, সেই গীর্জার ধর্মীয় পরিবেশেই য়োরোপে মিষ্ট্রি ইত্যাদি নতুন নাট্যকলার বীজ উপ্ত হলো। এর মূল প্রেরণা ছিল অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বা সদ্যদীক্ষিত খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বীদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস উজ্জীবিত করা। গীর্জার বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করে এই নতুন

নাট্য আন্দোলনের ধারার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। বাইবেলের মন্ত্রপাঠ (Liturgy) থেকে এর জন্ম, খ্রীষ্টভোজের (Mass) পবিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর বিকাশ এবং অতঃপর উষালগ্নের প্রথম প্রার্থনা সঙ্গীত অনুষ্ঠানের (Matins) শিথিল রূপের মধ্যে এই নাট্যকলার পরিণতিসাধন ঘটেছে। ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেণ্টে বর্ণিত খ্রীষ্ট জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা—যথা, জন্ম (Nativity), মৃত্যু (Passion) ও পুনর্জন্মের (Ressurcetion), কাহিনী রূপদানের মাধ্যমে মানবজীবনের মুক্তিসাধনার (Redemption) রহস্যকে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আর এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে আধুনিক নাটকের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

যদিও প্রথমদিকে খ্রীষ্ট-ভোজ অনুষ্ঠানের (Mass) মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে পুঁথিগত বিচ্যুতি ঘটা নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি কালক্রমে এর মধ্যে সংগীত, কিছু কিছু সংলাপ, কিছু কিছু বা ব্যাখ্যা ও বিবৃতি অনুপ্রবিষ্ট হতে লাগল। বস্তুতঃ বাইবেলের মন্ত্রোচ্চারণ অনুষ্ঠানের মধ্যে যে পরবর্তীকালের নাটকীয় উপাদান নিহিত ছিল তা বিখ্যাত "*Quem quaerities*" (Whom seek ye) নামক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মার্ক বা ম্যাথু লিখিত সুসমাচারে (Gospel of St. Mark বা Matthew) বর্ণিত সমাধিক্ষেত্র, তার রক্ষক দেবদূত এবং খ্রীষ্টান নারীসত্তার প্রতীক ত্রয়ী মেরীর (Three Marys—Mary Madgalen, Mary Major এবং Mary, mother of James) কাহিনীটির গীর্জাকর্তৃক অভিনীত রূপ এই যে, একটি বস্ত্রাবৃত ক্রুশশোভিত বেদীর পার্শ্বে একজন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত পুরোহিত উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় অন্য তিনজন পুরোহিত তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'*Quem quaerities in sepulchro,O Christicolace ?*' (Whom sick ye in the sepulchre, O Christians ?)। এর উত্তরে অন্য তিনজন একসঙ্গে উত্তর দিলেন—'*Jesum Nazarenum crucifixum, O Carelicolae.*' (Jessus of Nazareth who was crucified, O Augels !)। তখন ক্রুস থেকে বস্ত্রখণ্ড উত্তোলন করে প্রথম পুরোহিত বল্লেন—'*Non est hic, surrexit sicut praedixerat ; Ite, mentiate quia surrexit de sepulchro.*' (He is not here ; He has arisen as he foretold ; Go, announce that he has arisen from the

grave.)। বস্তুতঃ এটি সংক্ষিপ্ত হলেও এর মধ্যে নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে নিহিত আছে—কাহিনী, স্থান, সংলাপ, চরিত্র ইত্যাদি উপাদানে এটি নাটকীয় মর্যাদা পাবার উপযুক্ত।

এই '*Quem quaerities*' (Whom seek ye) অনুষ্ঠানটি বা নাট্যকলার এই অপরিণত অংশটি পরবর্তীকালে, খুব সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীতে, খ্রীষ্ট-ভোজ অনুষ্ঠান (Mass) থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং খ্রীষ্ট জন্মদিবস অনুষ্ঠানের প্রাতঃকালীন সংগীত (Matius on Eastern morning) উপলক্ষে স্বতন্ত্রভাবে অভিনীত হতে থাকে। এই সময় অভিনযকলা পূর্ববর্তী স্তর অপেক্ষা অনেক পারদর্শিতা লাভ করে, ফলে আগেকার আড়ষ্টতা বর্জিত হয়ে বর্তমান অভিনয় অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক হতে পেরেছিল। অভিনয় অনুষ্ঠান সংগীতানুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন ও ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে গীর্জার অভ্যন্তর থেকে বহিরাঙ্গণে স্থানান্তরিত হলো। সমাধিস্থান নির্দেশক একটি মঞ্চ তৈরী করা হলো। একই সঙ্গে কতকগুলি অতিরিক্ত দৃশ্যের অবতারণা করা হলো—একটি উদ্যানের দৃশ্য, অন্যটি একজন সুগন্ধি-বিক্রেতার দৃশ্য, যার কাছ থেকে মেরী-ত্রয় শবদেহ সুগন্ধ করবার জন্য সুগন্ধি তেল কিনেছিলেন। এই অতিরিক্ত দৃশ্যগুলির জন্য নতুন সংলাপ রচিত হলো এবং যেহেতু সমগ্র অনুষ্ঠানটি একটা শোভাযাত্রা সহকারে পালন করা হতো, অতএব প্রয়োজনমত গীর্জার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের মঞ্চ তৈরী করা হতো। সুগন্ধি-বিক্রেতার দৃশ্যটি অনুষ্ঠানটির মধ্যে কমেডির আবহাওয়া সৃষ্টি করতো।

খ্রীষ্ট জন্মদিবস অনুষ্ঠান (Easter) ছাড়াও, খ্রীষ্ট-তিরোভাব দিবস (Christmas) পালন করা উপলক্ষে বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা করা হতো। সেখানে বাইবেল কথিত তারকানির্দেশিত পথ অনুসরণ করে পূর্বাঞ্চল থেকে আগত তিনজন জ্ঞানীর (Magi) আগমনদৃশ্যের অবতারণা করা হতো—বস্তুতঃ এই দৃশ্যটিতে নতুন চরিত্রের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে কমেডির পরিবেশ সৃষ্ট হতো। একই সঙ্গে বাইবেলের সেই অতি প্রত্যাশিত নির্যাতিত জাতির ভাবী মুক্তিদাতার (Messiah) আবির্ভাব-সম্ভাবনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপিত করা সুরু হয়। ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণীটির আক্ষরিক আবৃত্তি করে যেতেন যাজক। এইভাবে আরও, অন্যান্য চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল। এইভাবে ওল্ড টেস্টামেন্টের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে নিউ

টেস্টামেণ্টের খ্রীস্টের ক্রুসবিদ্ধ হবার কাহিনীগুলি (Passion Story) সংযুক্ত হয়ে গীর্জার পরিবেশে মিস্ট্রি নাটকের সৃষ্টি হয়।

এই জাতীয় ধর্মীয় নাটক বা মিস্ট্রি নাটক পশ্চিম য়োরোপের সর্বত্র প্রায় একই সময়ে বিকাশলাভ করে, বিশেষ করে উত্তর ফ্রান্সে এবং অ্যাঙ্‌লো-নর্মাণদের মধ্যে এই জাতীয় নাট্য আন্দোলন খ্যাতিলাভ করে। মধ্যযুগের কৃষিজীবী এবং নাগরিকরা সে সময় কোনরকম আনন্দোৎসব থেকে বঞ্চিত ছিল, কারণ তখনকার দিনের ভ্রাম্যমান '*Jougleur*'-গণ তাদের অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে এই ধরণের বৃহত্তর জনসাধাবণেব মনোরঞ্জনে প্রায়শঃই ব্যর্থ হতো। তাদেব কেতাদুরস্ত হাবভাব, লিমোসি ও ফরাসী (Limousin ও French) ভাষায় আলঙ্কারিক বাক্‌বিন্যাস অধিকাংশ অশিক্ষিত নরনারীর কাছে দুরূহ বলে মনে হতো। জনসাধারণ ববং এদের অতিপরিচিত গীর্জা পরিচালিত সুপরিচিত বাইবেল কাহিনীর লাতিন ভাষার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিকে বেশী পছন্দ করতো। প্রথমদিকে গীজার বিভিন্ন চিত্রগুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি ও শ্রুতি—এই উভয়ই পরিতৃপ্তি লাভ করলো—এবং অচিরাৎ বাইবেল জনসাধারণের কাছে একটা জীবন্ত সত্য বলে প্রতিভাত হলো।

এই জাতীয ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রথম ব্যাপক প্রচলিত মিস্ট্রি নাটকের নাম 'আদম' (Adam)—বইটি অংশত অ্যাঙ্‌লো-নর্মাণ ভাষায় এবং অংশত লাতিন ভাষায় রচিত। এই নাটকটি গীর্জাব অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হবার জন্য বচিত হয়নি। গীর্জার পশ্চিম দ্বারের বাইরে একটি বঙ্গমঞ্চ খাড়া করে সেখানে বাইবেলের উদ্যানদৃশ্যটিব অবতাবণা কবা হতো, কিছুদূরে নবকদৃশ্যটির জন্য স্বতন্ত্র একটি মঞ্চ তৈরী করা হতো—মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় অন্যান্য সাধারণ দৃশ্যের অবতারণা করা হতো—এবং গীর্জার সম্মুখভাগের সুবিস্তৃত জায়গাটি দর্শকদের জন্য সুনির্দিষ্ট ছিল। 'আদম' নাটকটির মধ্যে ঈশ্বর আদম, ইভ—প্রত্যেকের গতিবিধির সুনির্দিষ্ট মঞ্চনির্দেশ দেওয়া আছে।

মধ্যযুগের এই নতুন নাটক গীর্জার পরিবেশে জন্মগ্রহণ করলেও, ক্রমশঃ তা যাজক সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকারের বাইরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কারণ একদিকে যেমন নতুন নতুন নাটকীয় দৃশ্য, চরিত্র, কাহিনীর উদ্ভব হচ্ছে, সেই অনুপাতে যাজক সম্প্রদায়ের নিজেদের লোকদ্বারা সমস্ত চরিত্রগুলির অভিনয় করা সম্ভব হয়ে উঠতো না, অধিকন্তু যে সমস্ত শয়তানের অনুচরগণ

রঙ্গমঞ্চের সামনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছুটোছুটি করতো বা যারা নরকে আদম ও ইভকে কাংস্যক্রেঙ্কারধ্বনির সাহায্যে উত্যক্ত করতো—সেই জাতীয় চরিত্রগুলি অভিনয় করতে যাজকসম্প্রদায় নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। ইতিমধ্যে নাগরিকদের মধ্যে কিছু লোক প্রধান প্রধান ভূমিকায় এবং ছোট ছোট ছেলেরা শয়তানের অনুচরদের ভূমিকায় অভিনয় করা সুরু করেছে—এবং এই জাতীয় অভিনয় ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীশ্রেণীর ব্যক্তিদের আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানে লক্ষ্য করা গেল। ফ্রান্সে এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় এক বিশেষ সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ শ্রেণীর (Confréries) দ্বারা এবং ইটালীতে কোন সাধু-সন্তের অনুগত ভক্ত তরুণ গোষ্ঠীর দ্বারা এই অভিনয় কায সম্পাদিত হতে লাগল। নাটকগুলি রচনার ভারও শেষপর্যন্ত সাধারণ লোকের হাতে চলে এলো—এবং ফলে তীব্র ব্যঙ্গরস, বিস্তৃত হাস্যরস এবং কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বিষয়বস্তুর অবতারণা দেখা গেল—যেগুলির কিছু অংশকে নেহাৎ সৌজন্যের খাতিরে পবিত্র আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

(খ) **মিরাক্ল নাটক** :—ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে নাটকের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত হয়ে পড়ল। বিভিন্ন সাধু-সন্তদের অলৌকিক জীবন-কাহিনী অবলম্বনে যে সমস্ত কাহিনী ধর্মীয় নাটকের মধ্যে স্থান লাভ করতে লাগল—সেগুলিই য়োরোপীয় সাহিত্যে মিরাক্ল নাটক বলে অভিহিত হয়। এগুলির মধ্যে কাহিনী ও ঘটনানির্বাচনে যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। এই মিরাক্ল শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফরাসী দেশের জঁা বদেল (Jean Bodel) রচিত ক্রুসেডদের রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে '*Jen de Saint Nicholas*' (১২০০ খ্রীঃ) নাটক এবং রুতেবিউফ (Rutebeuf) রচিত '*Le Mircele de Thiophile*' (১২৮৪ খ্রীঃ)—এই নাটকটির বিষয়বস্তু হচ্ছে শয়তানের কাছে আত্মবিক্রীত মানুষের কথা, যার জন্য কুমারী মাতা (Virgin Mary) পরে শয়তানের কাছ থেকে সেই বিক্রীত আত্মা অপহরণ করে নিয়ে আসে। অন্যান্য নাটকের মত এই নাটকেও, অলৌকিক কাহিনী ধর্ম নিরপেক্ষ অন্যান্য উপকাহিনীর জোয়ারে ভেসে গেছে। এমন কি অন্যান্য দু'একটি নাটকে এই অলৌকিক প্রসঙ্গ অত্যন্ত স্তিমিতভাবে উপস্থাপিত। মিরাক্ল নাটকগুলি মিষ্ট্রি নাটক অপেক্ষা গীর্জার সঙ্গে কম ঘনিষ্ঠ ছিল, এবং যেহেতু জনসাধারণের সঙ্গে এর সম্পর্ক অধিক ছিল,

সেইজন্য এই ধর্মীয় নাটকগুলির মধ্যে হাস্যরস, ব্যঙ্গকৌতুক ইত্যাদি কমিক প্রসঙ্গের অবতারণার সুযোগ বেশী ছিল।

মিস্ট্রি ও মিরাক্লের বিবর্তন ও পরিণতি :—খ্রীষ্টজন্মদিবস অনুষ্ঠানের প্রার্থনাসঙ্গীত (Easter *trope*) উপলক্ষে যে মিস্ট্রি নাটকের জন্ম, এবং যার মধ্যে খ্রীষ্টানধর্মের মূল সত্যগুলি পরিস্ফুট করা হতো—সেগুলি পরবর্তীকালে বিরাট পরিবর্তন ও পবিবর্ধনেব মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমত· কয়েকটি অঙ্কে সেগুলি বিভক্ত করা হয়, এবং প্রতিটি অঙ্কের জন্য স্বতন্ত্র রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হতো। দ্বাদশ শতাব্দীর '*Conversion de l'Apôtre Paul*' নাটকটি এইভাবে বিভক্ত। দ্বিতীযতঃ কতকগুলি নাটক বিভিন্ন দৃশ্যের অভিনয় প্রবাহের দ্বাবা বিভক্ত হতো—এগুলিব জন্য আবার প্রয়োজনমত মঞ্চব্যবস্থা পরিবর্তন কবতে হতো। এই নাট্যানুষ্ঠানগুলি পবপর কয়েক দিনব্যাপী অভিনীত হতো—কারণ অভিনয় চক্রগুলি এত দীর্ঘবিস্তৃত হয়ে পড়েছিল যে একদিনের মধ্যে নাটকের সমস্ত দৃশ্যগুলি সমাপ্ত হতে পারতো না। নাট্যানুষ্ঠানের এই বিশেষ শৈলীটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে অনুসৃত হতো। ফরাসী দেশে এবং দক্ষিণ যোবোপে বিভিন্ন অভিনয চক্রে বঙ্গমঞ্চগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকতো, কিন্তু ইংলণ্ডে এবং ফ্লাণ্ডার্সে বিরাটাকায় চক্রবিশিষ্ট গাডীতে করে মঞ্চগুলিকে বিভিন্ন অভিনয়কেন্দ্রে স্থানান্তবিত করা হতো এবং মিস্ট্রি বা মিরাক্ল নাটকগুলি দৃশ্যানুক্রমে বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হতে হতে চলতো—এবং বিভিন্ন স্থানের দর্শকরা মূল নাটকেব সমস্ত দৃশ্যই পর্যায়ক্রমে দেখার সুযোগ পেত। ইংলণ্ডে চারটি বড বড শহরকে কেন্দ্র করে এই অভিনয় চক্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—ইয়র্ক, ওয়েকফিল্ড, কভেন্ট্রি এবং চেষ্টার।

এই ধর্মীয় নাটকগুলি সুপরিণত হতে অন্ততঃ তিন শতাব্দী লেগেছিল—এবং এই নাটকগুলি অভিনয় করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ সৌখীন অভিনেতা সম্প্রদায় (Confréries) থেকে সুরু কবে মধ্যযুগের বিভিন্ন উপজীবিকা ভিত্তিক সমবায় (Guilds) পর্যন্ত তাঁদের স্ব স্ব অভিনয় কেন্দ্রগুলিতে নিখুঁতভাবে এই ধর্মীয় নাটকগুলির অভিনয়কার্য সম্পাদন করতে অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় লেগেছিল। মিস্ট্রি বা মিরাক্ল শ্রেণীর ধর্মীয় নাটক অনুষ্ঠানের সবচেয়ে মহৎ উপলক্ষ্য ছিল Corpus Christi উৎসব (১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান ইউক্যারিস্ট সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম অনুষ্ঠিত। ত্রিনিটি

রবিবারের পরের বৃহস্পতিবার এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ ইস্টারের কিঞ্চিদধিক আট সপ্তাহ পরে এই অনুষ্ঠান সূচিত হয়। মে মাসের শেষ বা জুন মাসের প্রথম- দিকে এই উৎসবের দিন পড়ে। এই সময়টা আবার য়োরোপের আবহাওয়ায় বহিরাঙ্গণ উৎসব অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ সময়।) এই উৎসব অনুষ্ঠানটির বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি এত অধিক ছিল যে, বাইবেলের কোন বিশেষ অংশ বা সাধু-সন্তদের অলৌকিক জীবনকাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নাট্যকারগণের কল্পনাশক্তি রোমান্সের জগত বা ব্যঙ্গবিদ্রূপেব মধ্যে বিষয়বস্তুব বৈচিত্র্যের দিকে সম্প্রসারিত হয়েছিল। '*Mystère du Vieux Testament*' একখানি যৌথ প্রচেষ্টায় রচিত নাটক। অন্য অনেকের মধ্যে খুব সম্ভবতঃ *Le Maus* এর Grebau ভ্রাতৃযুগলের রচনাও এর মধ্যে আছে—এঁরা ছিলেন মিস্ট্রি এবং মিরাকল নাটক রচনায় বিশেষ পারদর্শী। এই নাটকে ব্যাবেলের স্তম্ভ নি'''ণের একটি দৃশ্য আছে, যেখানে গৃহনির্মাণরত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদেব পারস্পরিক কলহ, শিক্ষানবীশরত কিশোরদের উপব নির্যাতন, স্তম্ভের মালিককে তোষামোদ, অসংলগ্ন কথাবার্তা—ইত্যাদিব মধ্য দিয়ে নাগরিক জীবনের একটা বাস্তব আলেখ্য ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে Aruoul Grébau-এর '*Mysti're de la Passion*' নাটকটির মধ্যে বেথেলহেমের পথে রাখালদের মুখে সূক্ষ্ম সংলাপ থেকে সুরু করে জুডাস এবং 'হতাশা'র (এই 'হতাশা' চরিত্রটি মর‍্যালিটি নাটককে স্মরণ করিয়ে দেয়) গভীর দার্শনিক আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত নাটকগুলি থেকে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় য মিস্ট্রি ও মিরাকল পর্যায়ের নাটকগুলি অতঃপব তিনটি বিশেষ পরিণামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—এক, ধর্মীয় পরিবেশ ত্যাগ করে নাটকরচনা ক্রমশঃ ধর্মনিরপেক্ষ দার্শনিক চেতনা ও তাত্ত্বিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। দুই, লৌকিক সমাজ-জীবনের প্রতি আগ্রহ। তিন, গল্প-কাহিনী অপেক্ষা চরিত্রসৃষ্টির দিকে প্রবণতা।

(গ) **মর‍্যালিটি নাটক**:—মিস্ট্রি ও মিরাকল পর্যায়ের নাটক ক্রমশঃ বিবর্তনের পথে ধর্ম নিরপেক্ষ দার্শনিকতা ও তাত্ত্বিকতায় উপনীত হয়েছিল—এবং মধ্যযুগের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই স্তরটিকে 'ম৲ ালিটি' অভিধায় বিশেষিত করা হয়। এই যুগের ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য রোমান্টিকতা বা ব্যঙ্গপ্রবণতা—এই মাধ্যম দুটির কোনটিকেই গ্রহণ না করে একই সঙ্গে নাট্যকারের বিষয়বস্তুর

বৈচিত্র্য প্রবণতা এবং নীতিপ্রচার—এই দুটি দিক প্রকাশের সুযোগ এনে দিল। চতুর্দশ শতাব্দীর সর্বজনপ্রিয় রূপক-কাহিনী প্রবণতার উপর ভিত্তি করে এই 'মর‍্যালিটি' নাটকের বিকাশলাভ হলো। বাইবেল প্রসিদ্ধ ঋষি বা পুরুষদের বদলে কিছু সংখ্যক বিমূর্তভাব, যথা—পাপ-পুণ্য, মৃত্যু, জ্ঞান, শক্তি, সৌন্দর্য ইত্যাদি এই নাটকের চরিত্র। মানুষের মধ্যে নিরন্তর পাপ-পুণ্য, সৎ-অসদের দ্বন্দ্ব—এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই মর‍্যালিটি নাটকের বিবর্তন—এই দ্বন্দ্বের পটভূমিতে মানবমনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নাট্যকারগণ অসৎবুদ্ধিতে নিমগ্ন জগতে মানুষের মুক্তি সাধনার চিত্র এঁকেছেন।

গঠনকৌশলের দিক দিয়ে মিস্ট্রি বা মিরাক্‌ল নাটকের আঙ্গিক ছিল খুবই শিথিল—বিচ্ছিন্ন কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দৃশ্যের যোগফল মাত্র। সেদিক দিয়ে মর‍্যালিটি নাটকের আয়তন মিস্ট্রি বা মিরাক্‌ল নাটকের বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলি অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ—এবং এদের মধ্যে কোন কোনটি আবার সেনেকার ট্রাজিডিব অনুসরণে অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভক্ত। মিস্ট্রি বা মিরাক্‌ল নাটকগুলির দর্শক ছিল জনসাধারণ, এবং এক একটা বিশেষ অভিনয় চক্রেব মধ্যে জনসাধারণেব রুচি অনুযায়ী এক একটা বিশেষ দৃশ্য সীমাবদ্ধ ছিল—অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট দর্শকের জন্য সুনির্দিষ্ট দৃশ্য পরিকল্পিত, রচিত ও অভিনীত হতো। কিন্তু মব্যালিটি নাটকগুলি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অভিনীত না হয়ে হল-ঘরে অভিনীত হতো—এবং এব দর্শক ছিল অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিবা। মিস্ট্রি বা মিরাক্‌ল নাটকের অভিনয় সম্পাদিত হতো সাধারণতঃ সৌখীন নাট্যামোদী গোষ্ঠী দ্বাবা, কিন্তু মর‍্যালিটি নাটকের অভিনয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পাদিত হতো বেতনভোগী অভিনেতাদের দ্বারা। অধিকাংশ মিস্ট্রি বা মিরাক্‌ল নাটকের রচয়িতা ছিল যৌথ প্রচেষ্টা, কিন্তু মর‍্যালিটি নাটকগুলি নাট্যকারের ব্যক্তিগত রচনা।

ডাচ নাটক 'Everyman' এই পর্যায়ের প্রসিদ্ধতম নাটক, যা ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে সুপরিচিত। এই নাটকটির মধ্যে প্রতীক-ধর্মিতার আবরণ উন্মোচন করে মানবিক রস অনেকখানি পরিমাণে উৎসারিত হতে পেরেছে। এই নাটকটিতে শয়তান এবং পাপ—এই দুটি চরিত্র যথেষ্ট হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে নাট্যসাহিত্যের ধারায় জীবন্তচরিত্রের পরিবর্তে কিছু বিমূর্ত ভাব ও রূপকজাতীয় চরিত্রকে গ্রহণ করার জন্য মর‍্যালিটি নাটককে বিবর্তনের

ধারায় প্রতিক্রিয়াশীল বা 'পেছু হটে পড়া' স্তর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এ ধারণাটি যে ভ্রান্ত তা গভীর বিশ্লেষণে প্রতিভাত হবে। প্রথমতঃ, অধিকাংশ মর‍্যালিটির চরিত্রগুলি বিমূর্তভাব বা রূপক হলেও—এগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে মানবতা—যাকে অবলম্বন করে নাট্যকারগণ নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, নাটকের বিবর্তনের ধারায় মিস্ট্রি বা মিরাক্‌ল নাটকের অজস্র স্তরের শিথিল রূপ অপেক্ষা আধুনিক নাটকের গাঢবদ্ধরূপের সঙ্গে এই মর‍্যালিটি নাটকের সম্পর্ক অধিক ঘনিষ্ঠ। তৃতীয়তঃ, ধর্মপ্রভাব থেকে নাটকের মুক্তি প্রযাসের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আধুনিক নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে মর‍্যালিটির যোগ তর্কাতীত। চতুর্থতঃ, রঙ্গমঞ্চের বিবর্তনের ধারায় মর‍্যালিটি নাটকের রঙ্গমঞ্চ প্রয়োগ মধ্যযুগের বিচ্ছিন্ন ও বহুস্থানে বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চ পদ্ধতির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে। ইংবেজী 'Castle of Preservance' জাতীয় দু একটি মর‍্যালিটি নাটকে প্রাচীন মিস্ট্রি নাটকের পদ্ধতিতে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কলা সম্পাদিত করার নির্দেশ ছিল, কিন্তু ফরাসী ও ইংরেজী অধিকাংশ মর‍্যালিটি নাটকেব অভিনয় সম্পাদিত হতো একটিমাত্র রঙ্গমঞ্চে।

(ঘ) **ইণ্টারলুড** ঃ—১৫০০ শতকের মধ্যে য়োরোপে সমস্ত অভিনয় কেন্দ্রগুলি গঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং তারপর থেকে সেগুলির ভাঙন সুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ব্যক্তিনিষ্ঠ নাটক রচনার সূত্রপাত হয—এবং এই সময় থেকে এক নতুন শ্রেণীর নাটকের উদ্ভব হয়। মধ্যযুগের মিস্ট্রি, মিরাক্‌ল ও মর‍্যালিটির সঙ্গে এর যোগ থাকলেও, এগুলি প্রত্যক্ষতঃ ধর্মীয় নাটকের বা ধর্ম-নিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক নাটকের প্রেরণায় উদ্ভূত হয়নি। অবশ্য পূর্ববর্তী নাটকগুলি মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা ও লোকজীবন চেতনার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে এই নতুন শ্রেণীর নাটক বা ইণ্টারলুডগুলি সৃষ্ট হবার পিছনে তা খানিকটা সক্রিয় ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ইণ্টারলুডের প্রকৃত পূর্বসূরী হচ্ছে তৎকালীন সমাজজীবনে প্রচলিত কৌতুক নক্সাগুলি—এগুলি ছিল মধ্য-যুগের একজাতীয় হট্টগোলকারী আনন্দানুষ্ঠান; ভাঁড় শ্রেণীর লোকেরা এর আয়োজন করতো, এবং সমাজের সম্মানভাজন ব্যক্তিদের উপলক্ষ্য করে এক-জাতীয় ব্যঙ্গবিদ্রূপরস পরিবেষণ করা এই কৌতুক নক্সাগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল। ইণ্টারলুড নাটকগুলি খানিকটা একই প্রেরণায় রচিত হওয়া সুরু করে। জার্মানীর নুরেমবুর্গ, এবং অন্যান্য শহরে অজ্ঞাতনামা রচয়িতাদের রচিত

এই জাতীয় কৌতুক নক্সা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল—ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি Hans Sachs (১৪৯৪-১৫৭৬) সেই কৌতুক নক্সাগুলির উপর ভিত্তি করে কতকগুলি ইণ্টারলুড রচনা করেন। তাঁর '*Der fahrende Schüler im Paradise*' (The Wandering Scholar from Paradise, 1550) ইণ্টারলুডটির বিষয়বস্তু হচ্ছে জনৈকা গৃহিনীকে কিভাবে একটি ছাত্র ধাপ্পা দিয়ে মহিলাটির দ্বিতীয় স্বামীর কাপডজামা আদায় করেছিল তার কাহিনী। ছাত্রটি মহিলাটিকে এই বলে ধাপ্পা দেয় যে, সে সদ্য স্বর্গ থেকে আসছে—এবং স্বর্গে মহিলাটির মৃত স্বামী নোংরা কাপড জামা পরে' খুব কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছে। এই কথা শুনে মৃত স্বামীর দুঃখে বিগলিত হয়ে মহিলাটি তাঁর বর্তমান স্বামীর কাপডজামা ছাত্রটির হাতে এই অনুরোধ জানিয়ে তুলে দেয়, যেন সে অবিলম্বে স্বর্গে গিয়ে তাঁর মৃত স্বামীকে এগুলি দিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, ছাত্রটি অবিলম্বে কাপডজামাগুলি নিয়ে চম্পট দিল।

এই জাতীয় ইণ্টারলুড নেদারল্যাণ্ডেও লেখা হতে সুরু করলো। এখানেই আবার *Rederijker* নামক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাটক এবং কাব্যামোদীসমবায়ই Everyman এর মতো গুরুত্বপূর্ণ মর‍্যালিটি নাটক সৃষ্টি করেছিল এবং এরা নানারকম প্রতিযোগিতামূলক অভিনয়কলার পৃষ্ঠপোষকতা করতো। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে এবং ফরাসীদেশে ইণ্টারলুড অভিনয়-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল—যাদের বিষয়বস্তু একান্তভাবে গঠিত হতো ছোট ছোট কৌতুক-নক্সার ভিত্তিতে। এই জাতীয় ইণ্টারলুডের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যে জন হেউডের (John Heywood, 1497 ?—1580) 'The Play of the Weather' এবং 'The Four P's' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষের ইণ্টারলুডটিতে চারটি চরিত্র অবিশ্বাস্যতম মিথ্যাভাষণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ফরাসী দেশের অজ্ঞাতনামা লেখকের '*Maitre Pierre Pathelin*' ইণ্টারলুডটি তার বদমায়েস উকিল চরিত্রটির জন্য শেষ পর্যন্ত জনশ্রুতির পর্যায়ে পৌঁচেছিল। নায়ক উকিল প্যাথেলিন একবার একটি দর্জিকে খুব সহজেই ঠকাবার পর অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী জীবনে বহুলোককে ঠকিয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত একটি চতুর রাখাল এই ভদ্রলোককে তাঁর প্রাপ্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করে ঠকিয়েছিল—তার কৌতুকজনক কাহিনী এর বিষয়বস্তু।

আঙ্গিকের দিক দিয়ে '*Maitre Pierre Pathelin*' (১৪৬৪) মধ্যযুগের

টুপি ও ঘণ্টা সমন্বিত ভাঁড় শ্রেণীর লোকদের কৌতুক-নক্সা (*Sottie*) এবং সপ্তদশ শতাব্দীর পরিণত কমেডি নাটকের মধ্যবর্তী। কিন্তু এর সরল হাস্যরস, পরিস্থিতি সৃষ্টির চমৎকারিত্ব, অনবদ্য সংলাপের গুণে ইণ্টালুডটিকে মলিয়ের পূর্ববর্তী ফরাসী নাটকের সমশ্রেণীতে স্থানলাভ করার মর্যাদা দেওয়া যায়।

অবশ্য এই ফরাসী ইণ্টারলুডটি ছাড়া প্রায় অধিকাংশ ইণ্টারলুডগুলি আয়তনে এত ক্ষুদ্র যে সেগুলি কোন স্বতন্ত্র নাটকের মর্যাদা পেতে পারে না। সেগুলি কোন ভোজসভায় বা বিবাহানুষ্ঠানে কিছু সময়ের জন্য অভ্যাগতদের চিত্তবিনোদনের উপযুক্ত ছিল। ইতালীতে কোন গুরুগম্ভীর ক্লাসিকার্ল নাটক অভিনীত হবার সময় দুটি অঙ্কের মধ্যবর্তী সময়ে নাটকীয় বিবাহ হিসাবে এই ইণ্টাবলুডগুলি ব্যবহৃত হতো।

মধ্যযুগের ধর্মীয় নাটক, ইতালীয় রেনেসাঁস-উত্তর ধর্মীয় নাটক—মধ্যবর্তী স্তর আইবেরীয় উপদ্বীপ-অঞ্চলের (স্পেন, পর্তুগাল) ধর্মীয় নাটক॥ প্রাচীনের বিদায়ঃ আধুনিকতার সূত্রপাত—ইতিমধ্যে ইতালীতে যখন ক্লাসিকাল জ্ঞানচর্চার পুনর্জন্ম হলো রেনেসাঁসের ফলশ্রুতিতে তখন নাটকেব ইতিহাসে দিক পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল। তখন আইবেরীয় উপদ্বীপ অঞ্চলের দেশগুলিতে (স্পেন, পর্তুগাল) এই ধর্মীয নাটকের শেষ এবং প্রধান ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াল। এবং কোনরকম মৌলিক পরিবর্তনের মধ্যে না গিয়ে এই সমস্ত আঞ্চলিক ধর্মীয় নাট্যকলাই রেনেসাঁস পরবর্তী নাট্যসাহিত্যের ধারায় রূপান্তরিত হলো। সপ্তদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁস প্রভাবিত লোপ ডি ভেগা (Lope De Vega) এবং ক্যালডাবণ (Calderon) লিখিত ধর্মীয় নাটক এবং মধ্যযুগের মিরাকল মর‍্যালিটি নাটকগুলির মধ্যে এই আইবেরীয় উপদ্বীপ অঞ্চলের নাটকগুলি মধ্যমর্তী সেতু স্বরূপ—এবং স্পেন ও পর্তুগালের এই ধর্মীয় নাটকগুলির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের ধর্মীয় নাটকের উপর যবনিকাপাত হলো।

স্পেনের আদি কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Juan Del Encina (১৪৬৯-১৫২৯)। তিনি মূলতঃ ছিলেন পল্লীগীতি রচয়িতা। তিনি প্রকৃতিবাদের (Paganism) সঙ্গে করুণরস মিশ্রিত করে তাঁর নাটকগুলি রচনা করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকের নায়ক সেণ্ট এণ্টনী—এই হবু সন্তটি তার সন্ন্যাসজীবন

ত্যাগ করে পার্থিব প্রেমের সুখস্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন। এনসিনা স্যালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন—এবং সেকালে স্যালামাঙ্কা মানবতাবাদের পীঠস্থান ছিল। অবশ্য এনসিনার নাটকগুলিতে অভিনেয় গুণ বিশেষ ছিল না। তাঁর নাটকের তীব্র আবেগধর্মী প্রেমকবিতা, গ্রাম্যরসিকতা, পল্লীগীতি, বিদ্রূপ-প্রবণতা, মধ্যযুগীয় বীরত্বপনা, যাজকসম্প্রদায় বিরোধী মনোভাব—প্রাচীন ধর্মীয়নাটকের সঙ্গে প্রায় সম্পর্করহিত, এবং নাটকের সঙ্গে এর সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ।

স্পেনের পববর্তী নাট্যকার Torres Noharro (১৪৮০-১৫৩২) এককালে পোপের কৃপাধন্য ছিলেন, কিন্তু তা হলেও তাঁর যাজকতাবিরোধী মনোভাব এনসিনার অপেক্ষা তীব্র ছিল। রোম তাঁর কাছে পাপের দুর্গ বলে মনে হতো। তাঁর নাটকের গঠনকৌশল অপেক্ষাকৃত গাঢবদ্ধ। তাঁর শ্রেষ্ঠ কমেডি 'Himema'-র মধ্যে পরবর্তী নাট্যকার Lope De Vega বা Calderon এর নাটকের বহু উপাদান পাওয়া যায়—হাস্যরস, 'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ' পদ্ধতিতে মনিব-ভৃত্য সংলাপ, মধ্যযুগের সেরেনাদ সংগীত (প্রেমিকার জানলার নীচে দাঁড়িয়ে প্রেমিকের গান—Serenade)—ইত্যাদি বহু উপাদানই নহারোর নাটকে সংক্ষিপ্ত আকারে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই সমস্ত স্পেনেব আদি নাটকগুলিতে নাটকীয় পদ্ধতি অপেক্ষা গীতি কবিতার ধর্মই বেশী প্রতিভাত হয়।

প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যকলার মধ্যবর্তীস্তরের নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক রচয়িতা হচ্ছেন পর্তুগীজ নাট্যকার Gil Vicente (১৪৬৫-১৫৩৯)। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের ব্যাপারে শেক্‌সপীঅর-পূর্ববর্তীদের মধ্যে ইনি অন্যতম। ভিসেন্টের প্রথম দিককার নাট্যসৃষ্টির মধ্যে এনসিনার পল্লী কমেডিগুলির (এগুলির ভাষা কাস্তিলিয়ান) প্রভাব সমধিক। কিন্তু সেখানেও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অপ্রতুলতা ছিল না। তাঁর কৃষক চরিত্রগুলি বাস্তব থেকে আহৃত। তাঁর দরিদ্র ভদ্রলোক, মুক্তদেহ বিচারকগণ, একনিষ্ঠ ধার্মিক —ইত্যাদি চরিত্রগুলি বিশ্বস্তভাবে বাস্তবকে অনুসরণ করেছে। অধিকন্তু তাঁর কাব্যভাষা সমগ্র নাটককে একটা ঐকতানসূত্রে বিধৃত করেছে। ভিসেণ্ট তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে প্রহসন, কমেডি, ট্রাজি-কমেডি, ধর্মীয়—ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছেন, কিন্তু বস্তুতঃ একটির সঙ্গে আর একটির প্রকরণগত সীমারেখা

বিলুপ্ত-প্রায়। অধিকাংশ নাটকগুলি মূলতঃ পর্যায়ক্রমে কাব্যধর্মী এবং ব্যঙ্গমূলক—এবং তা সত্ত্বেও তাদের অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ ক্ষুণ্ণ হয়নি। অধিকাংশ নাটকগুলির বিষয়বস্তু পল্লীগীতি, মিষ্ট্রি, মরালিটি এবং কৌতুক-নক্সা থেকে আহৃত। শেক্‌সপীঅরের কমেডিগুলি যেমন আর্ডেনের অরণ্যানীর পটভূমিকায় বিধৃত, তেমনই ভিসেণ্টের নাটকের সমগ্র বিষয়বৈচিত্র্যই পর্তুগীজ গ্রাম্যপরিবারের মৌলসূত্রে বিধৃত।

ভিসেণ্টের পরিণত জীবনের নাটকে দেখা যায় যে, তিনি প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর্তুগীজ ও স্পানিশ ভাষা ব্যবহার করেছেন—বিশেষ করে যেখানে তিনি লোকায়ত জীবন-চেতনাকে রূপ দিয়েছেন—সেখানে মাতৃভাষাই মর্যাদা পেয়েছে। আবার ধর্মীয় নাটক বা কোন গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা নাটকে কাস্তিলিয়ান ভাষা ব্যবহার করেছেন—যেমন তাঁর Four Seasons এবং Sibila Cassandra নাটকে। শেষের নাটকটিতে গীতিপ্রবণতার সঙ্গে ব্যঙ্গধর্ম যুক্ত করে একটি নতুন স্বাদ সঞ্চার করেছেন। খৃষ্টান ভবিষ্যৎ-বক্তার সঙ্গে প্যাগান ভবিষ্যৎবাণীর মিলন ঘটিয়েছেন। পল্লীবালা ক্যাসাণ্ড্রাকে তিনি কুমারী মাতা (Virgin Mary)-তে রূপান্তরিত করেছেন এক অপূর্ব গীতি মাধুর্যের প্রবাহে। 'মৃত্যুর নৃত্য' (Dance of Death) বিষয়ের উপর ভিসেণ্টের এয়ী নাটকের (Barca do Inferno, Barca do Purgatoris, Barca do Gloria) প্রথম দুটি পর্তুগীজ এবং তৃতীয়টি স্পানিশ ভাষায় রচিত—এগুলির প্রকরণভঙ্গি সরাসরি মরালিটি নাটক থেকে গৃহীত—এগুলির মধ্যে লেখকের যাজকতাবিরোধী মনোভাব ও ব্যঙ্গপ্রবণ হাস্যরস এক বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে। —শ্যা. স.

মেলোডি—দ্রঃ নাটকের ষডঙ্গ।

মেলোড্রামা (অতিনাটক)—'মোলোড্রামা' সাধারণত ট্রাজিডির অপভ্রংশ হিসাবেই বিবেচিত। কারণ, 'Melodrama really deals in escape, whereas at a more serious level, escape is impossible. The essence of tragedy is the inescapability of the issue….' যদিও উক্ত সমালোচনা গ্রন্থেই মেলোড্রামাকে স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করি,—'We should, however, guard against seeing

melodrama merely as tragedy which does not come off.' অধিকন্তু, 'Or an author may aim only at melodrama,...' একটি প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে, যে ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে 'Escapism' বা 'পলায়ন তৎপরতাই' মেলোড্রামার ধর্ম, সে ক্ষেত্রে কোন নাট্যকারই সজ্ঞানে তাকে অঙ্গীকার করেন কি না? যদি, 'সজ্ঞান পলায়ন তৎপরতা'ই মেলোড্রামার ধর্ম হয়, তবে, সে নাট্যকার প্রবঞ্চক, এবং মেলোড্রামা নাট্যরূপটি প্রতারণার উপব নির্ভরশীল। এমন সিদ্ধান্ত অশোভন। স্বীকার করা ভাল, আকাজ্ক্ষা এবং সামর্থ্যের ব্যবধান চিরকালই দুস্তর। এতে অন্তত, নাট্যকারের 'সততা'টুকু কলঙ্কিত হবে না।

মূলতঃ ট্রাজিডি একটি কেন্দ্রীয় সত্যকে অবলম্বন করে, সেই সত্যবন্ধনই তার 'Moral Order,' এবং যেহেতু ঐ কেন্দ্রানুসারিতা বিশ্বায়ত সত্যেরই স-জাতি, সেই অর্থেই ট্রাজিডি 'More philosophical,' 'More universal.' নিরাসক্ত জীবনদ্রষ্টার দৃষ্টিতে সমস্যা সঙ্কুলতার মধ্য দিয়ে যে মুহূর্তগুলি অক্ষয় হয়ে ওঠে, নাটকেব পরিভাষায় তাকেই বলব 'সিচুয়েশন্'। এবং ঐ 'সিচুয়েশন্'-গুলিই ক্রম-অন্বিষ্ট হয়ে পরিণামকে আসন্ন করে তোলে। এই 'সিচুয়েশন্' থেকে নিষ্কৃতি লাভের সুযোগ চরিত্রের নেই, নিষ্কৃতি দেবাব অধিকারও নাট্যকারের নেই। এই 'সিচুয়েশন্'-এর মধ্যে নায়কের আভিজাত্য (Magnitude) পারিপার্শ্বিকের সঙ্গতিকে অস্বীকার করে ট্রাজিক হ'য়ে ওঠে। কিন্তু, যে ক্ষেত্রে নাট্যকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে মৌল সমস্যাটিই অস্বীকৃত হয়—তখনই মেলোড্রামার সৃষ্টি। এই হস্তক্ষেপের সুনিশ্চিত কাবণ নাট্যকারের উত্তেজনাব ভয়াবহ অপরিমিতি।

যে শিল্প প্রয়াসের মর্মমূলে এই ভয়াবহতার শর্তহীন প্রাধান্য বিস্তাব, তার আঙ্গিকও অনুরূপ অ-সংযমে ক্ষত-লাঞ্ছিত। ঠিক সেই কারণেই চবিত্র উপস্থাপনার প্রাথমিক শর্তকে অস্বীকার করে নাট্যকার বহিরঙ্গ সজ্জায় তৎপর। ফলে মেলোড্রামা উপকরণ-সর্বস্ব হয়ে ওঠে। এর অঙ্গে অঙ্গে তখন অতিরঞ্জনের অমিত বিস্তার। কোন একটি ঘটনাও কোন প্রতীক অর্থ বহন করে না। তদুপরি মেলোড্রামা যদি আবেগ প্রবণ (Sensational.) হয়, তবে সেই আবেগ মত্ততা সত্ত্বেও, নাট্যকারের সোচ্চার ভূমিকা সত্ত্বেও, এই রূপটি হয়ত ট্রাজিডিকে আভাসিত করে থাকে, কিন্তু, মেলোড্রামা 'spectacu-

lar' হলে নাট্যকার স্বয়ং অবক্ষয়টুকুর জন্যে তৎপর হয়ে ওঠেন। ফলে, সর্বাত্মক আত্মদৈন্য পূর্তির জন্যে আলোক সম্পাত আর দৃশ্য সজ্জার অহেতুক অতিশয়োক্তি ঘটে থাকে। অধিকন্তু, 'Psychological representation' অনুপস্থিত বলেই, শেষ পর্যন্ত মোলোড্রামা 'means nothing.' এই মনস্তাত্ত্বিক উপস্থাপনার অনুপস্থিতিতে রসিক চিত্ত যতই কুণ্ঠিত হোক না কেন, সাধারণ পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের কাছে এই রূপটি পরম প্রিয়। প্রকৃতপক্ষে, 'আদিমতা' আমাদের জন্মগত সংস্কার। অপরিশীলিত মনে এই আদিম বৃত্তিরই দুর্মর প্রখরতা। এবং মেলোড্রামাতে সেই আদিম-চৈতন্য পরিতৃপ্তির বিপুল উপকরণ তা' নৃত্য অথবা সঙ্গীত-ই হোক, কিম্বা বীভৎস হত্যা আর রোমহর্ষক ঘটনা সন্নিবেশেই হোক। সেই অর্থেই মেলোড্রামার আবেদন অনেক খানিই 'Physical.'

মেলোড্রামার প্রায়ান্নরূপ দ্বিতীয় আরেকটি শাখা সম্পর্কে অবহিত হওয়া হওয়া উচিত—ইংরাজীতে যাকে বলে Problem play, বাংলায় বলব সমস্যাশ্রয়ী নাটক। এ সমস্যার একটি ব্যাপক সামাজিক রূপ আছে। মেলোড্রামায় যে ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ঘটনা অনাবশ্যক গুরুত্ব অর্জন করে সে ক্ষেত্রে এই সমস্যাশ্রিত নাটকে অধিকতর শিল্পনৈপুণ্যের আভাস। উদাহরণস্বরূপ 'প্রফুল্ল' এবং 'নীলদর্পণ' নাটক দুইটির উল্লেখ করা চলে। 'নীলদর্পণ' নাটকে যখন কোন সামগ্রিক ফলশ্রুতি নেই, সেখানে 'প্রফুল্ল' নাটক 'সাজানো বাগান শুকিয়ে' যাবার মধ্যে অন্ততঃ একটি সমাজ চিন্তার ধারা শ্বসিত হ'তে পেরেছে। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেকেরই চেতনায় একটি ব্যাপক আশঙ্কার পদধ্বনি। সে আশঙ্কা সামাজিক সংহতি বিনষ্টির আশঙ্কা। এবং প্রত্যেকেরই প্রবণতা সেই প্রাচীনেরই অনুবর্তনে। একমাত্র উত্তরপর্বে রবীন্দ্রনাথই এ 'ঘোর' কাটিয়েছিলেন। সেই একই সূত্রে গিরিশচন্দ্রও সমাজধ্বংসে আত্মনাশের কল্পনাতেই বিবশ। ট্রাজিডি, সমস্যাশ্রয়ী নাটক এবং মেলোড্রামা—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সিচুয়েশন্-ই উপজীব্য। প্রথম ক্ষেত্রে সিচুয়েশনে চরিত্রকে স্থাপন করেই নাট্যকার নীরব, ঘটনাপ্রবাহ এবং চরিত্র পরস্পরকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নাট্যকার অধিক সক্রিয়, ঘটনাকে তিনিই স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসুক, আর তৃতীয় ক্ষেত্রে 'সিচুয়েশন্'-এর কাছেই নাট্যকারের আত্মসমর্পণ। যে ঘটনাকে নির্মম রূপে

প্রয়োগ কুশলতার সামর্থ্য তাঁর ছিল না, তেমন ঘটনাকে আশ্রয় করেই নাট্যকার অসহায়।

আমাদের সিদ্ধান্ত, মেলোড্রামাকে উন্নত শিল্পকীর্তি হিসাবে স্বীকার করা যায় না। সমালোচকের দাবী সত্ত্বেও শুধুমাত্র মেলোড্রামা রচনাই নাট্যকারের লক্ষ্য হ'তে পারে, এ সিদ্ধান্তেরও আমরা বিপরীতপন্থী। বরং বলব : মেলোড্রামা ট্রাজিডির অসবর্ণ এবং অসমর্থ আত্মীয়—রীতিতে অমিতাচারী, নীতিতে দীন। সুতরাং শিল্পগোত্রে মেলোড্রামা এখনও কৌলীন্যে অনধিকারী। —স. দ

মোনোলোগ (একোক্তি বা একক-কথন)—গ্রীক্ মোনোলোগ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একজনের ভাষণ। একমাত্র কোরাস বাদে সব ভাষণই অবশ্য নাটকে বিশেষ একটি চরিত্রের মুখে বসে থাকে , এবং সেই অর্থে নাটকের প্রত্যেকটি উক্তিই মোনোলোগ। কিন্তু মোনোলোগ বা একোক্তি বলতে আমরা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, বেশ দীর্ঘ ভাষণ বুঝে থাকি। সংলাপের মতই এই 'একোক্তি'র একজন নির্দিষ্ট শ্রোতা থাকেন। অর্থাৎ 'একোক্তি' স্বগতোক্তি নয়। প্রার্থনা, শোকপ্রকাশ, প্রেমসঙ্গীত বা হৃদয়োদ্ঘাটনের জন্য একোক্তির প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' কাব্যের 'পতিতা' কবিতাটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একোক্তির দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করতে পারি। সেখানে বক্তা ও শ্রোতা দুইই উপস্থিত , কিন্তু শ্রোতা নির্বাক, বক্তা আত্মভাষণে রত। যদি এই উক্তিটি একান্তই বর্ণনাত্মক না হয়, এর মধ্যে যদি কিছু নাটকীয় ধর্ম থাকে, তাহলে একেই 'ড্রামাটিক মোনোলোগ' বলা যেতে পাবে। বলাবাহুল্য ড্রামাটিক মোনোলোগ একটি সম্পূর্ণ সাহিত্য কর্ম বলেই, তার মধ্যে চরিত্রসৃষ্টি এবং বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের মত, বিশেষ একটি ঘটনার মধ্যে নাটকীয় তাৎপর্য আবিষ্কার করতে হবে। ড্রামাটিক মোনোলোগ একই সঙ্গে নাট্যধর্ম ও গীতিধর্ম রক্ষার চেষ্টা করে। ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং ড্রামাটিক মোনোলোগ রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নাটকের মধ্যে, অন্য চরিত্রের উপস্থিতিতে একটি নাতি-দীর্ঘ আত্মভাষণও মোনোলোগ বলে বিবেচিত হবে (যদিও তাকে বিশেষ অর্থে ড্রামাটিক মোনোলোগ বলা হয় না)—'বিসর্জন' নাটকে পঞ্চম অঙ্ক/দ্বিতীয় দৃশ্যের সূচনায় গোবিন্দমাণিক্য ও নয়নরায় উপস্থিত , সেখানে গোবিন্দ-মাণিক্যের ভাষণ 'এখনি আনন্দধ্বনি! এখনি পরেছে দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ!......' ইত্যাদি অংশ একোক্তি বা মোনোলোগ রূপে গ্রহণ করা যেতে

পারে। শেক্‌সপীঅরের ট্রাজিডিগুলিতে এই জাতীয় মোনোলোগের ব্যবহার প্রায়ই লক্ষ্য করি। —অ. বা.

যবনিকা—দ্রঃ নাট্যশালা (ভারতীয়)।

যাত্রা—বাংলা নাটকের উৎপত্তি যদিও যাত্রা থেকে হয় নি, আধুনিক যুগে বিলাতী থিয়েটারের অনুকরণ করতে গিয়েই তার জন্ম, তথাপি যাত্রার মধ্য দিয়েই প্রাগাধুনিক যুগে বাঙ্গালীর নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ হয়ে এসেছে। আজকের দিনেও জনসাধারণ বলতে আমরা যদি বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষকে বুঝি তবে বলতে হয় তাদের নাট্যরস পিপাসু মন যাত্রাগানের থেকেই রস আহরণ করে। থিয়েটারী ঢঙের নাটকাভিনয় দেখে ক'জন ?

বাঙ্গালী জনসাধারণকে দীর্ঘ দিন ধরে তৃপ্তি দিয়ে এসেছে যে যাত্রাগান তার উদ্ভবের ইতিহাস অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করা আজ বোধ হয় সম্ভব নয়। কারণ উপকরণের অভাব। মধ্যযুগে (১৬শ—১৮শ) যে যাত্রাগান গাওয়া হত তার লিখিত কোনরূপ আজও আমরা পাইনি ; যে যাত্রার সঙ্গে আমাদের পরিচয় তার উদ্ভবেব মূলে একাধিক প্রভাব অনুমিত হয়েছে এবং সেই সব অনুমানের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও হয়েছে। এই সকল আলোচনা ও সমালোচনার থেকে একটা কথা আজকের দিনে কিছুটা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা চলে যে প্রাচীন পাঁচালী কথকতার থেকে যাত্রার উদ্ভব হয় নি, তবে এর সঙ্গে কীতনেব নিকট সম্পর্ক রয়েছে।

বহুদিন থেকেই এদেশে **নাটগীত** ধরণের এক জাতীয় রচ. র প্রচলন ছিল দেখতে পাই। জয়দেবের মধুরকোমল কান্তপদাবলী 'শ্রীগীতগোবিন্দম্' সেই প্রচলিত নাটগীতের আদিমতম নিদর্শন। দোহার পরিবৃত পদকর্তা কীর্তনের ভঙ্গীতে এই গান করতেন। এই নাটগীতের পরবর্তী সংস্করণরূপে নাম করা যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র—পাত্র-পাত্রী সংলাপ ও তাল লয় সংযোগ গীত হলে এর চেহারা অনেকটা যাত্রাগানের মতই হয়। পদাবলী কীর্তনের 'আখর' যুক্ত হলে তার রূপটাও অনেকটা এই রকম দাঁড়ায় এবং ঐ 'আখর' অর্থাৎ কীর্তনের রসদ্যোতক গদ্য ব্যাখ্যার মধেই নাকি যাত্রার সংলাপের মূ: বীজ নিহিত আছে।

বস্তুতঃ কীর্তনের সঙ্গে যাত্রার যোগ যে নিকটতম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এক ধরণের যাত্রাকে আমরা তো 'কৃষ্ণ যাত্রা' বলেই জানি। কৃষ্ণকথা নিয়ে রচিত এই যাত্রা গান হিসাবে পরিবেষিত হয়ে থাকে। ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর ধর্ম পিপাসা এতে যেমন তৃপ্তি লাভ করে তেমনি রসপিপাসু মন গান শুনে আনন্দ লাভ করে। যাত্রার মধ্যে-এই দুই লক্ষণ—ধর্ম ভাবের প্রাধান্য ও সঙ্গীত-বাহুল্য সর্বাগ্রে লক্ষনীয়। ধর্মই বাংলা দেশের প্রাণ স্বরূপ। ধর্ম কাহিনীর মধ্য দিয়ে এদেশের লোকচিত্ত যেমন তৃপ্তি লাভ করে এমন আর কিছুতেই নয়। যাত্রায় সেই ধর্মভাবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়। নাটকের প্রাণ যে দ্বন্দ্ব, যাত্রায় তার অভাব আপাত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এখানেও দ্বন্দ্ব আছে ধর্মের সঙ্গে অধর্মের, পাপে ও পুণ্যে এবং সেই দ্বন্দ্বে পাপের পরাজয় পুণ্যের জয় ঘোষিত হয়। এই সঙ্গে নির্বাধ অলৌকিক দেবলীলার প্রাধান্যও লক্ষ্য করা যায়। যাত্রায় সঙ্গীতের আতিশয্য ও সঙ্গীত প্রাণ বাঙ্গালীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যাত্রার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেরই নজরে পড়ে—বিবেক-জাতীয় চরিত্র। দার্শনিক তত্ত্বকথায় এবং নীতি উপদেশ প্রচারের জন্য একটি স্বতন্ত্র চরিত্রের সৃষ্টি যাত্রাকারের অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে ধরা যেতে পারে। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে কৃত্রিম কণ্ঠস্বর ও অঙ্গ ভঙ্গীর দিকটাও শ্রোতার শ্রুতি ও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার নয়। তাছাড়া নাটকের মধ্যে যে 'এ্যাক্শন' আমরা সব সময় প্রত্যাশা করি যাত্রায় তার বাহুল্য—বীর বা রৌদ্ররস বাহুল্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে থাকে আবেগপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা বা সংলাপ আর থাকে স্থূল হাস্যরস পরিবেষণের জন্য ভাঁড়ামির চেষ্টা। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো যে বৈশিষ্ট্যটি যাত্রাকে নাটক থেকে পৃথক করেছে তা হল দৃশ্যপটের অভাব। উন্মুক্ত আসরে সহস্র সহস্র দর্শক ও শ্রোতার মধ্যে এর অভিনেতার মধ্যে ব্যবধান ঘুচে যায়, লোকচিত্ত তাই রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখে যত তৃপ্ত হয় তার চেয়ে বেশী তৃপ্তি লাভ করে এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের অভিনয় দেখে। শুধু লোক চিত্তেই নয়, বিদগ্ধ পণ্ডিতজনের রস-আবেদনের কাছেও এর একটা মূল্য আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই কারণেই যাত্রাকে পছন্দ করেছেন—দৃশ্যপট সমন্বিত রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে তিনি তেমন তৃপ্তি পেতেন না বলেই স্বীকার করেছেন তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে। এই তো গেল যাত্রার উদ্ভব ও মূল কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা। এবারে যাত্রার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা চলে।

যাত্রার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ছেড়ে অভিনয় কলা উনিশ শতকে কলকাতার সদ্য প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে গিয়ে প্রবেশ করলেও যাত্রার ধারা এদেশ থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। আধুনিক যুগের যাত্রায় থিয়েটারের প্রভাব অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় তার ফলে যাত্রার অভিনয়ে দর্শকও কিছুটা স্বভাবতই এসে পড়েছে, যেমন করে থিয়েটারেব ভিতরেও যাত্রার প্রভাব সংক্রামিত হয়েছে। মনোমোহন বসু প্রভৃতির **গীতাভিনয়ে** যাত্রার প্রভাব অতিশয় সুস্পষ্ট। মঞ্চাশ্রয়ী নাট্যকলাব মধ্যে মনোমোহন যাত্রার স্বাদ যোগ করে দিয়ে নতুন ধরণের নাটক সৃষ্টি করেছেন। যাত্রার গীত ধর্ম এই শ্রেণীর নাটকে খুব বেশী প্রশ্রয় পেয়েছে। মনোমোহন অনুসারী নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতির রচনাতেও যাত্রার প্রভাব পড়েছে। তাঁদের নাটকে যাত্রার বিবেক চরিত্রের অনুকরণে এক একটি মুক্ত পুরুষের চরিত্র সৃষ্টিব প্রবণতাও লক্ষ্য কববার মত। সু. গ.

রাইজিং অ্যাক্‌সন—দ্রঃ নাটকের গঠন (পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্র)।

রূপক নাট্য—প্রতীক্ কথাটিই সাধারণতঃ 'সিম্বল' অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং 'এলিগরি' অর্থেই রূপক কথাটি সাধাবণতঃ চলে। এই অর্থ স্বীকাব করে নেওয়াব ব্যাপারে কোন যুক্তি কেউ দেখাননি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একস্থানে 'প্রতিরূপক' কথাটি 'সিম্বল' অর্থে ব্যবহাব করেছেন।

'রূপক' কথাটির 'ক' প্রত্যয় ক্ষুদ্ররূপেব অর্থ দ্যোতনা করে। যা পরিপূর্ণ রূপ না পেয়ে ক্ষুদ্র রূপ পেয়েছে তাই-ই রূপক। সুতরাং সিম্বল, এলিগরি—সবই রূপক। কিন্তু এলিগবি কথাটির মধ্যে রহস্যময়তা নেই—একটি ছদ্ম অর্থেরই ভান তাতে প্রকাশিত হয়। সেইজন্য 'প্রতি' উপসর্গটিব প্রয়োগ করে কিছুটা নির্দিষ্ট করার চেষ্টায় আমি এলিগরি অর্থে 'প্রতিরূপক' ব্যবহার করেছি। সুতরাং রূপক কথাটির আব সিম্বল অর্থে প্রয়োগের কোন অসুবিধা রইলো না।

প্রতীকধর্মিতা আজ সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকাব করেছে। কেবল এক বিশেষ প্রকার রীতি সৃষ্টি করে কাব্যকলা প্রদর্শনই এর উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্যিকেরা নানাভাবে সঙ্কেত করেন। পাঠক যেমন চান যে লেখক সুন্দর করে লিখবেন, লেখকেরাও সেইরূপ আশা করেন যে পাঠক যত্নের সঙ্গে পড়ে ভাবের গভীরতায় অবগাহন করবেন। সেই কারণে বর্তমানের অনেক

লেখকই অল্প দুই চারটা কথায় অনেক কিছু ইঙ্গিত করবার চেষ্টা করছেন। দুই চারটা তুলির টানে রূপদক্ষ যে চিত্রটি ফুটিয়ে তোলেন তাতে সেই রং-এর খেলাকে অতিক্রম করেও কত না ভাব ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। যে কথা বলা হল সেই কথা গেল কোথায় হারিয়ে, তার মধ্যে ফুটে উঠল কত শত সহস্র কথা। সাহিত্যে প্রযুক্ত এই ব্যঞ্জনার মত প্রতীকও নানাভাব প্রকাশ করে—অস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জনার জন্য প্রতীকের প্রয়োগ হয়। সাহিত্যের ব্যঞ্জনা চিত্রকে এক বিশেষ ভাব পণ্ডিত করে তোলে—প্রতীক্ কল্পনাকে অসীমের দিকে ঠেলে দেয়, মন সেই অবস্থায় কোন কিছুকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে। স্পর্শলাভ করার চেষ্টায় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ না করলেও মন কিন্তু হতাশায় নিমজ্জিত হয় না। এইরূপ রচনায় দুই প্রকার অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়: একটি বাইরের অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে যে অর্থ ধরা পড়ে, অপরটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ যা বুঝেও যথার্থ বোধগম্য হয় না।

শিল্পে প্রতীকের প্রযোগের মত প্রতিরূপকের প্রয়োগও আছে। প্রতিরূপকের সাহায্যে প্রধানতঃ শিক্ষা দেওয়াই হয়। জনসাধারণের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য পুরাণ রচিত হয়েছিল। সেইজন্য পুরাণে প্রতিরূপকের বাহুল্য দেখা যায়। প্রতিরূপক ও প্রতীকের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে কোলরিজ বলেছেন—'·· an allegory is but a translation of abstract notions into a picture-language, which is itself nothing but an abstraction from objects of the senses ; on the other hand a symbol is characterized by a transluence of the special in the individual, or of the general in the special, or of the universal in the general'.

প্রতীক্ তিন শ্রেণীর হতে পারে (১) যেগুলির যোগটা বাইরের অর্থাৎ যেগুলি স্বেচ্ছায় সৃষ্ট (২) যেগুলির যোগ আভ্যন্তরীণ এবং (৩) যেগুলি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি বা মরমী অনুভূতি থেকে উদ্ভূত।

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা এই দেশের সাহিত্যিকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে প্রচুর প্রতীক্ এবং প্রতিরূপকের প্রযোগ করেছেন। রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে তার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তনের যুগের যে সাহিত্য

আমাদের হাতে এসেছে (চর্যাপদ) তাতেও আলো-আঁধারী ভাষায় ভাবের সঙ্কেত করা হয়েছে। প্রতীকের সঙ্গে প্রতিরূপক অনেক পদেই বিজড়িত হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনায়ও প্রতীক্ এবং প্রতি-রূপকের সম্মিলন হয়েছে।

নাটকের আঙ্গিক প্রতীকিতার বিশেষ উপযোগী। উপন্যাস একা পাঠ করতে হয়—দুই চারজন শ্রোতা কখন কখন থাকে না তা নয়। এতে নাটকের ন্যায় ভ্রান্তি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বিশেষ উপন্যাস শেষ করতে কম পক্ষেও পাঁচ-ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। এতটা সময় একটা মানুষকে বাস্তব পৃথিবী ভুলিয়ে সুদূর লোকে ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব। নাটকে সেই অসুবিধা নেই—এখানে চোখের সামনে যে ব্যাপার ঘটে তা স্বভাবতঃই আকর্ষণ করে। দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই নাটক শেষ হয়ে যায় : এই সময়টুকু অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকদের মনকে ধরে রাখতে পারে না। প্রতীকিতায় যে মোহময় অনুভূতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন তা এই সময়টুকুর জন্য বিস্তার করা নাটকের দ্বারা সম্ভব। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রতীক্ সৃষ্টিতে নাটককেই বেছে নিয়েছিলেন। কাব্যে মনকে আকর্ষণ করা গেলেও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাহায্য পাওয়া যায় না। তাই নাটকে প্রতীকের প্রয়োগ যেমন একদিকে উপন্যাসে প্রয়োগ অপেক্ষা শতগুণ সুবিধাজনক, সেইরূপ কাব্যে প্রয়োগ অপেক্ষাও সহজতর। প্রতীকধর্মী নাটকগুলির মধ্যে তাঁর মরমী দৃষ্টিভঙ্গী উৎসারিত হয়েছে। নিজের মনের বিশেষ উপলব্ধি এই নাটকগুলিতে প্রতীকের সাহায্যে সঙ্কেত করতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো এইগুলি তাঁর এত প্রিয় ছিল। —শা. কু. দা.

রোমান্টিক নাটক—রোমান্টিক শিল্পান্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রেরণা দুটি—স্বাধীনতা ও আবেগ। এই প্রেরণার মূলে আছে কল্পনাসচেতনতা। রোমান্টিক শিল্পে কল্পনার সারথ্য সর্বত্র—কী কাব্যে, কী চিত্রে, কী নাট্যে। রোমান্টিক নাটকে এই মৌলিক গুণ আছে অক্ষুণ্ণ হয়ে—তাই সাহিত্যের ইতিহাসে রোমান্টিক নাটকের আবির্ভাব ঘটেছে আইন-কানুন ভেঙ্গে। নাটকের গঠন, রসপরিণাম এবং মর্জি-র সব বিধিবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে। গঠন কারুর দিক থেকে বনেদী 'ঐক্যত্রয়ী'-র ধারণা প্রথমে ঘা খেল। যেহেতু কল্পনার লীলাবিলাসই রোমান্টিক নাটকের বৈশিষ্ট্য, সেইজন্য ঘটনার

সুতনুকা সংহতির চেয়ে বিস্তারই এই নাট্যের আরাধ্য, ফলতঃ নাটক হয়ে ওঠে 'এপিসোডিক্যাল' বা বৃত্তক। বাংলা নাটকের প্রধান মেজাজ রোমান্টিক বলে গঠনের দিক থেকে দ্বিবৃত্তক বা বহুবৃত্তক হয়ে ওঠা তাই অব্যর্থ লক্ষণ—মোল্টন থাকে বলেছেন 'গল্প ও নাটকের পরিচয়'। রোমান্টিক নাটকের সংলাপে থাকে এই চিহ্ন—কল্পনার উদ্ভাসনায় সংলাপ নাটকের ভূমি ছাড়িয়ে সৃষ্টি করে নতুন ইন্দ্রধনু—যার স্বতন্ত্র, স্বাধীন আকর্ষণ নটের সুযোগ, দর্শকের রোমাঞ্চ। নাট্যিক সংলাপের বড কথা যেখানে বস্তুনিষ্ঠা, চরিত্রনিষ্ঠা এবং 'মোশন্'-নির্ভরতা, রোমান্টিক সংলাপ সেখানে কল্পনামুখ্য শিল্পায়ণ—অর্কিড-জাতীয় সুশোভন শিল্পমাত্র। তাই রোমান্টিক সংলাপে নাট্যকার স্বাধীন, মুক্ত, প্রায়শঃ অসংযমী—এবং নাটকের অন্তরঙ্গ দায়িত্বে চুক্তিবদ্ধ নন। নিও-ক্লাসিক নাটকের সংলাপে যে বেখাভাস থাকে, রূপক নাটকে যে সংকেত থাকে, রিয়ালিস্ট নাটকে যে তীব্রতা বা চরিত্রাত্মতা থাকে, রোমান্টিক নাটকের সংলাপে তা প্রায়শই নেই। রোমান্টিক সংলাপ প্রগল্ভ, বর্ণাঢ্য, অলংকৃত—সব মিলিয়ে মনে হয় যেন কাব্যপ্রপাত—যেমন আছে স্পেনিশ রোমান্টিক নাট্যকার ক্যালডেরনে বা শেক্‌সপীঅরে বা রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালে। এ' ত গেল বহিরঙ্গ লক্ষণ—রোমান্টিক নাটকের কায়ার কথা, কান্তির কথা নয়। এই শেষের গুণটি নাট্যকাবেব মর্জির ওপব—যে দৃষ্টিতে নাট্যকারের কবিধর্ম। তার অহংতন্ত্রী মেজাজ—যা দিয়ে নাট্যকার চরিত্রের স্বাধীন গতিকে আচ্ছন্ন করে দেন, নাটকীয দ্বন্দ্বেব ঘটান ভাবলোকে সমাধি। বাস্তব জীবনের কলাবিধিকে অতিক্রম করে স্বকীয় মেজাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন নাটকের রসপরিণাম হয়ত প্রত্যাশিত হয় না, তা হয়ে ওঠে নাট্যকারের ব্যক্তিত্বের সিদ্ধান্ত। এমনটি হয়েছে লোপ্-ডে-ভাগ বা ক্যাল্ডেরনের নাটকে, এমনটি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে। কাবণ এঁরা অপ্রতিরোধ্যভাবে কবি। যে দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা জীবনকে দেখেন, তাতে বাস্তবের রঙ্ যায় বদলে—অনেকে একে বলেছেন 'magic casement'। তার ফলে রোমান্টিক নাটকে 'সেট' যেমন হয় কল্পনা-সর্বস্ব, বিষয়বস্তুতেও তেমনি কতকগুলো উঁচুসুরে বাঁধা প্রেরণার প্রবণতা এসে দেখা দেয়। বীরত্ব, মর্যাদা, দেশপ্রেম, মিথুনপ্রেম—জীবনের কয়েকটি উচ্চারিত স্বরগ্রামে বাঁধা থাকে কাহিনীর তানবিস্তার। ১৮২৭-২৮-এর কাছাকাছি এক সময়ে একদল ইংরেজ কলাবিদ পারিতে শেক্‌সপীঅরের রোমান্টিক নাটক অভিনয়

করে গেল—বিকৃতর উগো তখন পঁচিশ বছরের তরুণ, তাঁর চোখের সামনে রোমান্টিক নাটকের নতুন দিগন্ত খুলে গেল। এবং দেখতে দেখতে সারা য়োরোপে রোমান্টিক নাটকের ঢল বয়ে গেল—ইটালি, হাঙ্গেরি, রাশিয়া। সকলেই 'সাজসাজ' রবে রোমান্টিক নাটকের ক্ষেত্রে নেমে পড়লো। আর আমাদের সাহিত্যে পুরোপুরি রোমান্টিক নাটক লেখার দায়িত্ব নিলেন মুখ্যতঃ দুজন—দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ। —গৌ. মু.

সঙ্গীত—দ্রঃ নাটকের ষড়ঙ্গ।

সমস্যা নাটক—দ্রঃ প্রবলেম নাটক।

শারাদ (Charade)—ফরাসী শব্দ। অর্থ বাঁধা। কতকগুলি অক্ষরের দ্বারা একটি বিশেষ শব্দ নির্মাণের খেলা। কৌতুকের সামগ্রী। 'The *Charade* is an enigmatic description (writtern or acted) of a word and its seperate syllables.' একাধিক বিষম জিনিষের মধ্যে একটা আকস্মিক সাদৃশ্য আবিষ্কারের যে চমক আছে, 'শারাদ' সেই জাতীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে। অসঙ্গতির মধ্যে এর জন্ম বলে, 'শারাদ' হাস্যরসের পক্ষে অনুকূল। রবীন্দ্রনাথ তার 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: 'য়োরোপে শারাদ (Charade) নামক একপ্রকার নাট্যলেখা প্রচলিত আছে। কতকটা তাহারি অনুকরণে এগুলি লেখা হয়।…এই হেঁয়ালি নাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকে আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।' রবীন্দ্রনাথের 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭) গ্রন্থে কতকগুলি রচনাও এই জাতীয় 'হেঁয়ালি নাট্য'।

সলিলোকি (স্বগতোক্তি)—গ্রীক সলিলোকি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একাকী-ভাষণ। নিজেকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা, সাধারণতঃ একাকী অবস্থাতেই স্বাভাবিক, তবে মঞ্চে অন্যের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন না থেকেও স্বগতোক্তি সম্ভব। ম্যাথু আর্ণল্ডের ভাষায় 'The dialogue of the mind with itself'। সাধারণতঃ চরিত্রের অন্তর্জগৎ উদ্ঘাটনের জন্যই স্বগতোক্তির প্রয়োজন। হৃদয়ের কথা, যা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলা যায় না, অথচ যা প্রকাশিত না হলে চরিত্রটি অস্ফুট থাকবে, তার জন্য এই নাটকীয় কৌশলটি অবলম্বন করা হয়। অনেক সময়েই নিজের সঙ্গে তর্ক, আত্মসমর্থন বা আত্ম-জিজ্ঞাসা নিয়ে স্বগতোক্তি গড়ে ওঠে। নাটকের আঙ্গিকগত প্রয়োজনেও

স্বগতোক্তির ব্যবহার করা হয়; দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ঘটনাবস্তুর সংযোজনায়, পূর্বকথন বা ঘটনার পরিণাম প্রদর্শনে স্বগতোক্তির বিশেষ মূল্য আছে।

গ্রীক্ নাটকে স্বগতোক্তির ব্যবহাব ছিল না বললেই চলে, কিন্তু রোমাণ্টিক নাটকে 'স্বগতোক্তি' একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়,—এবং শেক্‌সপীঅরের ট্রাজিডিগুলিতে (হ্যামলেট, ম্যাকবেথ) স্বগতোক্তি স্ব-মূল্যে উজ্জ্বল। আধুনিক নাটকেও স্বগতোক্তির ব্যবহার আছে, তবে মঞ্চে অন্যের উপস্থিতিতে স্বগতোক্তি কৃত্রিম মনে হওয়ায় ক্রমশঃ তা পবিহার করা হচ্ছে। চরিত্র বিশেষেব হৃদয়োদ্‌ঘাটনকাবী উক্তি যা অভিনয় কক্ষের যাবৎ দর্শকের কর্ণগোচর হচ্ছে, অথচ মঞ্চে উপস্থিত পাশেব চবিত্রটি শুনতে পাচ্ছে না,—এটি বাস্তবধর্মী নাটকের পক্ষে অসঙ্গত। অথচ চবিত্রেব অন্তর্জগতেব পবিচয় দেওয়ার এটাই সবচেয়ে সহজ ও সুষ্ঠু পন্থা।

দ্বিজেন্দ্রলালেব 'সাজাহান' নাটকে পঞ্চম অঙ্ক/পঞ্চম দৃশ্যে ঔরংজেবের আত্মভাষণ উৎকৃষ্ট স্বগতোক্তিব নিদর্শন: 'যা কবেছি—ধর্মেব জন্য। যদি অন্য উপাযে সম্ভব হোত।—(বাহিরের দিকে চাহিযা) উঃ কি অন্ধকার! কে দোষী?—আমি।—এ বিচার, ও কি শব্দ? না, বাতাসেব শব্দ। একি! কোনমতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূব কর্ত্তে পার্চ্ছি না। বাত্রে তন্দ্রায ঢুলে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) উঃ, কি স্তব্ধ! এত স্তব্ধ কেন? (পরিক্রমণ, পরে সহসা দাঁড়াইযা) ওকি। আবাব সেই দাবার ছিন্ন শির। সুজার রক্তাক্ত দেহ!—মোরাদের কবন্ধ।—যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ঐ তারা আবার। আমায় ঘিরে নাচছে।—কে তোমবা? জ্যোতির্ময়ী ধূমশিখাব মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিযে যাও। চলে যাও!—ঐ মোরাদের কবন্ধ আমায় ডাকছে: দারাব মুণ্ড আমার পানে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাসছে—একি সব!—ওঃ (চক্ষু ঢাকিলেন, পরে চাহিয়া) যাক্। চলে গিয়েছে। উঃ—দেহে দ্রুত রক্তস্রোত বইছে। মাথার উপর যেন পর্বতের ভার।' —অ রা.

সংস্কৃত নাটক—সংস্কৃত আলংকারিদের মতে কাব্য দু'রকম—দৃশ্য এবং শ্রব্য। দৃশ্য কাব্য বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন অভিনেয়বস্তু। দৃশ্যকাব্যের অন্য একটি নাম রূপক। বর্তমানে আমরা নাটক বলতে সাধারণভাবে যে কোনো অভিনেয় বস্তুকে বুঝে থাকি। কিন্তু সে অর্থে সংস্কৃতে নাটক কথাটির প্রচলন

ছিল না। রূপকের দশটি শ্রেণীর মধ্যে নাটক অন্যতম মাত্র। বাংলা ভাষায় নাটক শব্দটির যেমন অর্থবিস্তার ঘটেছে, তেমনি রূপক শব্দটির ঘটেছে অর্থসঙ্কোচ।

কিন্তু অভিনেয় এবং আবৃত্তি যোগ্য দুইটি শিল্পরূপকেই কাব্য বলে গণ্য করায় বুঝতে পারা যায় রসের দিক দিয়ে উভয়কেই সংস্কৃত আলংকারিক একই প্রকৃতির বলে মনে করেন। দুয়েরই লক্ষ্য রসের উদ্‌বোধন; আলম্বন-উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সহযোগেই রসসৃষ্টি হয়ে থাকে। পাশ্চাত্ত্যে নাটককে দুটি আলাদা শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে। কাব্যে ভাববস্তুরই সর্বস্বতা আর নাটকে ঘটনারই প্রাধান্য। ঘটনার দ্বন্দ্বে বিচিত্র রসসংঘাত সৃষ্টি হয়ে থাকে বলে তার স্বাদ হয় অন্য রকম। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে ঘটনা থাকে অবশ্য, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের এমন তীব্রতা থাকে না। বস্তুতঃ সংস্কৃত নাটকে একটি মূলভাব অবলম্বনেই ঘটনাজাল রচিত হয়ে থাকে। গল্প, সংলাপ, অঙ্ক বিভাগ—প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যে যথারীতি থাকলেও এতে কতকগুলি মৌলিক বিশেষত্ব আছে। দৃশ্যকাব্যের গল্প মূলতঃ সংগৃহীত হয় রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি প্রচলিত কাহিনী গ্রন্থ থেকে। সমসাময়িক জীবন দৃশ্যকাব্যে বিশেষ স্থান পায়নি। এই সব গল্প গ্রহণে কল্পনা অবাধ প্রসার পায় বলে এতে যে সুবিধা আছে, সমসাময়িক বাস্তবমূলক কাহিনীতে সে সুবিধা ততোটা থাকে না। মনে হয়, এই জন্যেই দৃশ্যকাব্যে গদ্য ও পদ্য মিশে গিয়েছে। নানা ছন্দের পদ্য অপেক্ষাকৃত সহজেই রসসৃষ্টির সহায়ক হয়ে ওঠে। সংস্কৃত নাটকে 'অবস্থানুকৃতি'র কথা থাকলেও বাস্তবচিত্রণ এতে কখনও প্রাধান্য পায়নি। আলম্বন এবং উদ্দীপন সহযোগে রসের উদ্‌বোধনই ছিল এর লক্ষ্য। বিশুদ্ধ কাব্যের লক্ষ্য থেকে এর লক্ষ্য সেই জন্য আলাদা নয়। বিশ্বনাথ পরবর্তীকালে শ্রব্যকাব্যতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বারবারই দৃশ্যকাব্য থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। 'মুদ্রারাক্ষস' বা 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর মতো দু'একটি নাটক বাদ দিয়ে সংস্কৃত নাটক বস্তুতঃই কাব্যধর্মী। 'রস' সৃষ্টির পক্ষে প্রতিকূল হতে পারে, এমন কোনো ঘটনা বা চিত্রকে এতে গ্রহণ করা হয়নি। পাশ্চাত্ত্য দেশে 'ট্র্যাজিডি' নামক নাটকে যে তীব্র দ্বন্দ্বসংঘাত, নায়কের ব্যর্থতা নৈরাশ্য প্রভৃতির বাস্তব ঘটনাকে রূপ দেওয়া হয়ে থাকে, সংস্কৃত নাটকে তা হয়নি। অভাবের দিকটাকে কখনোই বড়ো করে এতে দেখানো হয় না—ভারতীয় মনে পূর্ণতার

যে ধারণা দৃঢ়মূল, সেটাই এর কারণ। অবশ্য সংস্কৃত নাটকে বিষাদ নেই, তা নয়। উত্তররামচরিতের আশ্চর্য করুণ বস্তুর তুলনা নেই। কিন্তু এই করুণ রসে যে প্রশান্ত গভীরতা—সুখমিতি দুঃখমিতি বা—আছে, তার স্বাদ পাশ্চাত্ত্য ট্রাজিডির স্বাদ থেকে আলাদা। তত্ত্বতঃ নাটকে নানা রসই ফোটানো যায় বটে কিন্তু কার্যতঃ শৃঙ্গার বীর এবং করুণ রসই মুখ্যতঃ আঁকা হয়।

সংস্কৃত নাটকের রোমান্টিক বা কাব্য ধর্মী পরিবেশকে দর্শক বা পাঠকের কাছে বাস্তবের রূপ দেবার জন্যে কয়েকটি প্রচেষ্টা দেখা যায়। যেমন নাটকে রূপায়িত বিভিন্ন শ্রেণীব চরিত্রের মুখে বিভিন্ন ভাষা দেওয়া হয়েছে। রাজা বা উচ্চ শ্রেণীর পুরুষচরিত্র কথা বলে সংস্কৃত ভাষায়, অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর পুরুষ এবং নারী চরিত্র কথা বলে শৌরসেনী প্রাকৃতে এবং নিম্নতন শ্রেণীর চরিত্রেরা মাগধী এবং পৈশাচী প্রাকৃত ব্যবহার করে থাকে। ভাষা ব্যবহারেব এই বৈচিত্র্য তাদের সামাজিক অবস্থার বাস্তবতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাস্তবতার ভ্রান্তি উৎপাদনের আর একটি কৌশল নাটকের প্রারম্ভেই প্রবেশক বা বিষ্কম্ভক বলে দৃশ্যটি। এতে সূত্রধার এবং নটীর কথোপকথনের মধ্যে নাটকের বিষয়টি বলে দেওয়া হয়। সূত্রধার সরে গেলে নটী নাটকেব অন্যতম চরিত্ররূপে দেখা দেয়। এই সংলাপটি সোজাসুজি নাট্য ঘটনার আরম্ভ দেখিয়ে দিত। যেমন শকুন্তলা নাটকে সূত্রধার নটীকে বলছে—

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ
এষ রাজেব দুষ্মন্ত সারঙ্গেণাতিরংহসা॥

রসোদ্ভাবনের দিকে লক্ষ্য রেখে যথাপ্রয়োজন ভাষা বেশভূষা বা আচরণেব পরিকল্পনা করার নাম 'বৃত্তি'। নাটকের কোনো কোনো অঙ্কে হয়তো শুধু পুরুষ চরিত্রই আছে এবং তারা সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করল, তবে এই অঙ্কে ব্যবহৃত বৃত্তির নাম 'ভারতী'। বীর অদ্ভুত রৌদ্র রসের ক্রিয়া, এবং তার সঙ্গে করুণ এবং শৃঙ্গার রস থাকলে সেই কল্পনারীতির নাম 'সাত্বতী'। 'কৈশিকী-বৃত্তি' বিচিত্র বেশভূষা পরিহিত পাত্রপাত্রীর শৃঙ্গার রসের অভিনয়-কল্পনার নাম। আবার কোনো অঙ্কে পাত্র পাত্রী যদি দম্ভ মিথ্যাচারণ বা পুরুষের মতো আচরণ করে তবে সেই অঙ্কে অনুসৃত বৃত্তির নাম 'আরভটী'। এই বৃত্তিগুলির প্রয়োগেরতা রতম্যেই সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের দশটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে।

সংস্কৃত আলংকারিকেরা দৃশ্যকাব্যকে দশটি ভাগে ভাগ করেছেন: নাটক,

প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বীথী, প্রহসন, ডিম এবং ঈহামৃগ। এই শ্রেণীভাগ প্রধানত করা হয়েছে আখ্যানবস্তু, নায়কচরিত্র এবং উদ্দিষ্ট রসের হিসাবে, গৌণতঃ অঙ্ক সংখ্যা, বৃত্তি এবং গঠনরীতিব উপর নির্ভর করে। অবশ্য এদের মধ্যে অনেকগুলিরই কোনো নিদর্শন নেই। এই দশটি শ্রেণীর মধ্যে অবশ্য নাটকই সর্বাপেক্ষা প্রচলিত এবং আদর্শস্থানীয়। নাটকের নায়ক খ্যাতবৃত্ত। বিষয়বস্তু পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক। এতে অঙ্কসংখ্যা পাঁচ থেকে দশ। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এর দৃষ্টান্ত। প্রকরণের কাহিনী হয় কল্পিত কিন্তু চরিত্রগুলি সর্বোচ্চ শ্রেণীর সমাজ থেকে নেওয়া হয় না। রাজপরিবার বা রাজবংশের কোনো কাহিনী বা চরিত্রের অবতারণা এতে নিষিদ্ধ। প্রকরণের গঠন নাটকেরই মতো। মৃচ্ছকটিক বা মালতীমাধবকে প্রকরণের উদাহরণ বলা যায়। অঙ্ক অথবা উৎসৃষ্টিকাঙ্কতে যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা থাকবে। এর বিশেষত্ব করুণরসপূর্ণ নারী চরিত্রের ক্রন্দন। এটি একাঙ্ক। ব্যায়োগও এক অঙ্কেরই দৃশ্যকাব্য। এতে যুদ্ধ থাকবে। এর নায়ক কোনো দেবতা অথবা রাজা। যুদ্ধ অংশ্য কোনো স্ত্রীলোকের জন্য হবে না। ভাণ একোক্তি-মূলক। চরিত্রটি হবে ধূর্ত শ্রেণীর। কোনো অদৃশ্য চরিত্রের প্রশ্নের উত্তরে রঙ্গমঞ্চে কথা বলে গল্পটিকে রূপ দেয়। সমবকার দেবাসুরের আখ্যান, নায়ক প্রখ্যাত ব্যক্তি। এতে তিনটি মাত্র অঙ্ক। বীথী ভাণেরই মতো একাঙ্ক। পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা দুই তিন হতে পারে। নানা রকম রসও এতে থাকতে পারে। প্রহসনেব সঙ্গে ভাণের কিছু মিল আছে। প্রহসন একাঙ্ক ং ্যরসপূর্ণ দৃশ্যকাব্য। ডিম চার অঙ্কেব দৃশ্য কাব্য। এতে দেবতা অসুর যক্ষ রাক্ষস ভূত প্রভৃতি নানা রকমের চরিত্র, শৃঙ্গার এবং হাস্যরস ছাড়া আর সব রকম রস থাকতে পাবে। ঈহামৃগের বিষয় দিব্য স্ত্রীর ও দেবতার প্রণয়লীলা। যুদ্ধের বর্ণনাও এতে থাকতে পারে।

এই প্রধান দশটি শ্রেণী ছাড়া আরও প্রায় আঠারোটি উপরূপকের নাম পাওয়া যায়।

নাটকের গল্পাংশে পাঁচটি অবস্থা থাকে—মুখ প্রতিমুখ গর্ভ, বিমর্শ এবং নির্বহণ। নাটকীয় ঘটনার আরম্ভ জটিলতা সঙ্কট গ্রন্থিমোচন এবং শুভ সমাপ্তি অবলম্বনেই এই পাচটি অবস্থার বা সন্ধিক্ষণের নামকরণ হয়েছে। বস্তুত নায়কের উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিক থেকে আখ্যান বস্তুতে পাঁচটি বিশেষ অংশ থাকে, বীজ, বিন্দু,

পতাকা, প্রহরী ও কার্য। বীজ অংশেই নাটকীয় ঘটনার আরম্ভ। বিন্দু বলে সেই অংশকে যে অংশে নাটকীয় ঘটনা উত্তরার্ধে নানা সংশয় দ্বন্দ্বের অবসানে অগ্রসর হয়ে চলে। নাটকের মূল ঘটনার সহায়ক ছোটো ঘটনাকে বলে পতাকা। আপাতদৃষ্টিতে মূল ঘটনার সঙ্গে যোগহীন অথচ পরোক্ষভাবে ঘটনার সহায়ক আরও সামান্য ঘটনাকে বলে প্রকরী। আর কার্য হচ্ছে পাত্রপাত্রীর সংলাপে যে সকল ঘটনাগত উদ্যম এবং সে সম্পর্কে মন্তব্য ইত্যাদি থাকে।

এবার অভিনয় সম্বন্ধেও কিছু বলার দরকার। নাট্যশাস্ত্রে নাট্যগৃহ নির্মাণের বিস্তৃত নির্দেশ আছে। প্রাচীন মন্দির ইত্যাদিতে নাটমন্দিবের চিহ্ন এখনও দেখা যায়, যদিও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বর্ণনা ছাড়া আব কোনো সংবাদ পাওয়াব উপায় নেই। রঙ্গমঞ্চ তিনপ্রকার হত, আয়ত (rectangular) চৌকো (square) এবং ত্রিকোণ (triangular)। রঙ্গমঞ্চের সামনে বিস্তীর্ণ দর্শকদের আসন, রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতে নেপথ্যপীঠ, এবং বঙ্গমঞ্চের দুই পাশে যবনিকা। নাট্যশাস্ত্রে সুশিক্ষিত নানাবিষযে জ্ঞানী, নাট্যপ্রয়োগে দক্ষ ইত্যাদি বহু গুণ থাকলে তবে কেউ সূত্রধার বা মঞ্চাধ্যক্ষ হতে পাবতেন। তাব আরও সহকারী থাকত। স্ত্রী ভূমিকার অভিনয় নাবীবাই করত। নাবী যে পুরুষের অভিনয় করত না, তাও নয়। পুরুষ যদি পুরুষেব এবং নারী যদি নারীব অভিনয় করে তবে তাকে বলা যায় 'অনুরূপ', বালক বৃদ্ধেব ভূমিকা অথবা বৃদ্ধ বালকেব ভূমিকায় অভিনয় করলে তাকে বলা হয় 'বিরূপ' এবং পুরুষ যদি নারীব অভিনয় করে অথবা নারী পুরুষেব অভিনয় করে তাকে বলা যায় 'রূপানুসারী' অভিনয়। অভিনয়-কলার চারটি অঙ্গ, আহার্য, বাচিক, আঙ্গিক, সাত্ত্বিক। সম্ভবতঃ সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ে দৃশ্যপটের ব্যবস্থা ছিল না। নাটকের পাত্রপাত্রীদের মুখে দেশকালের নিখুঁত বর্ণনা থেকে মনে হয় এই আবৃত্তির দ্বারাই দৃশ্যপটকে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা হত। এই বিভ্রম সৃষ্টি করবার জন্যই বিশেষভাবে দরকার, আহার্য অর্থাৎ নেপথ্যবিধান ও বেশ বচনার। বেশ রচনার খুঁটিনাটি নির্দেশ নাট্যশাস্ত্রেই দেওয়া আছে। সংলাপ অংশকে বলে বাচিক অভিনয়। কোন রসের সৃষ্টিতে কি রকম কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করতে হয়, তাও শাস্ত্রে বলে দেওয়া আছে। অঙ্গ-ভঙ্গীর সাহায্যে অভিনেয় ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলাকেই বলে আঙ্গিক অভিনয়। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অভিনয়কালে কি ভাবে সঞ্চালন

করতে হয়, তা বিশেষভাবে জানা উৎকৃষ্ট অভিনেতার কাজ। সাত্ত্বিক অভিনয়ে দৈহিক বিক্ষেপ যেমন স্বেদ, কম্প, বিবর্ণতা ইত্যাদি বোঝায়। নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বহু খুঁটিনাটি আলোচনা নাট্যশাস্ত্র রচয়িতারা করে গেছেন। ক্ষুদ্র পরিসরে সব জিনিষ বলা সম্ভব নয়। নাটককে ভারতীয় সমালোচক সাংস্কৃতিক জীবনে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন বলে নাট্যশাস্ত্র 'নাট্যবেদ' নামে অভিহিত হয়েছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্র নাট্যবেদ বলে অভিহিত হওয়ারই যোগ্য।

—দ. ভ.

সংস্কৃত নাটকের গঠন—দ্রঃ নাটকের গঠন।

সাঙ্কেতিক নাটক—দ্রঃ প্রতীক নাট্য।

সাবপ্লট—দ্রঃ উপকাহিনী।

সামাজিক নাটক—বিশেষ অর্থে 'সামাজিক নাটক' তাকেই বলা চলে যে-নাটকে সমাজশক্তির সংঘর্ষে নাটকীয় কাহিনী আবর্তিত হয় এবং নাটকীয় চরিত্রগুলির উত্থান-পতন ঘটে। 'প্রফুল্ল' একটি অতিপরিচিত বাংলা নাটক। এই নাটকে পরিবারের কাহিনীই বর্ণিত। নায়ক যোগেশের অধঃপতনের কারণ সমাজশক্তি নয়, তাঁর নিজেরই দুর্বলতা। তাঁর সাজানো বাগান শুকিয়েছে পারিবারিক কারণে, সমাজশক্তির প্রভাব সেখানে অনুপস্থিত। একে আমরা 'পারিবারিক নাটক' বা 'গার্হস্থ্য নাটক' বলতে পারি, কিন্তু 'সামাজিক নাটক' নয়। বস্তুতঃ, আমাদের বাংলাদেশে অধিকাংশ পারিবারিক নাটকই সামাজিক নাটকের নামে চলেছে। 'প্রফুল্ল', 'বলিদান,' 'পরপারে,' 'বাঙালী,' 'স্বামী-স্ত্রী,' 'মাটির ঘর,' 'দুই পুরুষ'—সবই পারিবারিক নাটক। খাঁটি সামাজিক নাটকের সংখ্যা সকল দেশেই কম। শরৎচন্দ্রের 'রমা' নাটকটিকে খাঁটি সামাজিক নাটক বলা চলে, কারণ সেই নাটকের নায়ক-নায়িকার ট্রাজিডি ঘটেছে প্রত্যক্ষ সমাজশাসনের প্রবল চাপে। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'ও একটি সার্থক সামাজিক নাটক। এখানেও রহিম আর ফুলবানুর ট্রাজিডির মধ্যে রয়েছে সমাজশক্তির তাড়না ও শোষণ। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'ও সমগোত্রীয়। জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পরিচয়' নাটকটি সামাজিক নাটকের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। তারাশংকরের 'কালিন্দী'তে দুই পরিবারের সংঘাত থাকলেও পশ্চাৎপটে রয়েছে জমিদার ও মিল্-মালিক তথা সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের সংঘর্ষ ; এই হিসাবে একেও সামাজিক নাটক বলে

গণ্য করা চলে। বিদেশী সামাজিক নাটকের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ইব্‌সেনের 'An Enemy of the People'-এর। এই নাটকে নায়ক Dr. Thomas Stockmann-এর চরিত্র আবর্তিত হয়েছে তাঁরই মহৎ আদর্শের বিরোধী সমাজশক্তির সংঘাতে। জনগণের যথার্থ মিত্র কিভাবে স্বার্থপর সমাজ বিরোধী লোকের ষড়যন্ত্রে জনগণের শত্রু আখ্যা পান, নাটকীয় কাহিনীর তাই উপজীব্য। ইব্‌সেনের বিশ্ববিশ্রুত 'The Doll's House' পরিবার ভিত্তিক হয়েও সামাজিক নাটক। সমাজে প্রচলিত নারীত্বের তথাকথিত 'পবিত্র' আদর্শের বিরুদ্ধে নায়িকা Nora Helmer এক প্রবল প্রতিবাদ। প্রাচীন সামাজিক আদর্শের সঙ্গে আধুনিক নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দ্বন্দ্বেই Nora-চরিত্রের বিকাশ। বার্নার্ড শ-র 'Man and Superman', 'Widowers' Houses' সামাজিক নাটক। গর্কীর 'Lower Depths'-ও তাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আধুনিক মানুষই বেশি মাত্রায় সমাজ সচেতন, তাই 'সামাজিক নাটক' খুঁজতে হলে আধুনিক নাট্যকারদের রচনার মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে। —ক র

সুখময় নাটক—দ্রঃ কমেডি।

স্পেক্‌টাক্‌ল—দ্রঃ নাটকের ষড়ঙ্গ।

স্বগতোক্তি—দ্রঃ সলিলোকি।

হাইব্রিস্ (Hybris)—মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বা অহঙ্কার নাটকের নায়কের জীবনে অনেক সময় শোচনীয় পরিণতি এনে দেয়। দেবাদেশ বা নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ থেকেই গ্রীক নাটকে ট্রাজিডির সূচনা হোতো। উচ্চাভিলাষ, আত্মপরায়ণতা, লোভ, কামনা বা কোনো প্রবল প্রবৃত্তির তাড়নার ফলেই নায়ক এই বিপথে পা বাড়ান। একেই হাইব্রিস্ বলা হয়। এস্কিলাসের ট্রাজিডিগুলিতে স্পষ্ট তিনটি ঘটনা পরম্পরা লক্ষ্য করি—(১) (Hybris)—কার্য (২) (Koros)—প্রাপ্তি, ফল (৩) (Ate)—পরিণাম, পতন। 'ওরেস্টিয়া' নাটক-ত্রয়ে ক্লাইটেমনেস্ট্রার জীবনের তিনটি স্তর এইভাবে দেখানো যায়—(১) আগামেমনকে হত্যা (২) এইগিস্‌থাসের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন (৩) ওরেস্টিসের হাতে মৃত্যু।

হামারসিয়া (Hamartia)—গ্রীক্ ভাষায় হামারসিয়া শব্দের অর্থ ভ্রান্তি বা পাপ। আরিস্টটল ট্রাজিডির নায়ক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে হামারসিয়ার উল্লেখ করেছেন। ট্রাজিডির নায়ক অসাধারণ রকমের ন্যায়-পরায়ণ বা ধার্মিক নন, অন্যদিকে তিনি স্বভাব-দুর্বৃত্ত বা চরিত্র-দুর্বল মানুষও নন। তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ হামারসিয়া বা ভ্রান্তি। বলাবাহুল্য এই ভ্রান্তির জন্য তাঁর দায়ীত্ব আংশিক, বিচারের ভুলেই হোক, আর জেনেই হোক, নীতি ভ্রষ্টতার জন্যই হোক, আর মানব-স্বভাব সুলভ স্বাভাবিক ভুলই হোক,—একবার ভুল করলে আর ক্ষমা নেই। দৈব রোষ নেমে আসবে তার উপর। এখানে মনে রাখতে হবে, নায়কের কোনো একটি 'কাজ'কে অবলম্বন করেই এই ভ্রান্তি,—এবং 'কাজ' মাত্রেরই 'ফল' আছে। ইডিপাস জোকাস্টাকে বিবাহ করেছিলেন—ভ্রান্তিবশতঃ সন্দেহ নেই, তাঁর অজ্ঞাতে হলেও এই 'কাজ' অর্থাৎ এই বিবাহ, নৈতিক পাপ। এবং তার পরিণতি ভয়াবহ। ক্ষীরোদপ্রসাদ বি৹ [illegible]নোদের '[illegible]রনারায়ণ' নাট[illegible]কে কর্ণ হরিণ ভ্রমে গোবৎস বধ করেন, এবং তারই ফলে তিনি লাভ করেন 'মৃত্যু অভিশাপ'। সাধারণ-ভাবে একেই কর্ণের জীবনের 'হামারসিয়া' বলা যায়। যদিও 'নরনারায়ণ' নাটকে এই ঘটনার গু[illegible]ত্ব খুব বেশী বলে মনে হয় না। বরং সহোদর ভ্রাতা অর্জুনকে পরম প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনায় কর্ণের শিক্ষা, সাধনা ও যুদ্ধকে—তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভ্রান্তি বলতে পারি। কর্ণের জীবন, পরিচয়,—সব কিছুই দাঁড়িয়ে আছে একটি ভ্রান্তির উপর, কর্ণ ক্ষত্রিয় সন্তান হয়েও নিজেকে সূতপুত্র বলে জানেন। আরিস্টটল বলেছেন, মৃত্যু নয়—এই ভ্রান্তি বিদূরিত হওয়ার মুহূর্তেই ট্রাজিডি সম্পূর্ণ। 'নরনারায়ণ নাটকেও কর্ণ ে মুহূর্তে জেনেছেন যে, তিনি সূতপুত্র নন, সেই মুহূর্তেই তাঁর ট্রাজিডি সুসম্পূর্ণ।

—অ ব।

পরিশিষ্ট

নাট্যকার ঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ—মানব-হৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্ন দেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিন্ন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কলা-বিদ্যার পার্থক্য লইয়া আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্ত্য বা প্রাচ্য দেশভেদে বিভিন্নতা। এমনকি ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে বিভিন্নতা দেখা যায়। কাব্য, চিত্রপট, সঙ্গীত সকলই কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাহার কারণ, বোধ হয়, ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছবি। নির্মল আকাশ-তলবাসী ইটালিয়ানের হৃদয় ভাব—কুজ্ঝটিকাবৃত, ঝটিকা-আলোড়িত, তমাচ্ছন্ন পর্বতশৃঙ্গ নিবাসী স্কচ হইতে অবশ্যই ভিন্ন। স্কচের সঙ্গীতে বিষাদছায়া নিশ্চয় পতিত হইবে। সেইরূপ ইটালিতে হর্ষোৎফুল্লভাব প্রতিফলিত হইতে থাকিবে। চিত্তবিমোহন কাশ্মীর-প্রকৃতি-শোভা কালিদাসের কবিতা সুললিত করিয়াছে, নাটকেও কাটাকাটি হানাহানি নাই। কিন্তু শেকস্‌পীঅর উচ্চ কবি হইয়াও তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটক সকল বিয়োগান্ত-জনিত ঘোর ভীষণতাপূর্ণ। এক দেশের নাটক অপর দেশের নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচনা হইতে পারে না। দার্শনিক জার্মাণ সিলার, নাটকে ভার্জিন মেরির অবতারণা করিয়া উচ্চ 'জোয়ান অফ্‌ আর্ক' নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে ভাবে শেক্‌সপীঅরের নাটক রচিত নয়। পশু-যুদ্ধ-আনন্দপ্রিয় স্পেনের নাটক নিদয়তাপূর্ণ। ফরাসী-বিপ্লবের অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌বর্তী নাটকসকল, প্রায়ই বিপ্লবের ভীষণতায় পরিপূর্ণ। শেকস্‌পীঅরের, 'টেম্‌পেষ্ট' নাটকের সহিত কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের বার বার তুলনা হইয়া থাকে। 'টেম্‌পেষ্ট' বায়ু-বিহারীদেহী ঐন্দ্রজালিক কুহক আশ্রয়ে রচিত। 'শকুন্তলা'য় ঋষির অভিশাপও অপ্সরার প্রণয়-ভিত্তি-স্থাপিত। এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে প্রমাণ করা যায় যে, ভিন্ন দেশে ভিন্ন মস্তিষ্কপ্রসূত নাটক, ভিন্ন ভাবাপন্নই হইয়া থাকে, এবং এক দেশেই সময় বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয়, যথা—এলিজাবেথের সময় নাটক সকল 'দ্বিতীয় চার্লস' এর সাময়িক নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকল বস্তুত দেশকালপাত্র-উপযোগী, সেই হেতু ভিন্নদেশস্থ বা ভিন্ন সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় হয় না। যদি কোনও রঙ্গালয়ে 'শকুন্তলা' সুন্দররূপে অনুবাদিত হইয়া অভিনয় হয়, তাহা দর্শকের মন কতদূর আকর্ষণ করিতে পারে, তাহার স্থিরতা নাই। পাশ্চাত্ত্য-প্রদেশে অনুবাদিত শকুন্তলা দর্শক আকর্ষণ করিয়াছিল সত্য,

কাব্যেরও প্রশংসা হইয়াছিল, কিন্তু তা[illegible]স্থায়ীরূপে গৃহীত হয় নাই বা হইতেও পারে না। অনেকেই বলেন, 'ওথেলো' অনুবাদিত হইয়া অভিনয় হউক। অবশ্য মানব-হৃদয়-সম্ভূত প্রদীপ্ত ঈর্ষার ছবি দর্শকের মন স্পর্শ করিবে। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ মূর যোদ্ধার প্রেমে অনিন্দ্যসুন্দরী ডেসডিমোনার পিতৃ-গৃহত্যাগ নিভৃতে পাঠ করিয়া বুঝি[illegible] হইবে। উভয়ের প্রণয়ানুবাগে ভালবাসাব কথা নাই, কেবল যুদ্ধ-বিক্রম ও কঠোর সঙ্কট হইতে কেশ-ব্যবধানে উদ্ধার লাভ বর্ণিত। স্থিরচিত্তে নিভৃত পাঠে তাহার সৌন্দর্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু শেকস্‌পীঅর বর্ণিত 'ওথেলোর' মুখে অনুরাগচিত্র সহজে সাধারণের উপলব্ধি হয় না। বীরত্বে আকর্ষিত সুন্দরীব বর্ণনা শেকস্‌পীঅরের পূর্বে পুনঃ পুনঃ হইয়াছে। দর্শকও তাহা পাঠ কবিয়া ডেস্‌ডিমোনার অনুরাগ বুঝিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ নায়িকাব প্রেমোদ্দীপিত ভাবে যাঁহারা অভ্যস্ত নন, তাঁহাদেব নিকট উপবনে সুন্দর শোভাহাব-বিভূষিত স্থানে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়।

এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-স্রোত,—তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু,—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব। যেরূপ বীরচিত্র যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতির আদরেব, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী, লোক ও ধর্মসম্মানকারী নায়ক, হিন্দুহৃদয়ে স্থান পাইবে। দ্রৌপদীকে দুঃশাসন আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া স্থিরগম্ভীর যুধিষ্ঠিরের ভাব হিন্দুর প্রিয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের মস্তকচ্ছেদন পাশ্চাত্যপ্রিয় হইত। এ দেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্মপ্রসূত হইবে। বহুগুণযুক্ত রাজা, ব্যভিচারী হইলে সতীত্বপূজক হিন্দু তাহাকে ঘৃণা করিবে। শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণসীতা গঠিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন, শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজা। অস্থিত্যাগী দধিচী আদর্শত্যাগী ও অতিথি সেবক। কিন্তু এরূপ ত্যাগ বা এরূপ নির্মলতা কঠোর দেশে বাতুলতা বলিয়া যদিচ উপহাসিত না হয়, ভ্রান্তিমূলক বলিতে ত্রুটি করিবে না। সতী নারীর অভিমান প্রত্যেক দেশেই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু পাতাল প্রবেশী জানকীর অভিমান,

পতি-সহবাস-পরিত্যক্তা অভিমানিনী হইতে অনেক প্রভেদ। শেষোক্তা নায়িকা 'যেন রাম আমার জন্ম জন্মান্তরে স্বামী হন' একথা বলিয়া অভিমান করেন না। স্বামীকে দেখিলে বসনে বদন আচ্ছাদন করেন, বাক্যালাপ করেন না। এইরূপ প্রত্যেক রসেই বিভিন্নতা দেখা যায়। এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয় লক্ষ্য আত্মগোপন।

কবি বা ঔপন্যাসিক সকল স্থানে আসিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দিতে পারেন। কঠিন সমস্যাস্থলে অবস্থা বর্ণনা করিয়া পাঠকের উপর মনোভাব বুঝিবার ভার দিয়া তাঁহারা চলে, এবং ভার দেওয়া অনেক স্থলে উপন্যাসের সৌন্দর্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা, আয়েষা তিলোত্তমাকে আভরণ প্রদান করিয়া, দূরদেশে গমন করিবে বলিতেছে। যথায় দোষ ধরিবার সম্ভাবনা, তাহা স্বয়ং খণ্ডন করিয়া যান,—সর্বস্থানেই স্বয়ং উপস্থিত আছেন। এমন কি সমালোচকের প্রতি কটাক্ষ করিয়া, আপনার সমালোচনা আপনি করিতে পারেন। উপন্যাস-গুরু ফিল্ডিংএর 'টম জোন্‌স' তাহার উদাহরণস্থল। ঔপন্যাসিকের আর এক সুবিধা, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় তাহার উপন্যাসগত ব্যক্তিসকলের পরিচয় এক কালে দিতে বাধ্য নন। পাঠকের কৌতূহল জন্মাইবার নিমিত্ত কাহাকেও বা অন্য সাজে রাখিতে পারেন, পাঠক তাহার পরিচয় পায় না, আকাঙ্ক্ষার সহিত কে সে ব্যক্তি, অনুসন্ধান করে। সুযোগ বুঝিয়া তাহার পরিচয় দিয়া পাঠককে চমৎকৃত করেন। সার্ ওয়ালটার স্কটের 'পাইরেট' উপন্যাস ঔপন্যাসিক কৌশলের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। নাট্যকার তাঁহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তির নিকট কাহাকেও গোপন রাখিতে পারেন কিন্তু দর্শক তাহার পরিচয় প্রাপ্ত, তাঁহাকে অন্য নাটকীয় কৌশলে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করতে হইবে, যেমন 'মারচ্যাণ্ট অফ্ ভিনিস' এ সাইলক বুকের মাংস কাটিতে পারিবে, কিন্তু বুকের রক্ত না পড়ে। নায়িকা নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নিকট আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু দর্শকের নিকট নয়। ঔপন্যাসিক এ স্থলে দুই প্রকার ধাঁধা দিতে পারিতেন। আইনজ্ঞবেশে বিচারালয়ে কে আসিল, তাহার পরিচয় দেওয়া তাঁহার আবশ্যক নয়, কিন্তু আইনজ্ঞবেশে 'পোরসিয়া' উপস্থিত, তাহা নাট্যকারকে বলিয়া দিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করা নাটককারের এক স্বতন্ত্র কৌশল। এ কৌশল সাধারণ-শক্তি-উদ্ভূত নয়। আত্মগোপনই নাটককারের জীবন।

ঔপন্যাসিক বা কবি গল্পের ভিত্তি বর্ণনা করিতে পারেন, সমস্ত অবস্থাই তাঁহার আয়ত্তাধীন, কিন্তু নাটককারকে হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের আমূল গল্প করিতে হইবে। তুলিকা, স্থান অঙ্কিত করিয়া নাটককারকে সাহায্য করেন, কিন্তু তাহা চিত্রপট বলিয়া অনুভূত হয়, শক্তিচালিত-লেখনী—চিত্রের ন্যায় সমস্ত ছবি স্বরূপ ভাবে প্রতিফলিত হয় না। তুলিকা-চিত্রিত দৃশ্যে—ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া কুসুমে বসিতে পায় না। কপোত-কপোতী পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান কবে না, মধুস্বরে পাখী গায় না। এ সমস্ত লেখনী বর্ণনা করে না, কিন্তু নাট্য-কবিকেও পাখীর গান, ভ্রমরের গুঞ্জন দর্শককে শুনাইতে হইবে, বর্ণনায় নয়—ঘাত-প্রতিঘাতে। কেবল বর্ণিত হইলে নাট্যরস থাকিবে না। 'রোমিও-জুলিয়েট'-এ চন্দ্রোদয় হইতেছে, তাহা বর্ণিত চন্দ্র নয়,—হৃদয প্রতিঘাতী চন্দ্র। তপোবনে বারিসিঞ্চন, ভ্রমর গুঞ্জন, বর্ণিত নহে—হৃদয়-প্রতিঘাতকারী। সে তপোবনে, সে ভ্রমরগুঞ্জনে—পার্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া, দীর্ঘ শিখাধারী কবি কালিদাস নাই, আছেন—শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত এবং নাট্যকৌশলে অলক্ষিতে মদন। সেই ভ্রমর তপোবনে গুঞ্জন করিয়া, বিরহ তাপিত দুষ্মন্তের করস্থিত চিত্রপটে আসিয়া আবার সজীব হইয়াছে, দুষ্মন্তের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছে। নাটককারের দৃশ্যগুলি এইরূপ সর্বস্থানে সজীব হইয়া নায়কের হৃদয়ে আঘাত করিবে।

যথায় উৎকট সমস্যাস্থল, তথায় নাটককারকে আবরণ খুলিয়া মনোভাব দেখাইতে হইবে। উপন্যাসের নায়িকার মত বিষপাত্র পান করিলেই চলিবে না। 'হ্যামলেট' আত্মহত্যা করিবে কি না, তাহা বিরলে বসিয়া ভাবিতেছে বলিলে চলিবে না, তাহার জড়িত মস্তিষ্কে কিরূপ জড়িত ভাব প্রসূত হইতেছে, তাহা দেখাইতে হইবে। 'দুঃখের সাগর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ' 'Take up arms against a sea of troubles' রূপ জড়িত উপমা—অবস্থায় প্রসূত হইবে। এই উপমা অনেকেই সর্বাঙ্গীণ নয় বলিয়া দোষ দেন, কিন্তু নাট্যকার এরূপ সমালোচনায় ভয় করিয়া উপমা সর্বাঙ্গীণ করিতে পারিবেন না। তিনি যাহা অন্তরে বা বাহিরে দেখিয়াছেন, তাহাই নাটকে দেখাইবেন। অতি নৈকট্য সম্বন্ধ হইলেও, যুবক যুবতীর এক গৃহে বাস অসঙ্গত, এ কথা আত্মনির্মলতা-ভিমানী সমাজে বলিতে ভয় পাইবেন না। তরল স্ত্রীচরিত্র যে অতি দুঃখের সময়ে চাটুকারের প্রতারণায় চঞ্চল হইতে পারে, যথা তৃতীয় রিচার্ডের কাপট্যে

'অ্যানির' হৃদয়, তাহাও নির্ভীকচিত্তে প্রদর্শিত করিবেন। ধর্মের পুরস্কার— আর্থিক লাভ—লাভ নয়, তাহা হইলে ধর্ম একটি উচ্চ ব্যবসায় হইত, ধর্মের পুরস্কারই ধর্ম, ইহা দেখাইয়া, সাধারণের বিরক্তি ভাজন হইয়াও, তাঁহাকে অটল থাকিতে হইবে। সংসারের অবস্থা যেন তাঁহার কল্পনা-মুকুরে প্রতিফলিত হয়, ইহাতে সংসারের অপ্রিয় হইতে হইলেও, তিনি তোষামোদী কথায় সংসারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না। আঘাত দিতে হয়, আঘাত দিবেন, তাহাতে বিরাগভাজন হইতে পাবেন, কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ হইবেন, এবং কর্তব্যপালন ফলে—অমরত্ব নিশ্চয় লাভ কবিবেন।

'বাঙ্গলার রঙ্গভূমি ।—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ঃ—অভিনয় একটি উৎকৃষ্ট আর্ট। যেমন সঙ্গীতবিৎদিগের মতে—

'পূর্ণং চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ।
ইমং তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ॥'

তেমনি চিত্র কার্য, কবিতা বা সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি সুকুমার কলার সার একত্রিত করিয়া 'অভিনয় কলা' উদ্ভূত হইয়াছে।

এ শিল্প ভারতবর্ষে ইংরাজদের আনীত নহে। ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে ভাবতবর্ষে আছে। প্রচলিত মতে মহর্ষি ভরত ইহার সৃষ্টিকর্তা। অতএব ইহা ভাবতবাসীর দ্বিগুণ আদরের বস্তু এবং ভারতে এ সুকুমার কলার উদ্ধারের সহিত সহানুভূতি করা এবং ইহাকে উৎসাহ দেওয়া প্রতি হিন্দুরই কতব্য।

সম্প্রদায়বিশেষেব কোন ভদ্র ব্যক্তিরাই বাঙ্গলা থিয়েটারে যাওয়ার প্রস্তাবে বিরোধী। তাঁহাবা অবশ্য সদুদ্দেশ্যে উক্ত মত প্রচার করেন। কে অস্বীকার করিবে যে, বাঙ্গলার বঙ্গভূমি সমুদয় যেরূপ উপাদানে গঠিত, তাহাতে উহাতে গমন দ্বারা তরলমতি বালক বা যুবকের নৈতিক উন্নতি হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই, বরং বিপরীত সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্গীয় রঙ্গভূমির বিপক্ষে এরূপ একটা Crusade চালাইবার কারণ দেখি না এবং তাহাতে আশু কি সুদূর ভবিষ্যতে যে কোন সুফলের সম্ভাবনা আছে, তাহাও বোধ হয় না। এ বিষয়টি নানা দিক হতে দেখা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, ইহাতে রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের দোষ কি? তাঁহাদের কার্যই

এই,—যে, তাঁহারা মনুষ্যের সাংসারিক ঘটনাবলীর প্রতিচ্ছবি রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন করান। গার্হস্থ্য গোলযোগ পাকাইতে যে পুরুষ একাই আছেন, তাহা নহে। রমণীগণও এ বিষয়ে সবিশেষ সহায়তা করেন ও বিলক্ষণ দক্ষতাও প্রদর্শন করেন। অতএব নারীকে ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ নরের চিত্র দিয়া, স্ত্রীকে ছাড়িয়া শুদ্ধ স্বামীকে লইয়া কোন প্রকার সাংসারিক ঘটনা চিত্রিত করিবার চেষ্টা করা যেরূপ উপন্যাস বা নাটক-রচয়িতার বিড়ম্বনা, সেইরূপ উক্ত ঘটনা স্টেজে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা স্টেজ ম্যানেজারেরও ধৃষ্টতা। হিন্দু সমাজে বাহিরের ঘটনাই আমরা সাধারণতঃ দেখি বটে, যেহেতু বাড়ির মধ্যে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ, কিন্তু বাহিরের ঘটনা ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে বাড়ির মধ্যের ঘটনা ভাল করিয়া জানা চাই। বাড়ির মধ্যের ঘটনা যেন বাহিরের ঘটনার 'মানের বহি'। এই যেমন, চাটুজ্যে মহাশয় (যিনি ৫৩ বৎসর বর্ষীয়, বিপত্নীক, সংসারে বিশেষ আস্থাহীন, বেশ-পরিপাট্য বিষয়ে সাধারণতঃ উদাসীন ব্যক্তি একদিন দেখা গেল, যে গোঁফে ও চুলে কলপ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং একদিন, এমনকি, একখানি শান্তিপুরে কালাপেড়ে ধুতিও পরিয়াছেন।

উক্ত মহাশয়ের এরূপ পরিবর্তনে আপনার, আমার বেশ একটু খট্‌কা লাগিতে পারে ; কিন্তু যিনি অন্তঃপুরের খবর জানেন, তিনি টক্ করিয়া অপনাকে বলিয়া দিবেন যে, চাটুজ্যে মহাশয় সম্প্রতি তৃতীয় বার দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন বা করিবেন। আবার ধরুন, সাধারণতঃ মজাটে ধরণের গোলগাল বেঁটে রসিক তেলচুকচুকে তেড়িকাটা কেরানী বাবুকে হঠাৎ একদিন ভারি বদরসিক, বদমেজাজ চুল উস্কোখুস্কো শুকনো দেখা গেল। ইহার মানে আর কিছুই নয়,—অনেকদিন হইতেই তাঁহার গৃহিণীকে একগাছি চন্দ্রহার গড়াইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হওয়া সত্ত্বেও সে বিষয়ে কার্যতঃ ঔদাসীন্যের জন্য তিনি অদ্য অপিসে আসিবার পূর্বে উক্ত গৃহিণীর কাছে বিলক্ষণ অপদস্থ হইয়া আসিয়াছেন। ডেপুটিবাবু গোকুল স্যান্যাল চিরকালটা নানারূপ অখাদ্য খাইয়া পৈতা ফেলিয়া দিয়া শেষে হঠাৎ একদিন প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। যদি তার সঙ্গে বল যে, তাঁহার কৃষ্ণবর্ণা বয়স্থা তিনটি কন্যা আছে এবং তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কোন প্রকারেই তাহাদের বিবাহের সুবিধা করিতে পারিতেছেন না ; অমনি সব জলের মত সোজা হইয়া গেল।

অতএব স্ত্রী চরিত্র কোন উপন্যাসে বা নাটকে বাদ দেওয়া যায় না ; বাদ দিলেও সে উহ্য থাকে।

কিন্তু এরূপ স্ত্রী চরিত্র বাদ দিযা, না হয একখানি সামাজিক দলাদলি সম্বন্ধীয় প্রহসন রচনা কবা যায। (কাবণ, স্ত্রীলোকেব সহস্র অপরাধ থাকিলেও ইহা স্বীকার্য যে, কোন দলাদলিতে তাহাবা নাই); কিন্তু একটু বিশিষ্ট বকম নাটকাদি লিখিতে হইলে স্ত্রালোকেব চরিত্রগুলি দেখাইতে হইবে। স্বামী যদি স্টেজে আসিয়া বলেন,—'ওঃ, আজ আমাকে কি বকুনিটাই বকেছে' —অমনি কৌতূহলবান দর্শক সেই বকনিটা আদ্যোপান্ত মূলে (First hand এ) শুনিতে চাহিবেই চাহিবে।

এখন, উক্ত সম্প্রদায অবশ্য নাটক হইতে স্ত্রীচবিত্র বাদ দিতে বলিবেন না। স্ত্রীচরিত্র যদি নাটকে বহিল ও তাহা যদি অভিনয কবিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোক ভিন্ন তা॰ সুচারুরূপে অভিনীত হইতে পাবে না। পুরুষ দ্বাবা স্ত্রীচরিত্র অভিনযেব চেষ্টা শুদ্ধ বঙ্গদেশে নয, অন্যত্রও হইযাছে ও তাহাব অসম্ভবতা পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন হইযাছে। যদি যুবকে স্ত্রীলোকেব part অভিনয কবে ত' সে যাড়েব স্ববে যেই বলিবে 'প্রাণনাথ' অমনি একেবাবে সমস্ত অভিনযটা মাটি হইযা যাইবে। এবং একটা ঘোবতব প্রাকৃতিক বিপ্লব অমনি দর্শকেব মনেব সম্মুখে ঝড়েব মত বহিয়া যাইবে। এছাড়া স্ত্রীলোকেব অঙ্গভঙ্গী, স্ত্রীলোকেব বাক্যভঙ্গী, স্ত্রীলোকের বচন, স্ত্রীলোকের ক্রন্দন পুরুষ দ্বাবা সম্যক্ অভিনয় হওযা অসম্ভব, শুদ্ধ কল্পনা করুন, একজন স্ত্রীবেশধাবী পুরুষ গ্রীবা বক্র কবিযা বলিতেছেন,—'ও মা, কথাব ছিবিখানা দেখ না'। শুনিলেই কি দর্শকেব তাহাকে ধবিযা 'উত্তম মধ্যম' দিতে ইচ্ছে কাবেবে না?

বালক দ্বাবা স্ত্রী চবিত্র অভিনয হওযাও সমান অসম্ভব। বালকেব চেহাবায ও স্ববে স্ত্রীলোকেব সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সে শৈশববশতঃ কাকাতুযা বা ময়নাব মত শিখান স্ত্রী বুলি বলিবে মাত্র, তাহার ভাবে, তাহাব Spirit-এ প্রবেশ কবিতে পাবিবে না এবং সেইজন্য তাহার অভিনয় ও প্রকৃতিমাফিক হইবে না। বিশেষতঃ দর্শকবৃন্দ যদি জ্ঞাত থাকেন যে, রাধিকা শুদ্ধ স্ত্রীবেশধারী বালক মাত্র, অমনই তাহাব সব কথাগুলি অমার্জনীয জ্যেঠামি ঠেকিবে এবং তখনই তাঁহাবা একটি মানসিক সমালোচনা সুরু কবিবেন—যাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলে দাঁড়ায় এই যে, বালকটিব মস্তক ভক্ষিত হইযাছে।

এ বিষয়ে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহা অতি স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরও সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, স্ত্রীচরিত্র স্ত্রীলোক দ্বারা যেরূপ অভিনীত হইবে, কোন পুরুষ ঠিক সেরূপটি পারিবে না। একজন স্ত্রীলোক কোন চরিত্র অভিনয় করিতে করিতে অতি শীঘ্র আপনাকে সেই চরিত্রের অবস্থান ও অনুভাবনায় আনিয়া ফেলে, এবং তাহার পরে তাহার প্রতি কথা স্বাভাবিক ঠেকিবে। কোন স্ত্রী-কণ্ঠবান পুরুষ বা বুদ্ধিমান বালক দ্বারাও সেটি হইবে না।

এখন অভিনয়ে যদি স্ত্রী চরিত্র সুচারুরূপে অভিনয় করিবার জন্য স্ত্রীলোক চাই, ত' সে স্ত্রীলোক পাওয়া যায় কোথা হইতে? কোন কুলনারী কি রঙ্গক্ষেত্রে আসিতে স্বীকৃত হইবেন? বিলাতে যেখানে অবরোধ প্রথা নাই, সেখানে না হয় ইহা কল্পনা করা যাইত, কিন্তু বঙ্গদেশে এরূপ ব্যাপার কল্পনা করা যায় না।

অর্থের জন্য, ব্যবসার জন্য, বঙ্গবধূগণ যে রঙ্গভূমির কর্তাদিগের শরণাপন্ন হইবেন, সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন এখনও আসে নাই, এবং কোন বঙ্গবধূ আসিয়াও নানাবিধ সংসর্গে ও প্রলোভনে পড়িয়া যে তাহার নির্মল কোমল আত্মসংযম-বিরহিত সরল চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিবেন, তাহারও আশা নিতান্ত কম। বঙ্গদেশে যে সব শিক্ষিতা, সংযতা, দৃঢ়চরিত্র কুলনারীরা আছেন, তাঁহারা এখনও ব্যবসার জন্য রঙ্গভূমি অবলম্বন করিতে অথবা যাহার তাহার সম্মুখে বাহির হইতে স্বীকৃতা নহেন। এ অবস্থায় রঙ্গভূমির কর্তাগণের উপায় কি? উক্ত সম্প্রদায়ই তাহা বলিয়া দিউন। তাহা হইলে কি রঙ্গাধ্যক্ষগণের একেবারে রঙ্গভূমি হইতে অভিনেত্রী বাদই দিতে হয় না? আর তাহাতে কি এই সুকুমার শিল্পটিও একেবারে মাটি হয় না?

দ্বিতীয়তঃ, থিয়েটার যে দেশে বারাঙ্গনা-কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, তাহা বোধ হয় না। ইহা তাহাদের মধ্যে জন কতককে জীবিকার একটি সৎ স্বাধীন উপায় দিতেছে মাত্র। এ উপায় পাওয়া সত্ত্বেও যদি তাহারা তাহাদের পূর্বব্যবসা চালায় ত থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের কর্তব্য যে, তাহাদিগকে দূর করিয়া দেন। এরূপ ব্যবসা শুদ্ধ তাহাদের নিজের পক্ষে ও জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহাও নহে, থিয়েটারের পক্ষেও উহা অনিষ্টকর। তাহারা যখন থিয়েটারের বেতনভোগিনী, তখন তাহাদের অন্য ব্যবসা করা থিয়েটারের কার্যের ক্ষতিকারক—কি জন্য, তাহা নিশ্চয় থিয়েটারের অধ্যক্ষগণকে বলিতে হইবে না।

তৃতীযতঃ, থিযেটারের কোন তরলমতি বালকের যে যাওয়া বাঞ্ছনীয তাহা আমি বলি না। কারণ, অতি বিশুদ্ধ থিযেটারে ক্রমাগত যাইলেও তাহার মন একটু বেশী সৌন্দর্যপ্রবণ হইযা যায। অভিনেত্রীর চরিত্র বিশুদ্ধ হউক না হউক, থিযেটারে একেবারে অভিনেত্রী থাকুক বা না-ই থাকুক, তাহার আলোকমালা, সঙ্গীত, সুন্দরবেশ, সুন্দর চিত্রাবলী তাহার মনে এরূপ স্থাযীভাবে অঙ্কিত হয যে, সে সর্বদা তাহাই দেখিতে চাহে, এবং মন এত অধিক চঞ্চল হইলে তাহাতে তাহার পাঠের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চলমতি, পাঠে মনোনিবেশ করিতে চাহে না, কোন প্রকার সংযম তাহার কাছে তিক্তবোধ হয, অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদির বিপক্ষে সে স্বতঃই বিদ্রোহী হয। শুদ্ধ সংসারে যাহা তাহার নূতন আশ্চর্যবোধ হয, তাহারই সে সহজ ব্যাখ্যা চাহে, অন্য কিছু তাহাকে দিলে সে ঔষধের মত তাহা গলাধঃকরে মাত্র। এরূপ অবস্থায তাহার মনকে আরও উড়ু উড়ু করান বিধেয নহে। John Stuart Mill এর সহিত সকলেই বলিলেন যে বালকদিগের উচিত আলোচ্য বিষয গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি,—ধর্মালোচনা বা সঙ্গীতাদি নহে। Art শিশুর জন্যে নহে, যুবকের জন্য।

এখন যুবকের যদি থিযেটারে যাইযা চিত্তবিকার জন্মে, তাহা হইলে সে দোষ সেই যুবকেরই, তাহা হইলে তাহার চিত্ত বিকার আগেই জন্মিযাছে। সে থিযেটারে আসে শুদ্ধ তাহার লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য। যদি কেহ উন্মাদ হইযা, যে নদীতে স্নান করিযা অন্যে স্নিগ্ধ হয, সেই নদীতে গিযা ডুবিযা মরে, সে দোষ কি সেই নদীর, না—সে দোষ সেই উন্মাদের? শিশুকে নদীতে ক্রীড়া করিতে যাইতে দেওযা উচিত নহে, কারণ সে পিছলিযা পড়িযা ডুবিযা যাইতে পারে, বিকৃত মস্তিষ্ক যুবকেরও সেখানে যাওযা উচিত নহে, কারণ, সে স্বেচ্ছায ডুবিয়া মরিতে পারে, কিন্তু তাই বলিযা কি নদী বহিবে না? তাহার সৌন্দর্য, তাহার মধুর জলকল্লোল সংসার হইতে লুপ্ত হইবে? অথবা তাই বলিযা কি কেহ নদীস্নান করিবে না?

এখানে হযত কেহ বলিবেন যে, এ উপমাটি ঠিক হইল না। নদীস্নানে দেহ পবিত্র হয়, থিযেটারে মন পবিত্র না হইযা বরং কলুষিত হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু ঐরূপ ভাবে উপমাটিকে গ্রহণ করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমার উদ্দেশ্য এই বলা যে, যেমন কাযিক শ্রান্তির পরে নদীস্নানে শরীর স্নিগ্ধ হয়,

তেমনই মানসিক শ্রান্তির পরে একটু বিশুদ্ধ আমোদ সঞ্জীবতাদায়ক। স্যর উইলিয়ম হণ্টার বলেন যে, বহু মানসিক পরিশ্রমের পর সুন্দর সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার দস্তুর মত বিশ্রান্তি বোধ হয়। শুদ্ধ সঙ্গীতে কেন, দীর্ঘ কষ্টকর চিন্তার পরে চিত্রদর্শনে, স্বাভাবিক সৌন্দর্য উপভোগে, চিত্তাকর্ষী কবিতা ও উপন্যাস পাঠে বা তৎশ্রবণে, মনের বিশেষ একটা শান্তি, আরাম, ইংরাজীতে যাহাকে relaxation বলে, তাহা হয়।

এখন চিত্ত স্নিগ্ধ করিতে গিয়া যদি কেহ সুনীতি ভ্রষ্ট হইয়া গোল্লায় যায়, ত নদী স্নান করিতে গিয়াও কেহ স্খলিতপদ হইয়া ডুবিয়া মরিতে পারে।

থিয়েটারের বায়ুই এরূপ দূষিত নহে যে, কোন যুবক সেখানে যাইলেই তাহার মন একেবারে বিগড়িয়া যাইতে হইবে। অনেক বঙ্গ থিয়েটারগামী এবং থিয়েটারগামিনী রমণীকে জানি—যাঁহারা বিশুদ্ধ চরিত্র, অর্থাৎ থিয়েটার বিমুখ পুরুষ ও থিয়েটার বিমুখিনী রমণীদের মতই। পক্ষান্তরে, থিয়েটারে না যাইলেই যে চরিত্র বিশুদ্ধ থাকিবে, এ কথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বলিতে পারেন না।

তবে আমি এ কথা বলি না যে, কেহ কখনও আমোদ উপভোগ করিতে থিয়েটারে গিয়া বিকৃত মস্তিষ্ক লইয়া ফিরিয়া আসে নাই বা আসিতে পারে না। কিন্তু এরূপ বিভ্রাট পৃথিবীতে সর্বত্রই ঘটে। বিদ্যালয়েও সুসঙ্গ ও কুসঙ্গ দুই আছে। বিদ্যালয়ে যদি কোন কোন ছাত্র সুসঙ্গ ছাড়িয়া, বিদ্যাভাস ছাড়িয়া, কুসঙ্গটুকু গ্রহণ করে, তাই বলিয়া কি বিদ্যালয়টি লোপ করিতে হইবে? বৃক্ষে সুস্বাদু ফল ফলে, সুগন্ধি ফুল ফোটে; কিন্তু কেহ যদি তাহা পাড়িতে বৃক্ষে উঠিতে গিয়া পড়িয়া হাত পা জখম করে, তাহা হইলে কি সেই বৃক্ষটিকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে?

চতুর্থতঃ, বঙ্গীয় রঙ্গভূমিগুলি হইতে সমাজের শুদ্ধ যে বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই—তাহা নহে, ইহার অন্যবিধ উপকার ছাড়িয়া দিলেও ইহা সমাজের ছোট-খাট একটি নৈতিক উপকারও সাধিত করে। অনেক বঙ্গীয় যুবক যে বারাঙ্গনালয়ে গতিবিধি করেন, তাহা আধুনিক বঙ্গ সমাজে একটি বিশেষ অভাব অনুভব করিয়া। বঙ্গীয় সমাজে অবরোধ প্রথার জন্য যুবক নিজের স্ত্রী ভিন্ন বিশেষ অন্য কোন রমণীর সহিত সদালাপ করিতে পান না। মাতা, ভগিনী, কন্যার সহিত শুদ্ধ কাজের কথা ভিন্ন কোন প্রকার ক্রীড়া,

রহস্য, বন্ধুভাবে তর্ক ও গল্প চলে না—সঙ্গীত চর্চার কথা দূরে থাকুক। আমোদ আহ্লাদের সম্পর্কের মধ্যে প্রচলিত প্রথামতে নারী জাতির মধ্যে শ্যালিকা ও বেহাইন। এখন শ্যালিকা ও বেহাইন নাকি সকলের নাই। আর থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা সব সময়ে উচিত মত অধিক নহে। এইজন্য পৃথিবীর মধ্যে যে একটি অতি সুন্দর পদার্থ নারীমুখ, একটি যে অতি কোমল মধুর বস্তু—নারী কণ্ঠ, একটি যে মহৎ পবিত্র জিনিস—নারী চরিত্র, একটি যে অতি মনোহর সৃষ্টি—নারী হৃদয়, তাহা সে অধিক দেখিতে পায় না। ইহার অভাব সে বড় বেশী অনুভব করে। এ অবস্থায় সে সৎনারীর সহিত সদালাপ ও সৎ সংসর্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া যদি কুনারীর সহিত কদালাপ ও কুসংসর্গ করিতে যায়, তাহাতে বিচিত্র কি? তাহার সমাজে কোন বিশুদ্ধ চরিত্র নারী —বাহির না হওয়ায়, সে যাহারা বাহির হয়, তাহাদের কাছেই যায়, এবং তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংসর্গে তাহার অধোগতি আরম্ভ হয়। এখন থিয়েটারে ঐরূপ নারীর সহিত ঘনিষ্ঠ সংসর্গে না আসিয়া সে কতক তাহার সে স্বাভাবিক অন্য নারী দর্শন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে; তাহাতে হয়ত সে পরিতৃপ্ত হইয়া ঐখানেই ক্ষান্ত থাকে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসিলে অবনতির শেষ ধাপে পৌছিবার পূর্বে তাহার আর ক্ষান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব থিয়েটার বঙ্গীয় যুবকের morality-র এক রকম Safety Valve স্বরূপ কায করে।

বাঙ্গলার এরূপ থিয়েটার না থাকিলে যদি যুবকদিগের নৈতিক বিশুদ্ধতা থাকিত, তাহা হইলেও নীতির জন্য এ Art বিনাশ করা উচিত কি না তা হয় একটা প্রশ্ন হইত। কিন্তু এ থিয়েটার বন্ধ হইলে কোন একটা নৈতিক প্রশ্নের কি সন্তোষকর রূপে মীমাংসা হয়? যখন থিয়েটার ছিল না, তখন কি দেশে বারাঙ্গনালয়ের কিছু অল্পতা ছিল? থিয়েটার না হয় বন্ধ করা গেল, কিন্তু কলিকাতার অলিগলির মন্দ ঘরগুলি ত বন্ধ করা যায় না। তাহারা (পূর্বোক্ত সম্প্রদায়-বিশেষ) কি জানেন না যে, শুদ্ধ কলিকাতায় নহে—এ বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামে প্রতি নগরে যথেষ্ট বারাঙ্গনালয় আছে। তাহা লোপ করিবার উপায় কি?

এ নৈতিক প্রশ্নের সন্তোষকর মীমাংসা থিয়েটারে অভিনেত্রী কুল লোপ করিয়া হইবে—না, যুবকদিগকে উচ্চ নৈতিক শিক্ষা দিয়া হইবে? প্রলোভন সংসারের সর্বত্রই; একস্থানে না হয় আর এক স্থানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেই। তাহাকে পরাভূত করিবার শক্তি যাহাতে যুবকদিগের হয়,

তাহাই করিতে হইবে। মনকে উক্ত প্রলোভনের বিপক্ষে inoculate করিতে হইবে। নহিলে যুবকদিগের মদিরাপান-বিজড়িত উচ্চকণ্ঠে 'Beautiful' ও 'Encore' রঙ্গালয়ে ধ্বনিত না হইয়া কুৎসিততর-জায়গায়, কুৎসিততর সঙ্গে, না হয় চিৎপুর রোডের দ্বিতল ঘরে ধ্বনিত হইবে। লাভের মধ্যে একটি সুন্দর, মনোমুগ্ধকর উচ্চ সুকুমার কলাকে তাহার শৈশবেই গলা টিপিয়া মারা হইবে মাত্র।

ঈশ্বরের কাছে Lead us not unto temptation and give us strength to over come it. হৃদয়ের এই দৃঢ়তাই প্রকৃত চরিত্রবল ও নৈতিক বিকাশ। St. Augustine অবৈধ চিত্ত-প্রবৃত্তি রোধ করিবার প্রয়াসে কণ্টক বনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, বিল্বমঙ্গল লালসার বেগ সামলাইতে না পারিয়া নিজের চক্ষু বিদ্ধ করিয়াছিলেন, খ্রীস্টধর্মে শিক্ষা দেয় যে, 'যদি তোমার চক্ষু আমার বিশুদ্ধির অন্তরায় হয় ত তাহাকে উৎপাটিত কর, কারণ চক্ষু হইতে আত্মা মূল্যবান।' হিন্দু ঋষিগণ প্রলোভন হইতে দূরে থাকিবার জন্য সংসার ত্যাগী হইতেন; কোন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন, যেখানে যুদ্ধ করা দুরূহ, সেখানে পলায়নই শ্রেয়ঃ। পুরাকালে সবত্রই প্রলোভন হইতে পলায়নই শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইত; এবং উক্ত নীতি কখন কখন সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ে আপাত হিতকর বোধ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত উপায়গুলিতে প্রকৃত চরিত্রবল হয় না, ও উপায়গুলি চরিত্র রক্ষার শেষ উপায়। যে চরিত্র প্রথম হইতেই এরূপ যে, প্রলোভনে পড়িলেই ডুবিবে, সে চরিত্রই ত গোড়াগুড়িই খারাপ, কেবল লোকে তাহা জানিতে পারে নাই মাত্র। তাহা আর রক্ষা হইল কৈ?

রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণের কসুর আছে। তথাপি তাঁহাদের সহস্র অন্যাবধ দোষ থাকিলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাহারা রঙ্গালয়ের কোন যুবকের অযথা আচরণের প্রশ্রয় দেন না এবং কোন নাটকে কি প্রহসনে ও বারাঙ্গনাদিগের কোন চিত্তহারী-অভিরাম চিত্র আঁকেন না। বরং আমি যত অভিনয় দেখিয়াছি, তাহাতে সর্বস্থানেই বারাঙ্গনা একটি নাটকের চরিত্র হইলে সর্বত্র নাটককার তাহার কুৎসিত ছবিই আঁকিয়াছেন।

আজ থিয়েটারের প্রতি সাধারণের কর্তব্য বিষয়ে সংক্ষেপে কহিলাম, থিয়েটারগুলির কি কর্তব্য, তাহা বারান্তরে আলোচনা করিব।

(ভারতী : মাঘ—১৩০২।)

নাটক ও তাহার অভিনয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ :—

"আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে অত্যুৎকৃষ্ট নাটকাদির অস্তিত্ব থাকিলেও বর্তমান বাঙ্গালার নাটকাদি বিলাতী নাটকেরই অনুকরণে রচিত হইয়াছে।

যাঁহাদের দ্বারা বঙ্গে রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা, এবং সেই সময় হইতে আজও পর্যন্ত যাঁহারা বঙ্গভাষায় নাটক লিখিয়া আসিতেছেন, সকলেই অল্পবিস্তর ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ, সকলেই পাশ্চাত্ত্য নাটকাদির কিছু না কিছু রস গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক স্থলেই পাশ্চাত্ত্য নাট্যকার, বিশেষতঃ শেকস্‌পীঅর—এখানকার কবিগণের নাটক রচনার প্রবোচক। সেইরূপ ইংরাজী নট এদেশে আসিয়া শেকসপীঅরের নাটকাদির অভিনয় দেখাইয়া এখানকার মনীষিগণের মনে বর্তমান যুগানুযায়ী অভিনয় প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখানকার নাটকের কথা বলিতে হইলে পাশ্চাত্ত্য নাটকের,—এখানকার অভিনয়ের কথা বলিতে হইলে পাশ্চাত্য অভিনয়ের—কথঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। পাশ্চাত্ত্য রঙ্গালয়ের ইতিহাস আমি যতটুকু পাঠ করিয়াছি, তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছি যে নাট্যকলার উন্নতির সঙ্গে জাতীয় জীবন যেন অনেকটা জড়িত। অনেক স্থলেই দেখিয়াছি, জাতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকলার উদ্ভব হইয়াছে. জাতীয়ত্বের প্রথম পবিত্র সমুজ্জ্বল বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যসাহিত্য-কুসুমও দেশব্যাপী সৌরভ লইয়া বিকশিত হইয়াছে। এমন কি এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি কাহার প্রবোচক, তাহাও অনেক সময় উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া উঠে।

ধর্মের একটি সূত্র অবলম্বন করিয়া জাতির গঠন হয়। সেই সূত্রটি ধরিয়াই আবার নাট্যকলা লীলা করিয়া থাকে। অনেক সময়ে স্থূল দৃষ্টিতে যদিও তাহা সকলের বোধগম্য না হইতে পারে, কিন্তু একটু গবেষণার সহিত নিরীক্ষণ করিলে সে সূক্ষ্ম সূত্রটি দৃষ্টিগোচর হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস; এমন কি সাধারণ আমোদ-উল্লাসপূর্ণ নাটকাদি তাহাদের স্থূল বহিরাবরণ দিয়াও সে সূত্রের অস্তিত্ব ঢাকিয়া রাখিতে পারে না।

জাতীয় ধর্ম অবলম্বন করিয়াই গ্রীক্ নাট্যসাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। জাতীয়ধর্ম অবলম্বন করিয়াই রোমীয় সাহিত্য গ্রীকের পথানুসরণে সমর্থ হইয়াছিল। ফরাসীদেশেও নাট্যসাহিত্যের চরমোৎকর্ষ সপ্তদশ শতাব্দীতে। 'স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী' তখন ধর্মরূপে ফরাসী জাতির হৃদয়ে রাজ-বিদ্বেষ-বহ্নি

ধীরে ধীরে প্রধূমিত করিতেছিল। ইংলণ্ডেও ধর্মসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিয়াছে। সে সময়ে ইংলণ্ডের নব সংস্কৃত ধর্ম ও সঙ্গে সঙ্গে নবাভ্যুদিত জাতিকে বিধ্বস্ত করিতে আসিয়া, স্পেন সম্রাটের প্রচণ্ড নৌবাহিনী ইংলণ্ডের উপকূলের তাহারই ক্ষুদ্র নাবিকগুলির শক্তি সাহায্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়েই মহাকবি শেকস্‌পীঅর তাহার নবরচিত ভুবনামোদিনী পুষ্পমালা মাতৃভূমিকে উপহার দিযাছিলেন।

কিন্তু নাটক ও নটচর্যা অভিন্নাত্মক হইলেও, ইংলণ্ডে দুইটিই একসময়ে সমান স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় নাই। তা যদি হইত, তাহা হইলে মহাকবির অস্তিত্ব লইয়া আজও পয্যন্ত পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের মধ্যে বিতর্ক চলিত না। এখনও পর্যন্ত লর্ড বেকনের আত্মার প্রতিভূ 'হ্যামলেট', 'ম্যাক্‌বেথ' প্রভৃতির স্বত্বাধিকার লইয়া সাহিত্যিক-মহল গণ্ডগোল করিতেছেন। তামাদি আইনে অধিকার-চ্যুত না হইলে, বেকনের ভাগ্য যে সুপ্রসন্ন না হইত, তাহা কে বলিতে পারে? কবির জন্মভূমিতে স্মৃতি মন্দির রচিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার জন্ম দিন লইয়া অগণ্য উৎসব কার্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখনও শেকস্‌পীঅরের নির্দিষ্ট আসনে বেকনকে বসাইতে কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না।

ইহার প্রধান কারণ—যে সময় শেকসপীঅর নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সে সময় নাট্যাভিনয় লোক-সমাজে, বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিকগণের ভিতরে সম্যক্ আদৃত হয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, নাটক ও নাটকাভিনয় একরূপ অভিন্নাত্মক। নাটক ক্রিয়াচিত্র—নটচর্যায় সেই ক্রিয়াচিত্রের উপলব্ধি। পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া উভয়ে নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। অনভিনীত নাটকের প্রচ্ছন্ন নাটকত্ব লইয়া আমরা মনকে প্রবোধ দিতে পারি, কিন্তু যে নাটক অভিনয়ে কখনও স্ফূর্তি পায় নাই, তাহা ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ হইলেও কাব্য-সাহিত্য, নাটক নহে। পক্ষান্তরে অশিক্ষিত চিত্রকরের অমার্জিত কলাকৌশল অভিনয়-নৈপুণ্যে যদি জীবিতবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহা সাহিত্যে স্থান না পাইলেও নাটক।

অভিন্নাত্মক হইলেও ইংলণ্ডে নাটক ও তাহার অভিনয় সমসময়ে স্ফূর্তি পায় নাই। কবি কালস্রোতে প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকের ন্যায় কোন অজ্ঞাত দেশ হইতে যেন ভাসিয়া আসে। নিশ্চিন্ত জলাবগাহী উপকূলবাসী জলে ডুব দিয়া আবার মাথা তুলিতে দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহা শিরঃসংলগ্ন-

স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডবাসীর শেকস্‌পীঅর-প্রাপ্তি সেইরূপই হইয়াছিল।

তখন দেশে ল্যাটিন ও গ্রীক্ ভাষাতে যাঁহার ব্যুৎপত্তি না থাকিত তিনি পণ্ডিত বলিয়া সমাদৃত হইতেন না। এই দুই ভাষাই তখন সাহিত্যিকদিগের অবলম্বন ছিল। শেকস্‌পীঅর এই দুই ভাষাতে একরূপ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রাদুর্ভাবের কিছু পূর্বে অভিনয় ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তক লইয়া হইত, এবং তা ধর্মযাজকগণের একরূপ একায়ত্ত ছিল। অধিকাংশ অভিনয় ল্যাটিন ভাষাতেই সম্পন্ন হইত। জাতীয়ভাষায় রচিত পুস্তক সর্বপ্রকারে হৃদয়াকর্ষণ করিলেও, পাণ্ডিত্যাভিমান তাহাকে সাহিত্যের গণ্ডীর বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া রাখিত।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে, সে সময়ে ইংলণ্ডের অবস্থা অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। আমাদের দেশে এখনও যদি কাহারও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতা না থাকে, তিনি পণ্ডিত সমাজে সম্যক্ আদর পান না। বঙ্গভাষায় সর্ববিদ্যাবিশারদ হইলেও ইংরাজী ভাষা-জ্ঞানের অভাবে কোন ব্যক্তি পূর্ণ পাণ্ডিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। পাণ্ডিত্যের এই বিধিবন্ধন, সৌভাগ্যক্রমে, আজকাল অনেকটা শিথিল হইলেও, এখনও লোকের মন হইতে তাহা সম্যক্ বিদূরিত হয় নাই। শেকসপীঅরের সময় ইংরাজী ভাষারও এইরূপ দুরবস্থা ছিল। এইজন্য শেকসপীঅর সুধী-মণ্ডলী মধ্যে স্থান পান নাই।

তাহার উপর, যাহারা নট, তাহাদের সমাজে একেবারেই প্রতিষ্ঠা ছিল না। এটা যে শুধু ইংলণ্ডের কথা তাহা নহে। অন্যান্য দেশেও নটের ব্যবসায় সমাজে নিন্দনীয় ছিল। ভারতবর্ষে অভিনয় কার্য সমাজের নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। কেহ ব্যবসায়রূপে নটের কায গ্রহণ করিলে, উচ্চশ্রেণীর লোক হইলেও, লোকে তাহাকে ঘৃণা করিত। এই সকল কারণে শেকসপীঅরের নাটকাদির অভিনয়ও বিলাতের সমাজ গুণানুযায়ী আদর প্রাপ্ত হয় নাই।

নাটকাদির অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইলেও অভিজাতবর্গ হৃদয়ের আনন্দ সম্যক্ প্রকাশে লজ্জাবোধ করিতেন। অভিনেতৃগণের উপর অনুগ্রহ প্রকাশার্থেই যেন তাঁহারা অভিনয় দেখিতেন।

এই জন্য নাট্যকলা মনোমুগ্ধকারী শক্তি হই ও শেকস্‌পীঅরের প্রাদুর্ভাব-কালে আশানুরূপ প্রস্ফুটিত হইতে পারিল না। অভিনেতৃবর্গের উপর ঘৃণার

কিয়দংশ নাটককারের উপর পড়িল। ডাক্তার ইঙ্গল্‌বী নাটককার লজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'যদিও লজ কখনও রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করেন নাই, তথাপি অভিনয়ার্থ নাটক লিখিয়াছিলেন বলিয়া তিনিও ঘৃণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।' শেকস্‌পীঅর নাট্যকার ও অভিনেতা। এই অপরাধে মহাকবি দেশবাসিগণের নিকটে একরূপ অপরিজ্ঞাতই রহিয়া গেলেন। শেকস্‌পীঅরের মৃত্যুর পর কিছুদিন অভিনয়ের আদর ক্রমশঃই কমিতে লাগিল। অবশেষে ক্রমওয়েলের সময় রাষ্ট্র বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রুচিবাদীগণের উদ্ভবে কর্তৃপক্ষের আদেশে রঙ্গালয় কিছুদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। মহাকবির সময়ের তাঁহার অপূর্ব নাটকাদির অপূব অভিনয় স্মৃতি দেশবাসীর মন হইতে একরূপ মুছিয়া গেল।

দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে নাট্য-সাহিত্য ও রঙ্গালয়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু তখন তাহার অবস্থা অতি হীন। ভাষা, অলঙ্কার সৌন্দযে আপনার স্বরূপ ঢাকিবার জন্য যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিল অভিনয়ও সেইরূপ সুরের আবরণে আপনার স্বাভাবিকতা আবৃত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্বের কৃষ্ণযাত্রায় চরিত্রাভিনয়ের আবৃত্তি যাহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই একথা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। এখনও পযন্ত মজলিসে অনেকেই সেই সকল অভিনয় লইয়া রহস্য করিয়া থাকেন।

ক্রমে এরূপ হইল যে—অভিনয় দ্বারা সু-সমীক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত মহাকবির নাটকের ভাষা অভিনয়ের জন্য পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

আমাদের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি ও বিলাতের লর্ড সভার অন্যতম নেতা লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউনের জনৈক পূর্বপুরুষ এই সকল নাটক পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিলেন। গ্যারিকের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব পযন্ত বিলাতের রঙ্গালয়ে যুগানুযায়ী রচিত বহু নাটকের সঙ্গে শেকস্‌পীঅরের এই সকল পরিবর্তিত নাটক অভিনীত হইতেছিল। এই ভাবে অভিনয় কার্য চলিতে থাকিলে শেকস্‌পীঅরের নাটকগুলির কি অবস্থা হইত, তাহা কে বলিতে পারে। কিন্তু এরূপ দুর্ভাগ্যে ইংলণ্ডকে বহু দিন ভুগিতে হয় নাই। রঙ্গালয়ে এক প্রতিভাবান অভিনেতার আবির্ভাবে দেশবাসীর মোহ ছুটিয়া গেল। বহুদিনের ঘন সঞ্চিত মেঘরাশি এক জনের বাণী স্পন্দিত সমীরণে মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হইয়া গেল। তখন সর্বতোমুখী প্রতিভার উজ্জ্বলতায় উচ্ছ্বসিত মহাকবির প্রকৃতমূর্তি ইংলণ্ডবাসী দেখিতে পাইল।

গ্যারিকের পূর্বে একজন সুদক্ষ অভিনেতা শেকসপীঅরের নাটক চরিত্রের ও তাহার ভাষার অপরিবর্তনীয়তার আভাস প্রদান করেন। উক্ত অভিনেতার নাম ম্যাকলিন। মহাকবির জন্মের প্রায় একশত বৎসর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৎকৃত সাইলকের অভিনয় দেখিয়া লোকে বুঝিল, ভাষার পরিবর্তনে ও তজ্জনিত অস্বাভাবিক অভিনয়ে এতকাল কেবল শেকসপীঅরের বধ কার্য সাধিত হইয়াছে। লোকে বুঝিল অন্যান্য চরিত্রগুলি এইরূপ অভিনীত হইলে শেকসপীঅর পুনরুজ্জীবিত হইতে পারেন।

লর্ড ল্যানসডাউন শেকসপীঅরের অন্যান্য নাটকের ন্যায় 'মারচেনট অব ভিনিস' নাটকখানিও পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই পরিবর্তিত নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া কেবল প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। একটি প্রতিষ্ঠিত প্রথার পরিবর্তন যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা ম্যাকলিনের এই সাইলক চরিত্রের অভিনয়-কাহিনী হইতেই বুঝিতে পারা যায়।'

বাংলা নাটক ও গিরিশ-যুগ ঃ—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ঃ—

'এদেশে যখন নাট্যশালার সৃষ্টি হয়, তখন দেশে একটা অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজী ভাব, ইংরাজী চিন্তা, ইংরাজী সভ্যতা, ইংরাজী আচার ব্যবহার নিষ্ঠা, বাঙ্গলার অচলায়তনের শতমুখী যে শিকড়, তাহাকে শতদিক হইতে নড়াইয়া দিয়াছে, বাঙ্গালী জীবনের ধারা এই সময় হইতে সকল দিকেই বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার সাহিত্যও এই সময়েই নব কলেবর ধারণ করে। বহু বিবাহে বিতৃষ্ণা, বিধবা বিবাহের প্রচলন, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি নব আচার এই সময়েই ইহার বহুদিনের অন্ধ সংস্কারকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। অখাদ্য ভোজন, বিলাত গমন, অস্পৃশ্যতা নিবারণের দুঃসাহস এই সময়ই আমরা লক্ষ্য করি। তাহার ধর্ম জীবনের ঘোর পরিবর্তন এই সময় সবাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালী এই সময়েই বুঝিতে আরম্ভ করে যে, পৌত্তলিকতা মহাপাপ। ইংরাজী শিক্ষায় ধরন্ধর যাঁহারা, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহার পূর্বপর হইতেই খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী জন্মের প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাই কৃষ্ণ বন্দ্যো, মাইকেল, কালী বন্দ্যো, বাঙ্গালী হইয়াও খ্রীস্টান। রাজনৈতিক জগতে বিপ্লব বাধাইতে সুরু করিয়াছেন, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ,

কৃষ্ণদাস পাল। এই যুগ সন্ধিক্ষণে সাহিত্যে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই সুর ধরিলেন,— 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে'। তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীকে বলিলেন, পৌত্তলিক বলিয়া মাথা হেঁট করিও না, তোমার দশভূজা দুর্গা তোমার মা তোমার জন্মভূমি। এই যুগেই রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের স্কন্ধ লইয়া নব বিধানের সৃষ্টি করিলেন আচার্য কেশবচন্দ্র। খ্রীস্টান হইবার যে স্রোত বহিতেছিল—তাহাতে ভাঁটা ধরিল। কিন্তু কেশবচন্দ্রের এ ধর্মও হিন্দু ধর্মের সহিত ঠিক খাপ খাইল না। ইহা না ইংরাজী না হিন্দু এইরূপ একটা উপাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল মাত্র। যে সকল শিক্ষিতের দল পুরাপুরি ইংরাজিত্ব বজায় রাখিয়া হিন্দু হইবার বাসনা করিয়াছিলেন তাঁহারা কেশবকে ত্যাগ করিয়া 'সাধারণে'র পতাকা উড়াইলেন। এই সর্ববিধ বিপ্লবের ঘোর আবর্তনের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে এক কৌপিনমাত্র-সার-পূজারী ব্রাহ্মণ সমন্বয়ের উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া, বাঙ্গালীর ধর্মজীবনের যে বিপ্লব চলিতেছিল, তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। Salvation army-র মৃদঙ্গ ও করতালের মধ্যে নববিধানের মৃদঙ্গ সুরে সুর মিশাইল! এই যে বিপ্লবের যুগ, ইহাতে বাঙ্গলা নাট্যশালায় প্রকাশ-ভঙ্গি কি ভাবে হইয়াছিল—সেই কথাই বলিতেছি।

প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় (Public Theatre) খোলা হয়, দীনবন্ধুবাবুর 'নীলদর্পণ' লইয়া। স্রোত মন্দ, নদী ক্ষীণতোয়া! মাইকেলের মেঘনাদবধ, কৃষ্ণকুমারী, দীনবন্ধুর কয়েকখানি নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত কয়েকখানি উপন্যাস, ইহাই তখনকার রঙ্গালয়ে পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইত। খাদ্য সুমিষ্ট—উপাদেয়, কিন্তু পৌণঃপৌণিক অভিনয় হেতু ক্রমশঃ তাহা দর্শকের অরুচিকর হইয়া উঠিতে লাগিল। দর্শক নূতনের প্রয়াসী, কিন্তু নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্র অনুর্বর, রসের হাটে দুর্ভিক্ষ। শেষে এমন হইল—খাদ্যের বিচার রহিল না। রঙ্গমঞ্চে অনেক নূতন নাট্যকার দেখা দিলেন, বাঙ্গলাভাষার লেখকগণের নামের তালিকা খুঁজিলে, তাঁহাদের অনেকেরই নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাল সেই সব গ্রন্থকারের স্মৃতি পর্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছে। সান্যালবাড়ীর থিয়েটার খোলার দুইচারি সপ্তাহ পরেই, গিরিশচন্দ্র দিন কয়েকের জন্য সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থায়ীভাবে তখন তিনি ইহাতে যোগ দেন নাই। ইহার ছয় সাত বৎসর পরে তিনি

থিয়েটারকে পেশা বলিয়া গ্রহণ করেন ; এই কয়টা বৎসরই বাঙ্গলা থিয়েটারের একপ্রকার অন্ধকারের যুগ। এখনকার গিরিশচন্দ্র কিন্তু নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নহেন, অভিনেতা গিরিশচন্দ্র মাত্র,—শুধু অভিনেতা নহেন, শিক্ষক গিরিশচন্দ্র. আচার্য গিরিশচন্দ্র। বয়সে, আকারে, বিদ্যায়, প্রতিভায় গিরিশচন্দ্র বাঙ্গলার আদিনাট্যশালার—'ন্যাশানালের'—সদস্যগণের মধ্যে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণী! অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থের বিশিষ্ট চরিত্রাভিনয়ে দর্শকবৃন্দকে জানাইয়া দিল যে, এই বিকাশোন্মুখ আলোক-রেখা আপনার প্রদীপ্ত তেজে একদিন বাঙ্গলার নাট্যগগনকে সমুদ্ভাসিত করিবে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের পুস্তক ফুরাইল, অপ্রথিতযশা যে সকল নব অভিযানকারী নাট্যকার রঙ্গমঞ্চ দখল করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচিত নাটকে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়োপযোগী চরিত্র কিছুই ছিল না। এদিকে দর্শকের নাটক উপভোগের ক্ষুধা নাট্যশালার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিয়াছে, সধবার একাদশী, কৃষ্ণকুমারী. নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, দুর্গেশ-নন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা পুরাতনের পর্যায়ে পড়িয়াছে। দর্শক বলিতেছেন, নূতন কি আছে দেখাও নূতন কি আছে দাও। অভিনেতা গিরিশচন্দ্র বিভ্রান্ত। সহকর্মী এক একজন দিগ্বিজয়ী অভিনেতা; আচার্য অর্দ্ধেন্দুশেখর ভরতের ন্যায় অভিনয় কলা-কুশল। সুকণ্ঠ অমৃতলাল মিত্র, প্রিয়দর্শন মহেন্দ্রলাল, তীক্ষ্ণধী সুরসিক ভুনীবাবু (নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু, বিবিধ রসাভিনয় পটু প্রতিদ্বন্দ্বীহীন কাপ্তেন বেল (অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়) সহ সহোদর কলাবিদ্ নগেন্দ্র বন্দ্যো, সুগায়ক রাধামাধব কর, শিল্পীর মতিসুর প্রভৃতি অভিনেতৃবৃন্দ এক একজন এক এক বিভাগে দিক্পাল! ইহাদের অভিনয়োপযোগী নাটক না পাইলে অভিনয় করিয়া তৃপ্তি কোথায়? একদিকে দর্শকবৃন্দের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে এই অভিনেতৃবৃন্দের অতুলনীয় প্রতিভা, —পূজার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু বাণীর চরণে নিবেদন করিবার নৈবেদ্যের অভাব, পুরোহিত গিরিশচন্দ্র অধীর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রতিভা তো কখনও অভাবের আবেষ্টনে অবরুদ্ধ থাকে না,—সে আপনার পথ আবিষ্কার করিয়া লইল। এই শুভ অবসরে, নিতান্ত প্রয়োজনে, নাট্যভারতীর চরণে প্রণাম করিয়া ভয়-ভক্তি-প্রণত হৃদয়ে গিরিশচন্দ্র লেখনী ধারণ করিলেন। বাঙ্গলায় নাট্যশালার ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের এই লেখনী ধারণ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্মরণীয় ঘটনা।

প্রায় বত্রিশ কি তেত্রিশ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের জন্য পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন এবং আটষট্টি বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনের সঙ্গে এই লেখনী বিরাম লাভ করে। এই পঁয়ত্রিশ বৎসরে মধ্যে তিনি প্রায় শতাধিক নাটক, গীতিনাটক, প্রহসন প্রণয়ণ করিয়াছেন। এই দিন হইতে তাঁহার জীবদ্দশায়, বাঙ্গলার দর্শকবৃন্দকে কখনো নূতন নাটকের অভাব অনুভব করিতে হয় নাই।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক 'আনন্দরহো', প্রথম গীতি-নাটক 'আগমনী'। তিনি মুখে মুখে এমন অনেক প্রহসন ও ব্যঙ্গনাট্য রচনা করিয়াছিলেন যাহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলেও ছাপাখানার ছাপ লইয়া কখনো পাঠক সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই।

বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী সমাজ গিরিশচন্দ্রের নিকট কি পরিমাণে ঋণী, তাহা গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করিলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আভাস দিবার চেষ্টা করিব মাত্র। বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে, ধর্মজীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব রঙ্গমঞ্চ হইতে আমি যে ভাবে লক্ষ্য করিযাছি, আপনাদিগকে সেই পুরাতন কথাই শুনাইব।

পঞ্চাশবৎসর পূর্বে, দেশে যখন এই ধারাবাহিক অভিনয় প্রথা প্রচলিত হয়, তখন যাত্রা ও কীর্তন এবং পাচালী প্রভৃতিরই প্রচলন ছিল। কথকতা, রামায়ণ গান, ধর্মের গান, চণ্ডীর গান প্রভৃতি তখন একরূপ নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত। ইংরাজী ভাষা ও ভাবকে আশ্রয় করিয়া যেমন আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি ইংরাজী নাটকের পদ্ধতি অনুসারে এ দেশের ভাবকে যদি নাটকের ছাচে মূর্তি দেওয়া যায় তাহা হইলে সহজেই তাহা বাঙ্গালীর প্রাণকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে—এই যে জাতীয় হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিবার শক্তি, ইহাই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তিনি ইংরাজী শিখিয়াছেন, ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে বাঙ্গালীর প্রাণের ভাব বৈশিষ্ট্য কখনো হারাইয়া ফেলেন নাই। তিনি বাঙ্গলার প্রচলিত গান, গাথা, গল্প অবলম্বন করিয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। বাঙ্গালীর প্রাণের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়াই নাট্যসাহিত্যে তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে

নাই। তাঁহার পৌরাণিক নাটকের প্রথম পুস্তক 'রাবণ বধ'। তাঁহার এই প্রথম নাটক অভিনয়ের পর হইতেই লোকে তাঁহার পরবর্তী নাটকের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিত। এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে দর্শকের অভাব ঘটিয়াছে এ ঘটনা বোধ হয় কষ্টে স্মরণ করিয়া বলিতে হয়। এইরূপ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলিয়াই বাঙ্গলাদেশে নাট্যমঞ্চের জন্মদাতা-রূপে তিনি চিরদিন স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া রহিবেন। এই অধিকার বলেই তিনি—কলিকাতা শহরের একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তান গিরিশচন্দ্র—চারি পাঁচটি নাট্যশালার সৃষ্টি ও পুষ্টি বিধান করিতে পারিয়াছিলেন। অতীতকালে নাট্য-পূজারীর পূজার আসন যদি গিরিশচন্দ্র এইরূপে প্রতিস্থাপিত করিয়া না যাইতেন, তবে আজ নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের যে কি অবস্থা হইত, তাহা কল্পনায় ধরিয়া লওয়া অসম্ভব নহে। কৃত্তিবাস কাশীদাস, ভক্তমাল, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বাঙ্গালীর নিত্য-পাঠ্য, নিত্যপূজ্য গ্রন্থমালার অবদান পরম্পরা হইতে একখানির পর একখানি করিয়া, মণির পর মণি গাঁথিয়া—নাট্যভারতীর গলে তিনি যে অপরূপ মালা পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য ও মাধুর্য—যতদিন বাঙ্গলার নাট্যশালা থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালী দর্শক ও পাঠকবৃন্দকে বিমোহিত এবং চমৎকৃত করিবে।

দেশের হৃদয়ের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া যখনই প্রয়োজন হইয়াছে গিরিশচন্দ্র নাট্যশালা হইতে ভাবের স্রোতোমুখ তখনই পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অপূর্ব নাটকাবলী স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হইতেছে---রামায়ণ প্রায় শেষ হয় হয়, দর্শক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন, রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারীও চিন্তিত। রামায়ণ, মহাভারতের স্রোত ফিরাইতে না পারিলে দর্শকের সংখ্যা বাড়ে না, গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা' লিখিলেন। সে কি সমারোহে, সে কি ভাববন্যার দুকূলপ্লাবন উচ্ছ্বাস! ইংরাজী শিক্ষার বিষে-জজরিত বাঙ্গালীর বিস্মৃত হৃদয়ে সে কি নবজাগরণের অরুণোদয়! বারাঙ্গনা লইয়া অভিনয়, ইংরাজী রুচিবাগীশ ভাবের প্রেরণায় সে কথা ভুলিয়া গেলেন। সংস্কৃত শিক্ষাভিমানী আচারনিষ্ঠ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভক্তির পুণ্যস্পর্শে বারাঙ্গনা-স্পর্শ হীন বলিয়া মনে করিলেন না,—যে অভিনেত্রী চৈতন্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ

আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার পাদস্পর্শে বাঙ্গালার নাট্যশালা তীর্থে পরিণত হইল। অলক্ষ্যে—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীকে মহাকাল জানাইয়া দিলেন, পরভাবানুকারী হইলেও বাঙ্গালী—বাঙ্গালী! তাহার অন্তরের অন্তর তাহার অজ্ঞাতে পাশ্চাত্ত্য কলাবিদ্যার মোহকরি বসন দূরে ফেলিয়া—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের রসমাধুর্যে কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তাহা সে নিজেই জানে না। নাট্যশালাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর এই সব জাগরণের পুরোহিত গিরিশচন্দ্র।

চৈতন্য লীলার পর হইতেই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা যেন পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিল। ইহার পরেই তাঁহার 'বিল্বমঙ্গল' বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধ' দেখিয়া অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দুর বাড়ীতে বলি নিষিদ্ধ হইয়াছে। লোকমত গঠন ও লোকশিক্ষার জন্য ইংরাজের অনুকরণে এদেশে দেশীয় সংবাদ পত্র যে কাজ করিয়াছে,—গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা তদপেক্ষা যে কত অধিক কাজ করিয়াছে, তাহা নাট্যশালার ইতিহাসজ্ঞ সুধী মাত্রেই জানেন ও স্বীকার করিবেন। বাঙ্গলায় এই যে জাতীয় জাগরণ, এই যে শত শত বৎসরের মোহাপসারণের চেষ্টা, ইহাতে অপাংক্তেয় বাঙ্গলার নাট্যশালার সে কতখানি দাবী আছে, বাঙ্গালীর প্রথম সাধারণ নাট্যশালার নাম নির্বাচনেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গলার প্রথম নাট্যশালার নাম 'ন্যাশানাল থিয়েটার'! ন্যাশানাল কংগ্রেস ন্যাশানাল থিয়েটারের পরে সৃষ্ট। এদেশে নাট্যশালাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা কর্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন বা ভবিষ্যতে করিবেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। হেম বন্দ্যোর 'ভারত বিলাপ', 'ভারতমাতা' এই ন্যাশানাল থিয়েটারের মঞ্চ হইতে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষিত অভিনেতৃমুখে উচ্চারিত হইয়া দর্শক হৃদয়ের সে সুপ্ত দেশাত্মবোধকে জাগাইয়া তুলিত, কে বলিতে পারে তাহারই ফলে সেই দর্শকবৃন্দের উত্তর পুরুষগণ আজ 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী হইয়াছেন কি না? যদি বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যানন্দ, জীবানন্দ প্রভৃতি সন্তানসম্প্রদায় উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া থাকিত, যদি গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহারা দর্শকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ না করিত, তাহা হইলে কবি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম মন্ত্র এত সহজে, এত অনায়াসে আজ কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্যন্ত আলোড়িত করিতে পারিত কি না কে বলিবে?

যেমনই ধর্ম বিষয়ে, ভক্তি বিষয়ে, দেশাত্মবোধ বিষয়ে ;—তেমনই সামাজিক, গার্হস্থ্য, রূপক ও কাল্পনিক চিত্রেও গিরিশচন্দ্র তাঁহার এই অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'প্রফুল্ল', তাঁহার 'বলিদান', তাঁহার 'শাস্তি কি শান্তি', তাঁহার 'মুকুলমুঞ্জরা', তাঁহার 'শঙ্করাচার্য্য' ও 'তপোবল' দর্শকের দৃষ্টি ও রুচি বদলাইয়া দিয়া গিয়াছে। নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্য হইতেই গিরিশচন্দ্র বাঙ্গলার জীবনীশক্তিকে এইরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', গিরিশচন্দ্রের 'মীরকাসেম', গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি' জাতীয় জীবন গঠনে কতটা সাহায্য করিয়াছে, আমরা এক এক করিয়া সেই কথাই বলিব।

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের উপর গিরিশচন্দ্রের একচ্ছত্র আধিপত্য—এ কথা বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না বরং এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়—ইহা অবিসম্বাদী সত্য। গিরিশচন্দ্রের পরেই বাঙ্গলার উল্লেখযোগ্য নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল। তাঁহার লেখনী থেকে শিক্ষার, সমাজ শিক্ষার সে অমৃত পরিবেশন করিয়াছে, তাহা সত্যই অপূর্ব। অমৃতলালের বিবাহ-বিভ্রাট একখানি যুগপরিবর্তনকারী প্রহসন। প্রথম সাহেবীয়ানা অনুকরণ,—প্রিয় বানরের মূর্তি তিনি এই বিবাহ বিভ্রাটে গড়িয়াছেন ; কুলবধূ হত্যাকারী বাঙ্গালী সমাজের অপূর্ব চিত্র, বিচিত্র হইয়া ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ব্যঙ্গসাহিত্য রঙ্গমঞ্চের পরিবর্তনে গিরিশচন্দ্রের যোগ্য শিষ্যেরই পরিচয় দিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলায় যখন মৃদঙ্গের ঘা পড়িল, বাঙ্গলার আর একজন নাট্যকার সেই সুরে সুর মিলাইয়া নাটক লিখিলেন। সে নাটক কবিবর স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'। সাহিত্য হিসাবে ইহার কোন মূল্য আছে কিনা জানি না ;—কিন্তু রঙ্গালয়ে দর্শক সৃষ্টি করিবার সে অসীম ক্ষমতা এই নাটকের দেখিয়াছি তাহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। বাঙ্গলার নাট্যশালার গঠনে রাজকৃষ্ণ রায় একজন কর্মনিষ্ঠ সাধক। এই কীর্তন প্লাবনের যুগে স্বর্গীয় অতুল মিত্রের 'নন্দবিদায়' বাঙ্গালী দর্শককে কম মুগ্ধ করে নাই। ১৯০৪ সালের পর বাঙ্গলার নাট্যমঞ্চে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, রাজকৃষ্ণ ও অতুল মিত্রের প্রতিক্রিয়ার যুগ। এই সময়েই আমরা ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পরিচয় পাই।

খ্রীস্টাব্দ ১৯০৪! বাঙ্গলা জাগিয়াছে। কোনদিন এই অন্নগতপ্রাণ

বাঙ্গালীর বাহুতে যে রস ছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্‌টাইয়া বাঙ্গালী তাহার নিদর্শন খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের 'সিরাজ-উদ্দৌলা', নিখিলনাথের 'মুরশিদাবাদ কাহিনী'—বাঙ্গলায় একটা নূতন হাওয়া বহাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষ, তাহার পিতৃপিতামহ যে, একদিন দোদণ্ডপ্রতাপ মোঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আপনার অপহৃত স্বাধীনতাকে শক্তিধর সম্রাটের হাত হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক কুস্তীর আখড়ায় মাটি মাখিতে মাখিতে এখন সেই কথারই আলোচনা করে, বাঙ্গলার বারো ভুঁইয়া যে, এই আমাদেরই মত বাঙ্গালীর জাতভাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী যুবক তাহার পৈতৃক বাঁশ কাটিয়া বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় স্বরূপ লাঠিখেলায় মাতিয়া উঠে, পল্লীতে পল্লীতে সমিতি, পল্লীতে পল্লীতে সংঘবদ্ধ বাঙ্গলার যুবকের দল। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সুদূর মার্হাট্টায়, মার্হাট্ট যুবক, মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর মূর্তি গড়িয়া পূজা করে; বাঙ্গালী বাঙ্গলার শ্যাম বনানীর অন্তরালে উৎসুক নেত্রে খুঁজিয়া দেখে—কোথায় বাঙ্গালীর শিবাজী, কোথায় বাঙ্গলার তানাজী! ইতিহাসের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া, যশোহরের শার্দূল নিষেবিত বনপ্রান্তে, যশোরেশ্বরীর ভগ্ন-মন্দির প্রাঙ্গণে ছায়ামূর্তি লইয়া এমনি দিনে তাহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল, বঙ্গজ কায়স্থ-কুল-তিলক, মোগল-গর্ব-বিধ্বংসী-বীর প্রতাপাদিত্য রায়—যাঁহার সঙ্গে ফিরে বায়ান্ন হাজার বাঙ্গালী ঢালী, যুদ্ধকালে সেনাপতি যাঁহার কালী, যাঁহার মন্ত্রসিদ্ধ সচিব বাঙ্গালী বীর শঙ্কর—আর যাঁহার উগ্র তপস্যার ঐকান্তিকী কামনার ফল বাঙ্গলার স্বাধীনতা! বাঙ্গলা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কে তাহাকে বলে প্রতাপাদিত্য দস্যু? বিতব্রণের মত সে 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের' পঙ্কিল গ্লানি সুন্দরবন হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া বঙ্গোপসাগরে ভাসাইয়া দিল। তাহার চক্ষে বাঙ্গলার নায়ক প্রতাপাদিত্য, বাঙ্গলার বলবীর্যের মূর্ত বিগ্রহ প্রতাপাদিত্য! বাঙ্গলা তাঁহাকে পূজা করিতে আরম্ভ করিল, ভক্তিভরে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিল। কলিকাতায় পান্তীর মাঠে শিবাজী উৎসবের ন্যায় প্রতাপাদিত্যের উৎসব হইল। এই শুভ অবসরে বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের,—'প্রতাপাদিত্য' বীরকণ্ঠে সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে উদাত্ত স্বরে গাহিল—'হয় যশোর—নয় মৃত্যু!' প্রতাপাদিত্য নাটক দেশের কি

কাজ করিয়াছে, বাঙ্গলার উত্তর পুরুষগণ তাহার বিচার করিবেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে ইতিহাসের যুগ আসিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইল। জাতীয় কংগ্রেস, নামে জাতীয় হইলেও, ইহা ভারতের অভিজাতবর্গের অনুষ্ঠান বলিয়াই চলিয়া আসিতেছিল। ইংরাজীনবীশ, ইংরাজী ভাবের ভাবুক, ইংরাজী দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ, ইংরাজী পার্লামেন্টের অনুচিকীর্ষু ভারতের গণ্য-মান্য বরেণ্য বিত্তশালী বিদ্বান্‌-মণ্ডলী কংগ্রেসকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন দেশের পাণ্ডাল হইতে যে রাষ্ট্রীক স্বর তখন উঠিত, সংবাদপত্র মারফতে তাহা সুদূর পল্লীগ্রামে সঞ্চারিত হইলেও, পল্লীর প্রাণকে কখনো তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, বাঙ্গলার প্রাণে এমন একটা আঘাত দিল, যে আঘাতে ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, আইনজীবী ও হলধারী কৃষক একসঙ্গেই যেন একটা দারুণ বেদনা অনুভব করিল। সহরে সে কি উন্মাদনা! অন্ধ, খঞ্জ, জীর্ণগলিতবাস ভিখারী তাহার সমস্ত দিনের অর্জিত ভিক্ষার মুষ্টি উত্তেজনার আতিশয্যে সানন্দে জাতীয় তহবিলে দান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিল। গঙ্গাতীরে রাখিবন্ধন। কবীন্দ্র রবীন্দ্র গাহিলেন—'ভাই ভাই এক ঠাঁই।' দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক পাড়ায় পাড়ায় কান্তকবি রজনীকান্তের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে না ভাই' গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুরনারীরা হাতের স্বর্ণ শাখা ও রুলী দান করিয়া শাঁক বানাইলেন। ১৯০৫—বাঙ্গলা ইতিহাসের এক স্মরণীয় কাল—বাঙ্গালীকে যাহা দান করিল, বাঙ্গালীর উত্তর পুরুষ যে দানের মহিমা কখনো ভুলিবে না। এই বৎসরেই বাঙ্গলার নায়ক সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হায় আজ তিনি স্বর্গগত। বাঙ্গলার 'মুকুট রাজা বলিয়া অভিনন্দিত হইলেন। সে হ্যাটকোট নাই, সে বিলাতী বুটের মস্‌মস্‌ শব্দ নাই, উত্তরীয় মাত্র সম্বল, শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণ সন্তানের কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র, যেন তাহার বহুবর্ষের স্বেচ্ছাচারকে প্রায়শ্চিত্তপূত করিয়া তাহাকে জাতিতে তুলিয়া লইল। এই সময়েই নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীকে তাহার কীর্তি অকীর্তির কথা, তাহার ভাগ্য-বিপর্যয়ের করুণ কাহিনী, তাহার অতীত গৌরব ও অগৌরবের উজ্জ্বল ও মলিন চিত্র দর্শকের সমক্ষে প্রকটিত করিলেন। গিরিশচন্দ্রের ভৈরব ভেরীর গভীর নির্ঘোষে বাঙ্গলার নাট্যশালা স্তম্ভিত হইল।

এইরূপে বাঙ্গলা নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র নাট্যশালা হইতে বাঙ্গালী জাতিকে, তাহার প্রাণের তারে যে সুর অনাহত অবস্থায় ছিল, সে সুরে সুর তুলিয়া তাহাকে জাগাইয়াছেন। মাতাইয়াছেন, আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তাই, যেমন বাঙ্গলার উপন্যাসে সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, তেমনি নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র—দুই যুগবতার। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম' ও 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক না হইলেও নাটকাকারে বঙ্গমঞ্চে দেশাত্মবোধ জাগরণে যে কাজ করিয়াছে, তাহারই বা তুলনা কোথায় ?"

[রূপ ও রঙ্গ : ৩রা আশ্বিন ১৩৩২]

গ্রন্থপঞ্জী

Archer. W.—The Old Drama and the New (1923)
Baker. D. E.—Biographia Dramatica, 3 vols. (1812)
Beare. W.—The Roman Stage (1950)
Bieber. M.—The History of the Greek & Roman Theatre (1939)
Bradley. A. C.—Shakespearean Tragedy (1904)
,, ,, —Oxford Lecture's on Poetry (1909)
Brooks Cleanth & Heilman. R. B.—Understanding Drama (1946)
Butcher S. H.—Aristotle's Theory of Poetry & Fine Art (1927)
Bywater. I.—Aristotle on the Art of Poetry (1909)
Campbell. L —Tragic Drama in Aeschylus, Sophocles & Shakespeare (1904)
Carados (H. Chance Newton)- Crime & the Drama (1927)
Clark. B. H. –European Theories of the Drama (1947)
,, ,, A Study of the Modern Drama (1928)
,, ,, & Freedly. G —A History of Modern Drama (1947)
Clarke. S. W. -The Miracle Play in England (1897)
Chambers. E. K.—The Medieval Stage (1903)
Chase. L. N.—The English Heroic Plays (1905)
Conford. F.—The Origin of Attic Comedy (1914)
Courtney. W. L.—The Idea of Tragedy in Ancient & Modern Drama (1900)
Craig. E. G.—On the art of the theatere (1911)
Devenport Adams. W.—A Dictionary of the Drama (1904)
Dickinson. T. H.—An Outline of Contemporary Drama (1927)
Disher. M. W.—Blood and Thunder (1949)
Dixon. W. M.—Tragedy (1924)
Dobre'e. B.—Restoration Comedy (19[illegible])
Dryden. J.—Essays of Dramatic Poesy (Ed. W. P. Ker) (1886)

Duchartre. P.—The Italian Comedy (1929)
Dukes. A.—Modern Dramatists (1911)
,, ,, —Modern Drama (1926)
Evans H. A.—English Masques (1897)
Fermor Una Ellis. —The Frontiers of Drama (1948)
Flickinger. R C—The Greek Theatre & its Drama (1922)
Freedley. G. & Reeves. J A.—A History of the Theatre (1943)
Gaster. T. H —Thespis (1950)
Gilder. R.—A Theatre Library (1932)
Goodwel. T. D —Athenian Tragedy (1920)
Granville-Barker H —On Dramatic Method (1931)
Gyseghem. A Van—Theatre in Soviet Russia (1943)
Haigh. A. E.—The Attic Theatre (1907)
,, ,, —The Tragic Drama of the Greeks (1925)
Hatcher H. H.—Modern British Drama (1941)
Hazlitt. W. C—The English Drama 1543-1664 (1869)
Keith. A. B—The Sanskrit Drama (1924)
Kitto H D. F.—Form & Meaning in Drama (1956)
Knight. G W.—The Wheel of Fire (1930)
Lawson. J. H—Theory & Thchnique of Playwriting (1936)
Lea. K. M.—Italian Popular Comedy (1934)
Lucas. F. L. -Tragedy in relation to Aristotle's Poetics (1928)
,, ,, —Seneca & Elizabethan Tragedy (1933)
Mantizius K. —A History of Theatrical Art (6 vols) (1937)
Meredith. G—An Essay on idea of Comedy (1897)
Morgan. A E—Tendencies of Modern English Drama (1924)
Moulton. R. G —The Ancient Classical Drama
Murray. G.—Aristophanes (1933)
Nicoll. A—British Drama (1922)
,, The Theory of Drama (1931)
,, Development of the Theatre (1937)
,, Masks, Mimes & Miracles (1931)
,, World Drama (1949)
Ould. H.—The Art of Play (1938)
Pickard-Cambridge. A. W—Dithyrumbs, Tragedy and Comedy (1927)

Pollard. A. W.—English Miracle Plays, Moralities
& Interludes (1927)

Reynolds. E.—Modern English Drama (1949)

Ridgeway. W.—The Drama and Dramatic Dances of non-European Races (1915)

Rossiter. A. P.—English Drama (1950)

Rudwin. M.—A Historical & Bibliographical Survey of the German Religious Drama (1924)

Schelling. F. E—The English Drama (1914)

,, ,, - Elizabethan Drama (2 vols) (1918)

Schlegal. A. W Lectures on Dramatic Art & Literature (Eng. trans) (1846)

Thorndike. H A —Tragedies (1908)

,, ,, —English Comedy (1929)

Ward. A. W —History of English Dramatic Literature to the Death of Queen Anne (3 vols) (1899)

Yajanik. R. K.—The Indian Theatre, its Origin & later development under European influnces (1934)

Young. N.—The Drama of the Medieval Church (2 vols) (1933)

অভিনব গুপ্ত—নাট্যসূত্র (নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য)।

ধনঞ্জয়—দশরূপক।

ভরত—নাট্যশাস্ত্র।

রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র—নাট্যদর্পণ।

শারদাতনয়—ভাবপ্রকাশন।